প্রেম ও নিঃসঙ্গতা

সোফিয়া লোরেন

ক্লাসিক পাবলিকেশন
কলিকাতা

অভিমন্যু শিস্ দিচ্ছিলো। জোরে নয়, মৃদুগুঞ্জনে। অধুনালুপ্ত অথচ বহুপরিচিত একটি গানের সুর। সুন্দর শিস্ দেয় অভিমন্যু, শিসের মধ্যে সুর যেন কথা ক'য়ে ওঠে। কবে, কোথায়, কার কাছে যে শিখেছিলে কে জানে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই এটা ওর অভ্যাস।

মঞ্জরী অবশ্য বলে—'বদভ্যাস।' তার মতে শিস্ দেওয়াটা নিতান্ত সেকেলেপনা তো বটেই এবং শালীনতারও বিরোধী। বলে, 'একালে কোনো ভদ্রলোকে কখনো শিস্ দেয় না।' অভিমন্যু তর্ক করে না, হাসে, আর মঞ্জরীর খুব রাগের সময় একটু শিস্ দিয়ে ওঠে। মঞ্জরী আরো রেগে-রেগে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক একজন প্রফেসারের উপযুক্ত বটে।'

অভিমন্যু বলে, 'তা আমি তো ছাত্রীদের সামনে শিস্ দিচ্ছি না?'

'দিতে কতোক্ষণ? বদভ্যাস যে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়—'

'এতোদিনেও যখন অতো দূর পৌঁছোয়নি, তখন তোমার শাসনকালে আর বেশী বাড়বে কি?'

'জানি না, বিচ্ছিরী লাগে।'

অভিমন্যু আর মঞ্জরী। বৌদিরা বলেন, 'জোড়ের পায়রা।' প্রেমে প'ড়ে, অভিভাবকদের ভারিমুখকে অবহেলা ক'রে বিয়ে। তবুও সেই একান্ত মনোরমা সুন্দরী প্রিয়ার 'বিচ্ছিরী'-লাগা সত্ত্বেও যখন-তখনই শিস্ দিয়ে ওঠে অভিমন্যু, স্বচ্ছন্দবিহারী আকাশচারী পাখীর মতো। কিন্তু তাই ব'লে তিনতলায় উঠে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তায় চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে শিস্ দিয়েই চলেছে, অনেকক্ষণ ধ'রে দিচ্ছেই। এ'রকম কোনদিন দেখা যায় না। যেমন আজ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওর যেন আজ আর কোনো কাজই নেই। হয়তো কাজ সত্যিই নেই, হয়তো আজ কলেজ ছুটি, তবু বেলা দশটার সময়, যখন সমস্ত পৃথিবীর কর্মচক্র উন্মত্তবেগে ঘুরছে, তখন এ কি অলসতার ভূতে পেল ওকে?

তবে সত্যি বলতে, অভিমন্যুর যথার্থ পরিচয় দিতে, না ব'লে উপায় নেই—অভিমন্যুর অলসতাতেই আনন্দ। একটি কলেজের মেয়েকে সপ্তাহে চারদিন ঘণ্টাদেড়েক ক'রে পড়িয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই পারে না ও, মাত্র যথেচ্ছ বই পড়া বাদে। অথচ কতো সুবিধে ছিল ওর। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে বিশ্ববিত্যালয়ে। নিরবধিকাল ধ'রে চলছে—আর চলবে 'খাতা দেখা।' আদি অনন্তকাল মাথায় গোবরভরা ছেলেমেয়েদের মা-বাপ পরীক্ষা-সাগর পাশ করাতে রাখবে 'প্রাইভেট টিউটর'। ভালো ছেলেমেয়েরা রাত্তিরে

জেগে-জেগে দুলে-দুলে করবে 'নোট্' মুখস্থ। কাজেই জীবনের সমস্ত অবসরকে নিংড়ে-নিংড়ে অর্থরস আহরণ ক'রে নেবার অনেক সুবিধে আছে, এইসব মাঝারি দলের অধ্যাপকদের। অভিমন্যুরও ছিলো।

কিন্তু অভিমন্যু সে সুবিধে দিতে পারলো না, পারবে বলেও মনে হও না। ও সুবিধে নিচ্ছে অন্যদিকে। এই উত্তর কলকাতার দিকে বাপের একটা বাড়ি ছিলো তিনতলা, যার নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে খানিকটা কিছু আসে, আর বাকি দু'টো এলায় নিজেরা দিব্যি হাত-পা মেলে থাকা যায়। সেই পৈতৃক বাড়ীখানা যখন অভিমন্যুর দুই দাদা একলা অভিমন্যুকেই ভোগ করতে দিয়ে নিজেরা কলকাতার মাঝ বরাবর অভিজাত পাড়ায় গিয়ে বাড়ি করলো, তখন সে সুবিধেটা অম্লানবদনে নিলো অভিমন্যু। সে অপদার্থ, অধম বলেই দাদারা ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে পিতৃ-সম্পত্তির সমস্তটুকুই দান করলো তাকে, এ বুঝেও অভিমন্যু লজ্জিত হলো না।

বাড়িটা তো অভিমন্যুর ভাগে পড়লোই, বাড়ীর ভাগ ফাউ মা। মা রইলেন কোলের ছেলের কাছে। চার মেয়ে আর তিন ছেলের মধ্যে ছ'জন আছে ছ'দিকে ছড়িয়ে, পূর্ণিমাদেবী নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজের কোলের কাছটিতে। অন্য ছেলেরা অথবা মেয়েরা যদি দায়ে-দৈবে মাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাবার দাবি তোলে, পূর্ণিমাদেবী সে দাবি খণ্ডন করতে এমন সব কাল্পনিক অসুবিধে এনে জড়ো করেন যে, তারা শেষ পর্যন্ত রাগ করেই ফিরে যায়। আর যদি বা কখনো চক্ষুলজ্জার দায়ে কারো কাছে যান, পূর্ণিমাদেবী তো তিনদিনেই 'পালাই' 'পালাই' ভাব দেখিয়ে তাদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, কোলের ছেলের কাছে ফিরে এসে বাঁচেন।

অথচ অভিমন্যুই মা'কে সব থেকে মানে কম। বয়সে অনেকটা তফাৎ বলেই হয়তো তার সঙ্গে কথাবার্তার ধরন তার জ্বালাতুনে নাতির মতো। মা বকলে হাসবে, রাগলে কাছে শুয়ে পড়বে, এবং তিনি যখন নিতান্ত শুদ্ধাচারে ঠাকুরঘরে আর টানাপোড়েন করতে থাকেন, তখন তাঁকে ছুঁয়ে মজা দেখবে।

পূর্ণিমাদেবী রেগে গাল দিয়ে ভূত ভাগান, তবু কোথাও কোনোখানে একটু বিশেষ প্রশ্রয় আছে বৈকি! তা নইলে পূর্ণিমার সাত ছেলেমেয়ের কেউ সাহস করলো না প্রেমে পড়তে, আর অভিমন্যু দিব্যি একটা মেয়ের প্রেমে প'ড়ে ব'সে থাকলো? শুধু ব'সে থেকেই ক্ষান্ত হলো না। সে মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনে তুললো। দাদা-দিদি ভাগ্নে-ভাগ্নীর বাহিনীকে জড়ো ক'রে দাদাদের পয়সায় বিয়ের ঘটা করিয়ে ছাড়লো, এবং ঘটার ঘটঘটি মিটলে বি-এ পাশ বৌয়ের হাতের রান্না মা'কে খাওয়ালো।

অবশ্যি তার আগে মঞ্জরীকে শুদ্ধাচারের ষোল-আনা পাঠ মুখস্থ করিয়ে

ছেড়েছিলো অধ্যাপক অভিমন্যু। তাহলেও পাশ-টাশকরা মেয়েদের হাতে খেলে জাত জিনিষটা থাকে কি থাকে না, এই বিষয়ে যে বরাবর ঘোরতর সন্দেহ ছিলো পূর্ণিমার, সে সন্দেহ দাঁড়াতে পেলো না। অভির জ্বালায় কিছু আর রইলো না, এই তার শেষ অভিমত।

অতএব অভিমন্যু মনের আনন্দে মাকে জ্বালায়, বৌকে জ্বালায়, দাদাদের বাড়ী গিয়ে বৌদিদের জ্বালায়, দিদিদের বাড়ী গিয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের জ্বালিয়ে জামাইবাবুদের বিরাগভাজন হয়, এবং এরই মাঝখানে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী, প'রে কলেজে গিয়ে গম্ভীরভাবে ছাত্রী পড়িয়ে আসে। বয়সে সর্বাপেক্ষা তরুণ এই অধ্যাপকটিকে ছাত্রীরা সর্বাপেক্ষা সমীহ করে।

পূর্ণিমা উঠে এসে পেছনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিটখানেক। দেখলেন অভিমন্যু জানতে পারছে না, একভাবে পথের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শিস্ দিয়েই চলেছে। দেখে হাড় জ্বলে গেলো পূর্ণিমার। তিক্তস্বরে বললেন—'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শিস্ দিচ্ছিস্? লজ্জা করছে না?'

প্রায় চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো অভিমন্যু। ফিরে দাঁড়াতেই সম্পূর্ণ দেখতে পাওয়া গেলো ওকে। দেখতে পাওয়া গেলো ওর কাটাছাঁটা গ্রীসিয়ান-ছাঁচের মুখ, পালিশ করা চুলের নিখুঁৎ পরিপাট্য, মাজা-ঘসা শ্যামলা রঙের একটি ঔজ্জ্বল্য, লম্বা দোহারা গড়ন, আর অপ্রতিভ একটু হাসি। মা'র ধিক্কারে অপ্রতিভ একটু হাসি হেসে ফিরে তাকালো অভিমন্যু। তারপর উত্তর দিলো :—'লজ্জা? কই, না তো?'

'লজ্জা করছে না? তা করবে কোথা থেকে? লজ্জা তোর শরীরে থাকলে তো?'

'যাক! তাহ'লে তো তুমি জেনেই ফেলেছো!'

'থাম্। আদিখ্যেতা রাখ্। বলি, তুই এতে মত দিলি?'

অভিমন্যু মৃদু হেসে বললো—'আমার মত দেওয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে মা? বড্ডো তুমি সেকেলে আছো এখনো। নাকে চশমা লাগিয়ে বিস্তর বই কাগজ তো পড়ো দেখি, জগতের হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে টের পাওনি?'

'হয়েছে-হয়েছে, নতুন ক'রে আর আমাকে জগতের হাওয়া দেখাতে আসিসনে তুই। যেদিনকে মাথার ওপরে পাঁচটা গার্জেন থাকতে অম্লানবদনে এসে নিজের পছন্দকরা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে পেরেছিলি, সেইদিনই তো হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে, বুঝিয়ে দিয়েছিলি।'

বোঝা যাচ্ছে, পূর্ণিমাদেবী মারাত্মক চটেছেন। তবু অবোধের ভানই সুবিধে। তাই অভিমন্যু হেসে। বলে, 'আহা সে গত কথা। না? এই তিন বছরে হাওয়া আরও এগোচ্ছে না নিথর হয়ে থেমে আছে?'

'হ্যাঁ, এগোচ্ছে।'···রাগে হাঁপাতে থাকেন পূর্ণিমাদেবী....'দেশসুদ্ধু লোকের ঘরের বৌ থিয়েটার করতে যাচ্ছে! ওসব কথা পাগলা গারদের পাগলাকে বোঝাগে যা অভি, আমায় বোঝাতে আসিসনে।'

'থিয়েটার নয় মা!'

'আচ্ছা-আচ্ছা, না হয় তোদের সিনেমা। তফাৎটা কি? যার নাম ভাজাচাল, তার নামই মুড়ি! আমি বলছি ওসব হবে না। তোদের কোনো কথায় থাকি না ব'লে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস, কেমন?

'সাপের পাঁচ পা? কই—মনে পড়ছে না তো?'

'চুপ কর্! চুপ কর্! একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছিস! কিন্তু আমি বলছি, ওসব চলবে না। আমি বেঁচে থাকতে আমার বাড়ীতে ব'সে ছোট বৌমার সিনেমা করা চলবে না।'

অভিমন্যু দু'হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গি করে বলে—'এই ছ্যাখো! কি শুনতে কি যে শোনো! বাড়ীতে ব'সে করবে কি গো? স্টুডিও জানো? না কি তাও জানো না? চশমা নাকে দিয়ে শুধু সেকালের রামায়ণ-মহাভারতগুলোই পড়ো?'

পূর্ণিমাদেবী বিরক্তিতে জ্বলে উঠে বলেন—'ও তাই বল্। তোর সঙ্গে তাহ'লে ষড়যন্ত্র আছে! বুঝেছি, তোর নিশ্চয়ই পয়সার লালসা হয়েছে, তাই বৌকে বায়োস্কোপে নামাচ্ছিস্। ইতর! অপদার্থ।'

'আঃ! মা! কি পাগলামী করছো?'

তা সত্যি। পূর্ণিমাদেবী এতো বিচলিত সহজে হন্ না। বোধকরি কোনদিনই হন্‌নি। সবচেয়ে আদরের লোকের ছেলে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি মুখে তার প্রেমে পড়ার খবর জানিয়েছিল, সেদিনও না। 'পাগলামী করছো' শুনে তিরবিরিয়ে উঠলেন পূর্ণিমা। বললেন: 'তোমার মত ছেলে যার, তার পাগল হওয়া ছাড়া উপায় কি? যে বেটাছেলে নিজের বৌকে এঁটে উঠতে পারে না, তার আবার পরের মেয়েদের মাষ্টারি করতে যাওয়ার সখ! কাল থেকে বাড়ীতে ব'সে থাকিস্! ছি-ছি, যতোবার ভাবছি, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।'

অবাক কাণ্ড! এতোতেও দমে না অভিমন্যু। কিছুক্ষণ আগের শিস্-দেওয়া সুরটাই তাল দিচ্ছে আঙুলের টোকায়। দিতে-দিতেই বলে: 'মাথা কাটা? মা গো, তুমি আছো কোথায়? এসবে মাথাটা উঁচুই হয়। এরপর দেখবে, তুমি যখন গঙ্গায় নাইতে যাবে, লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে তোমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলবে—'এই দেখ-দেখ, মঞ্জরী দেবীর শাশুড়ী যাচ্ছেন।'

'আর সেই কথা শুনে আমি নেয়ে আবার বাড়ী ফিরে আসবো ?' পূর্ণিমা-দেবী ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন—'কেন ? গঙ্গা ছাড়া কি জল নেই ?'

বৌয়ের দুঃসহ স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ছেলের কাছে এসেছিলেন পূর্ণিমা একটা কিছু বিহিত করতে। ছেলের ব্যবহারেও হতাশ হলেন। বুঝলেন, ছেলেটা একেবারে স্ত্রৈণ হয়ে গেছে, ওর ওপর তাঁর আর কোন ভরসা নেই।

কিন্তু অভিমন্যুর ওপরই ভরসা নেই যদি, তো—কোথায় আর কি রইলো পূর্ণিমার ? তাঁর যে ছেলেরা বিয়ের আগে 'প্রেম' কথাটার বানান জানতো না, মায়ের আদেশ হেঁটমুণ্ডের ওপর টোপর চাপিয়ে নীরবে গিয়ে বিয়ে ক'রে এসে তবে বৌ কি বস্তু চিনেছে এবং যাদের বৌরা সিনেমা করা দূরে থাক্, কস্মিন্‌কালে একটা গানের সুরও ভাঁজে না, সেই ছেলেরা তো আগেই হাতছাড়া হয়ে ব'সে আছে।

রাগ ক'রে চলে গেলেন পূর্ণিমা। অভিমন্যু সেদিক চেয়ে একটু হাসতে গেলো, কিন্তু হাসি এলো না। ভাবতে গেলো, মা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছেন, কিন্তু ভাবতে পারলো না। বরং মনে করলো, রাগটা মা'র অসঙ্গত নয়। যদিও মঞ্জরীর এই দুরন্ত সখটিকে সে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এইমাত্র হঠাৎ আবিষ্কার করলো, স্ত্রীর সেই সখকে মনে-মনে মোটেই সমর্থন করছে না সে। অথচ তাকে বাধা দেবার শক্তিও বোধহয় অভিমন্যুর নেই ? কিন্তু কেন নেই ? বাধা দিতে গেলে মান থাকবে না ? না বাধা দিতে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার ব'লে ?

তা হয়তো শেষেরটাই। আধুনিক, সমাজে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব খাটনোর চেষ্টাকে নীচতা—সেকেলেপনা ব'লে, নিন্দনীয় ব'লে ঘোষণা করে। তবু একবার সে-চেষ্টা ক'রে দেখতে ইচ্ছে হলো অভিমন্যুর।

এর আগে হয়নি, এখন হলো। মায়ের এই নিতান্ত বিচলিত অবস্থা দেখে মনের কোথায় যেন একটা অপরাধ বোধ উঁকি মারলো। সত্যি, মা'র ওপর কি কোন কর্তব্যই নেই তার ? দায়িত্ব নেই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবার ?

তরতর করে নেমে এলো নীচে। বিনা ভূমিকায় বললে, 'মঞ্জু, তোমার সখ আর মিটলো না মনে হচ্ছে। মা'র দেখছি ভীষণ আপত্তি, বড্ডো বেশী রাগারাগি করছেন।'

মঞ্জরী সকাল থেকে সাংসারিক নানা খুঁটি-নাটি কাজ সেরে সেইমাত্র স্নান করতে যাবার আয়োজন করেছিলো। বেণী খুলে চুলগুলোকে ছড়িয়েছে, তখনো জট-ছাড়ানো বাকি, আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনি বুলানোর অবসরে নতুন করে নিজেকে চেয়ে দেখছিলো।

শুধু দেখছিলো বললে হয়তো সব বলা হবে না, দেখছিলো আর মুহুর্মুহুঃ মুগ্ধ হচ্ছিলো। আরশিটাকে রূপালী পর্দ্দা কল্পনা ক'রে দর্শকের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা ক'রে বিভোর হচ্ছিলো।

তা সত্যি। 'সিনেমা স্টার' হবার মতো চেহারা বটে!

রংটা অবিশ্যি খুব ফর্সা নয়, কিন্তু ময়লা রং 'স্টার' হবার পথ আটকায় না। মুখ-চোখ যেন নিখুঁৎ। তাছাড়া চুল!

এই চুল তার! এই ঢেউ-খেলানো চুলের গোছা এলিয়ে দাঁড়ালে—

কে জানে কিভাবে সাজতে হবে তাকে। সামান্যই ভূমিকা তার—গ্রাম্যবধূ নায়িকার একটি আধুনিকা বান্ধবী। মাত্র তিনটি দৃশ্যে তাকে দরকার। তবু কি রোমাঞ্চ! ছেলেবেলা থেকে এই এক অদ্ভুত সখ মঞ্জরীর।

অন্ততঃ একেবারের জন্যে দূর থেকে, দর্শকের আসনে ব'সে নিজেকে দেখবে। দেখবে কেমন দেখায় তাকে ঘুরলে-ফিরলে কথা বললে। সেই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে কী ভঙ্গি ফোটে, চোখের তারায় আর ঠোঁটের ইসারায়। সে ভঙ্গি দেখে লোকে কী বলে!

ছাত্রী-জীবনে স্কুলে কলেজে অভিনয় করেছে ঢের, কিন্তু তাতে আমোদ আছে, রোমাঞ্চ নেই। সে অভিনয় নিজের চোখে দেখে যাচাই করা যায় না। কিন্তু স্কুলে উৎসবে-অনুষ্ঠানে অভিনয় করা এক, আর পর্দায় নামা এক। গৃহস্থঘরের মেয়ে রক্ষণশীল গৃহস্থঘরের বৌ, বিয়ের আগে একটু পূর্বরাগের সুযোগই না হয় জুটেছিলো, তাই বলে এ সখ মেটাবার সুযোগ জুটবে, এমন আশা করা যায় না।

তবু জুটেছে সুযোগ! ভাগ্যের দাক্ষিণ্য! মঞ্জরীর বড়ো জামাইবাবু বিজয়ভূষণ মল্লিক পয়সাওয়ালা লোক, হঠাৎ তাঁর খেয়াল চেপেছে—সঞ্চিত সেই পয়সাকে সহস্রগুণ ফাঁপিয়ে তোলবার। অতএব আর কি। সিনেমার প্রযোজক!

প্রযোজক যদি বায়না ধরে ছোট্ট একটি 'রোলে' নতুন একটি মুখের নিতে হবে, পরিচালক পারে সে বায়না উপেক্ষা করতে? আর ছোট্ট শ্যালিকাটি যদি জামাইবাবুর কাছে নিতান্ত না-ছোড় এমন একটি বায়না ধরে যা পূরণ করা তাঁর হাতের মধ্যে, তাহ'লে—জামাইবাবুর কি সাধ্যি আছে তাতে 'না' করবার?

অবিশ্যি তিনি এই সর্তে রাজী হয়েছেন যে মঞ্জরীর শ্বশুরবাড়ীর এবং শ্বশুরপুত্রের খোসমেজাজ অনুমতি থাকলে, তবে।

মঞ্জরী বলেছে সে ভার তার। অবশ্য মঞ্জরীর দিদি সুনীতি বলেছিলো, 'কক্‌খনো, ওদের মত হবে না, দেখিস্।'

বিজয়ভূষণ বলেছিলেন, 'আহা, ও কি আর তোমাদের মতো ? 'ভালবাসা' ক'রে বিয়ে করেছে, ওদের কথাই আলাদা। নিশ্চয়ই মত পাবে, সে সাহস আছে।'

অনেক বড়ো ভগ্নীপতি, মঞ্জরীকে হামা দিতে দেখেছেন, দিদির ছেলে-মেয়েরাই খেলার সাথী ছিলো মঞ্জরীর, কাজেই শ্যালিকাকে ভদ্রলোক 'তুই-তোকারি' ক'রে থাকেন। মঞ্জরীরও তাই যথেষ্ট আবদার।

বিজয়বাবু বলেছেন, তিনি আজ সন্ধ্যায় আসবেন একবার। মঞ্জরীকে একবার স্টুডিওতে নিয়ে যেতে, সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সকলের সামনে নির্বাচিত বইটি পড়া হবে। হেসে বলেছেন, 'তাছাড়া—ভায়রা-ভায়ার সই নিয়ে যাবে। ও যে শেষকালে বলবে "বুড়ো আমার বৌকে ফুস্‌লে বার ক'রে নিয়ে গেছে," তার মধ্যে আমি নেই বাবা। অভিমন্যু খোসমেজাজে বহাল তবিয়েতে সই ক'রে দেবে—এ ব্যাপারে আমি সর্বান্তঃ-করণে সমর্থন করছি, তবেই আমি তোকে গাড়ীতে তুলবো।'

মঞ্জরী অভিমন্যুকে ব'লে রেখেছে এ-কথা।

অভিমন্যু অবশ্য বলেছিল, তুমি সাবালিকা।

তবু মঞ্জরী নিশ্চয় জানে, অভিমন্যুর এই ঠাট্টার ছলে বলা কথা কিছু অর্থ আছে। তাই মুচকে হেসে বলেছিলো, 'মেয়েরা আবার সাবালিকা হয় নাকি ? তারা তো চিরবালিকা।'

এসব গত রাত্রের কথা। সকালে তো মঞ্জরী আছে নিজের মনে। অভিমন্যুও আছে নিজের মনে। চা খাওয়ার সময় ছাড়া দেখাই হয়নি দু'জনে। শুধু মনে রেখেছে—সন্ধ্যেবেলা জামাইবাবু আসার কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিতে হবে অভিমন্যুকে।

মন হাসছিলো প্রজাপতির পাখায় ভর ক'রে। তেমনি হাল্‌কা তেমনি থরো-থরো কম্পনে। এমনি সময়ে অভিমন্যুর এই প্রতিবাদে হাতুড়ীর ঘা। অভিমন্যু যদি বলতো 'আমার কেমন ভালো লাগছে না,' মঞ্জরী গ'লে দ্রব্য হয়ে সেই ভালো না-লাগাকে ভালো লাগিয়ে ছাড়তো। কিন্তু এ যে অসহ্য। এতোদূর এগিয়ে, এতো আশার মুখ দেখে, সহসা এহেন বিরক্তিকর কথায় আপাদমস্তক জ্বলে গেলো মঞ্জরীর। চিরুনিটা চুলে আট্‌কে ভুরু কুঁচকে বললে, 'তোমার মা বুঝি এই প্রথম শুনলেন ?'

অভিমন্যুর কাছে এ ভ্রূ-কুঞ্চন অপ্রত্যাশিত নয়। তৈরী হয়েই এসেছে সে। মৃদু হেসে বললে, 'তা অবশ্য নয়। তবে প্রথমটায় বোধহয় বিশ্বাস করেননি।'

'কেন! এমনই একটা অবিশ্বাস্য কথা ?'

'তা অবশ্যই।'

'ও! তাহ'লে সেটা কথার সূচনাতেই ব'লে দাওনি কেন?'

'তখন ভাবিনি, মা এতো বেশী 'আপসেট' হয়ে যাবেন।'

'ভাবোনি কেন? ভাবা উচিত ছিলো! নিজের মা'কে চেনো না এমন নয়!'

অভিমন্যুর মুখটা ঈষৎ আরক্ত দেখায়, তবু সহজকণ্ঠে বলে, 'নিজেকেই চিনি না, তো—মাতা-ভগ্নী-জায়া!'

'বুঝেছি! নিজেরই এমন ইয়ে হচ্ছে, তাই সেই অনিচ্ছেকে মা'র আপত্তির ছদ্মবেশ পরিচয়ে—'

সহসা হেসে ওঠে অভিমন্যু। রীতিমত শব্দ ক'রে হেসে ওঠে।

'হঠাৎ এতো বড়ো-বড়ো কথা ব'লে ফেলেছো কেন? স্টুডিওয় যাবার নামেই স্টেজের হাওয়া গায়ে লাগলো নাকি? মা সেকেলে মানুষ, বাড়ীর বৌ মেয়ে থিয়েটার সিনেমা দেখতে যাচ্ছে শুনলেই অপ্রসন্ন হয়ে ব'সে থাকেন, সেটা করতে যাচ্ছে শুনলে তো রাগ করবেনই। এটা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'আচ্ছা, স্বীকার করছি খুব স্বাভাবিক তিনি। সর্বদাই স্বাভাবিক কাজ করছেন। কিন্তু কি আর করা যাবে?'

অপমানে আহত অভিমন্যু তবুও চেষ্টা করে দেখে। আহত হয়েছে এভাব দেখায় না, অবহেলাভরে বলে, 'করবার সবই আছে হাতে। বিজয়বাবু এলে ব'লে দেওয়া যাবে, মা'র ভীষণ আপত্তি।'

আর একবার দ্বিতীয় রিপুর প্রবাহ! শিরায়-শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। অভিমন্যু যদি মুস্কিল পড়ার ভঙ্গিতে ওর কাছে পরামর্শ চাইতো, 'বলো দিকি, বিজয়বাবুকে কি বলা যায়?' তাহ'লে হয়তো, এমন দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠতো না। কিন্তু ওর এই অবহেলার ভঙ্গি অসহ্য!

মঞ্জরী যেন মানুষ নয়, তার 'কথা দেওয়ার' কোন মর্যাদা নেই যেন!

আবাল্যের সাধ চুলোয় যাক্! মান-মর্য্যাদার প্রশ্নই প্রধান।

তাই এবার আরশির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিরুনিটা বাগিয়ে ধ'রে মঞ্জরী স্থির বলে, 'না, তা হয় না। আমি কথা দিয়েছি।'

'কি আশ্চর্য্য! এর আবার কথা দেওয়া-দিয়ির কি হলো?'

'হয়েছে।'

'হলেও, অবস্থাটা তিনি বুঝবেন। বাঙালী ঘরের ছেলে তো, আমিই না হয় ব'লে দেবো!'

'না।'

এই একাক্ষরী সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের পর আর কথা চলে না, অন্ততঃ

অভিমন্যুর মতো অভিমানী স্বামীর পক্ষে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেও তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে চলে যায় স্নানের উদ্দেশ্যে। একটু আগে ভাবছিলো, আজ আর কলেজে যাবে না, প্রস্তুত হয়ে বেরোবার গা আসছিলো না। ঝট্ করে মত বদলালো। নিটোল সুন্দর স্বচ্ছ কাঁচের বাসনখানা ভিতরে-ভিতরে একটু চিড় খেলো।

❀ ❀ ❀

বিজয়বাবু দরাজ-গলায় বললেন, 'কই' যে শালা অনুমতিপত্র সহ করবে, সে কই ?'

'আঃ! আপনি আর জ্বালাবেন না। আমি যেন নাবালিকা!'

সুনীতি এসেছে সঙ্গে। সে বললো, 'না হয়, মস্ত সাবালিকা তুই। কিন্তু গেলো কোথায় সে ? আমরা আসবো জানে না ?'

'জানবো না কেন! বেছে-বেছে ঠিক আজকেই ওর কলেজলাইব্রেরীর মীটিং।'

'বলি তার আপত্তি-টাপত্তি নেই তো ?'

'থাকলেই বা শুনছে কে ?'

সুনীতির মনে সায় নেই। সে নিজের বরকে বকতে-বকতে এসেছে, বোনের বরকে নিন্দাবাদ করেছে। এতো ফ্যাসান ভালো নয়, এই হচ্ছে তার মত। আশা করছিলো, শেষ পর্যন্ত হয়তো এসে শুনবে অভিমন্যু নিষেধ করছে। কিন্তু সে আশা ভঙ্গ হলো। কে জানে এ-সখের ফল কি হবে! শেষ পরিণাম কোথায় গিয়ে পৌঁছোবে! আত্মীয়-স্বজন হয়তো নিন্দায় শতমুখ হবে আর এইসবের জন্যে দায়ী করবে তারই স্বামীকে। এ-কী ঝঞ্ঝাট সেধে ডেকে আনা!

অভিমন্যুটাও কি তেমনি ? এ-যুগের ব্যাপারই এই। আধুনিক হবার নেশায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ব'সে আছে সবাই।

সুনীতিদের ছেলেবেলার সময়—কী কড়াকড়িই ছিলো! অথচ কী এমন যুগ-যুগান্তরের কথা সেটা! বেচারা সুনীতি, লেখাপড়া করবার কতো ইচ্ছে ছিলো তার! কিন্তু ক্লাস নাইনে উঠেই স্কুল ছাড়তে হলো তাকে, বড়ো হয়ে যাবার অপরাধে। ছাড়বার সময় অবশ্য একবার প্রস্তাব উঠেছিলো, বাড়ীতে একজন বুড়োসুড়ো মাষ্টার রাখবার, কিন্তু সংসারে আর পাঁচটা সাধু প্রস্তাবের মতোই সে প্রস্তাবও তলিয়ে গিয়েছিলো বিস্মৃতির অতল তলে।

তারপর বছর দুই কোথা দিয়ে কাটলো! মায়ের শরীর খারাপের ধাকায় যাবতীয় সংসারের কাজ পড়লো ঘাড়ে। অতঃপর জন্মালো মঞ্জরী। কিশোর সুনীতিকে নিতে হলো মায়ের আঁতুড় তোলার' দায়িত্ব। তখন তো আর

এমন হাসপাতাল যাওয়ার রেওয়াজ ছিলো না ? রক্ষণশীল ঘরের বধূ ভাবতেই পারতো না সে-কথা।

মঞ্জরী হামা দিতে শিখতে না-শিখতেই বিয়ে হয়ে গেলো সুনীতির। মনে আছে, শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কেঁদে ভাসিয়েছিলো বেচারা বোনটিকে কোলে ক'রে। সত্যি বলতে কি, দিদি জামাইবাবুর আদরের প্রশ্রয়েই মঞ্জরী আরো এতো দুঃসাহসিক।

সুনীতিই বাপ-মাকে ব'লে ওকে কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। বলেছিলো 'আমাদের তো হলো না, তবু ওর হোক্।'

হ্যাঁ, অনেক ছাড়পত্র পেয়েছে মঞ্জরী দিদির কাছে।

কিন্তু তাই ব'লে এতোটা! বোনের সিনেমায় নামার বদখেয়ালটা বরদাস্ত হচ্ছে না সুনীতির, আর শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়েছে অভিমন্যুর ওপর। মঞ্জরী সাজসজ্জা শুরু ক'রে দেয়, সুনীতি এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে, 'তোর শাশুড়ী-বুড়িকে দেখলাম না তো ? কোথায় ?'

মঞ্জরী বলে, 'আমার ওপর চটে-মটে মেয়ের বাড়ী চ'লে গেছেন।'

'সর্বনাশ করেছে! যা ভেবেছি তাই! ভেবেছিলাম বুড়ি এসব চালাচ্ছে কি ক'রে ? এখন উপায় ?'

মঞ্জরী গলার হারটা বদ্‌লে আর-একটা পরতে-পরতে বলে, 'বুড়ো-বুড়িরা তো চিরকালই থাকবে বড়দি! তারা গত হলে পরবর্তীকালে আবার বুড়ো হবে! তা'হলে সমাজে নতুন কিছুই কি চলবে না ?'

'তোমার সঙ্গে তর্কে পারি, এতো বিদ্যে আমার নেই।'

বিজয়বাবু বলেন, 'এই ছাখো! মেয়েটা যাচ্ছে একটা শুভ-কাজে, আর তুমি প্যান্‌প্যান্‌ করতে লেগে গেলে ? কি একেবারে পাপকাজ করছেন যেন! দোষটা কি ?'

'না দোষ নয়, খুব গুণ—' ব'লে বেজার মুখে বসে থাকে সুনীতি।

বিজয়ভূষণের সঙ্গে তর্কে জিতবে, সে সামর্থ্যও তার নেই। তর্কই চলে না তাঁর সঙ্গে। জীবনভর চেষ্টা করে এলো সুনীতি, স্বামীকে আর কোনদিন 'সিরিয়াস্' ক'রে তুলতে পারলো না! জগতের অন্ধকার দিকটা যেন তিনি দেখতেই পান না। জোর করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে হেসে ওড়ান।

অভিমন্যু যদি স্ফূর্তিবাজ, তো তিনি ভোলানাথ। কিন্তু স্ফূর্তিবাজ অভিমন্যুর ভিতর থেকে দেখা দিয়েছে আজ এক কঠিন মূর্তি, তাই না মঞ্জরীর এতো রাগ-অভিমান। এই তো আজন্ম দেখে আসছে দিদি কতো যা-খুশি ক'রে, কই জামাইবাবু তো কখনো কঠিন হন না।

সেবারে ছ'বছরের কচি ছেলেটাকে ফেলে রেখে সুনীতি যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে কেদার-বদরী চলে গেলো, ঘর-পরে কেউ আর নিন্দে করতে বাকি রাখেনি। বিজয়ভূষণের কিন্তু অ-ভাত শরীর।

মঞ্জরীই যখন দিদির অন্যায় নিয়ে জামাইবাবুকে বলতে গিয়েছিলো, বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেছিলেন,—'যেতে দে ভাই, যেতে দে। তোর দিদির স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথা হ'লে আমারও কিছু আশা রইলো। আঁচলের ডগায় বেঁধে হিঁচড়োতে-হিঁচড়োতে না নিয়ে যাবে কি? 'টোয়েন্টি-ফোর-আওয়ার্সের সার্ভেন্ট' একটা না থাকলে স্বর্গসুখের খানিকটা সুখ মরে যাবে যে!'

'থামুন আপনি।' ব'কে উঠেছিলো মঞ্জরী, 'আর এই খোকাটার অবস্থা? ঝি-চাকরের কাছে আবার অতোটুকু ছেলে ফেলে রেখে যায় লোকে? দুর্দশার একশেষ হচ্ছে না?'

'আহা-হা, আমার ওপর অতোটা অবিচার করিসনে ভাই।' বলেছিলেন বিজয়ভূষণ, 'আমি বাপ হয়ে ওর দুর্দশার একশেষ করছি, এটা কি মুখের ওপর বলা ভালো! বলবি, না হয় আড়ালে বলবি।'

'আড়ালে বলতে আমার দায় পড়েছে। যা বলবো সামনে!'

'তা বটে। তোরা যে আবার আধুনিক। কিছু রেখে-ঢেকে মিষ্টি ক'রে বলা তোদের আইনে নেই! যাক্, একটা ভ'ল হলো, এই দু'মাসে শিশুপালন পদ্ধতিটা শিখে নেবো।'

এই হচ্ছেন বিজয়ভূষণ। একেই বলে স্বামীর মতো স্বামী! তা নইলে স্ত্রী যতোক্ষণ স্বামীর এবং তার গোষ্ঠীবর্গের মতানু'তিনী হয়ে চলতে পারলো ততোক্ষণই ভালোবাসার জোয়ার বইতে লাগলো' অন্যথায় মুহূর্তে ভাঁটা—একে কি আর প্রেম বলে?...

উপরোক্ত কথাগুলি ভাবতে-ভাবতে জোরে-জোরে মুখে স্নো ঘষতে থ'কে মঞ্জরী। অতঃপর মঞ্জরী সাজসজ্জা সেরে চাকরটাকে যথাকর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে দিদি-জামাইবাবুর আগে গটগট্ করে গাড়িতে ওঠে।

❀ ❀ ❀

প্রযোজক নতুন, কিন্তু পরিচালকটি অভিজ্ঞ। বই পড়ে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশদ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের ভূমিকা বুঝিয়ে দিচ্ছলেন, কিন্তু মঞ্জরী যেন বারে-বারেই মনের খেই হারিয়ে যেলছিলো। যেসব অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবির পর্দায় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে, তাঁদেরই কয়েকজনকে নিতান্ত কাছে থেকে দেখে উৎসাহ যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

এই তো মনীশ চৌধুরী কিছুদিন আগে কি একটা ছবিতে এক ভাবভোলা

সে-ছবিটা দেখেছে মঞ্জরী শুধু মনীশ চৌধুরীর জন্যেই। দেখছে আর মনে হয়েছে, এ যেন সাধারণ জগতের জীব নয়, কোনো দেবলোকের। সেই মনীশ চৌধুরী হরদম ব'সে-ব'সে সিগারেট খাচ্ছে, তার ফাঁকে-ফাঁকে ডিবে খুলে পান খাচ্ছে, আর মুঠো-মুঠো জর্দা খাচ্ছে!

ছিঃ! আর এই কাকলী দেবীই বা কি! চোখে একরাশ কাজল' বড়ো-বড়ো ব্রোণ, বিশ্রী রংচঙে শাড়ী ব্লাউজ পরা, দেখলে বিশ্বাস করা যায়, ও সাজবে একটি গতিগতপ্রাণা বিলাসলাস্যবর্জিত গ্রাম্যবধূ?

আশ্চর্য! সর্বত্রই কি একেবারে কাছাকাছি এলেই মোহভঙ্গ হয়ে যায়? কি ঘরে, কি বাইরে।

'কই, কি হচ্ছে? আপনি মন দিয়ে শুনছেন কই?

ধুরন্ধর পরিচালক তীব্র কটাক্ষে প্রযোজকের শ্যালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কোমল অভিযোগ করেন।

'এখানটা আপনারই ভালো ক'রে শোনা দরকার। মনে রাখুন, বইয়ের হিরোইন শিউলী আপনার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর অল্প বয়সে পল্লীগ্রামে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বেশী লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। শ্বশুরবাড়ীতে লক্ষ্মী বৌ, রান্না করে, কুটনো কোটে, বাটনা বাটে পুকুরঘাট থেকে জল আনে, সকলের সেবা যত্ন করে। আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ আপনি—মানে, আর কি কলেজের মেয়ে 'শিখার' ভূমিকায় আপনি — কি খেয়ালে গিয়ে হাজির হলেন শিউলীদের গ্রামে। গিয়ে দেখলেন শিউলী ঘাটে এসেছে ঘড়ায় ক'রে জল নিতে। দেখে আপনার বিরক্তি···বাল্য সখীর উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য ও নারীর স্বাধীনতা নিয়ে খানিকটা ঝাঁঝালো বক্তৃতা এবং তার উত্তরে হিরোইনের মিষ্টিমধুর উক্তিতে ব্যঙ্গহাস্যে সবেগে প্রস্থান। বিশেষ কিছু খাটুনি নেই আপনার, শুধু—'

মঞ্জরী ক্ষীণস্বরে বলে 'শুধু ঐ একটা দৃশ্যেই?'

'না-না, আরো দু'বার দেখানো হবে আপনাকে, হিরোইনের বক্তব্য শোনানোর প্রয়োজনে। মানে আর কি—মূল বইতে এই 'শিখা' চরিত্রটা ছিলো না, হিরোইনের চরিত্র ফোটানোর জন্যেই—'

সুনীতি অবশ্য স্টুডিওতে আসেনি, পথেই তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে আসা হয়েছিলো। ফেরার সময় একা বিজয়বাবুর সঙ্গে।

বিজয়বাবু সোৎসাহে বলেন, 'যা দেখলাম, কিছুই নয়! ও তুই দিব্যি উৎরে যাবি। কি বলিস্?'

মঞ্জরী ফিকে হাসি হেসে বলে, 'কি জানি।'

'কিছুই নয়' বলেই তো তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। সে-যে 'কিছু

একটা' দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলো, চেয়ে এসেছে বরাবর। ছোট্ট একটি ভূমিকাতে সে রাখতে পারতো তার প্রতিভার স্বাক্ষর। কিন্তু এমনি তার ভাগ্যদেবতার পরিহাস যে, এমন ভূমিকা তাকে দেওয়া হলো, যেটা গ্রন্থকারের স্বষ্ট চরিত্রই নয়। বইয়ের কাহিনীতে সে ফালতু, শুধু নায়িকার চরিত্রকে ফোটাতে তার প্রয়োজন। উজ্জ্বল ছবির পিছনে মসীলিপ্ত পৃষ্ঠপট! পৃষ্ঠপটের মূল্য বোঝাবার ক্ষমতা জন্মায়নি মঞ্জরীর, তাই সাধ মেটাবার সুযোগ পেয়েও খুঁতখুঁতে মন নিয়ে ব'সে থাকে। নানা কথা কইতে-কইতে বিজয়ভূষণ এক সময় বললেন 'ব্যাপার কি বল তো? মনে আর তেমন স্ফূর্তি দেখছি না কেন? দেখে-শুনে ঘাবড়ে গেলি নাকি? তাহ'লে বাপু এখনো বল্!'

মঞ্জরী চাঙ্গা হয়ে বসে। এক ফুৎকারে নিজের মনোবৈকল্য এবং বিজয়ভূষণের সন্দেহ নস্যাৎ ক'রে দিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে 'হ্যাঁ, ঘাবড়ে যাবো না আরো কিছু! ভারী তো এই রোল।'

'তাইতো ভাবছি! ও-যা পার্ট, ও তো তোমাদের কাছে অভিনয়ই নয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ওই শিখা না ফিখা! ওর মতো যুগেই তো আছিস্ তোরা।'

মঞ্জরী হেসে ফেলে বলে, 'তাই বৈ কি! কতো ভেবে চলতে হয় তা জানেন? এখন এই ভাবনা হচ্ছে—শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী তো রেগে লাল হয়ে ব'সে আছেন, এখন—'

বলা-বাহুল্য, এ-কথাটা এইমাত্রই মনে উদয় হয়েছে মঞ্জরীর। তবে ভাবনারূপে নয়, কথা বলবার উপায় হিসেবে। বিজয়ভূষণ এ মনস্তত্ত্বের ধার ধারেন না, চলন্ত গাড়ীর মধ্যে অট্টহাস্য ক'রে উঠে বলেন, 'এখন কি ক'রে তাঁকে 'কালো' ক'রে তুলতে সক্ষম হবে, তাই ভাবছো তাহ'লে?'

গাড়ী এসে দরজায় থামে। নীচের তলায় ভাড়াটেদের ছেলেটা বসেছিলো সিঁড়ির কাছে, চাকরটা ছিলো তার পাশে। অন্যদিন হ'লে কিছু প্রশ্ন অন্ততঃ করতো! আজ বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে তর্‌তর্ ক'রে উপরে উঠে গেলো মঞ্জরী। উঠে গিয়ে দেখলো যথারীতি টেবিলের উপর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে, যথারীতি খাটের কাছে টুল টেনে তার উপর টেবিল ল্যাম্পটা বসিয়ে একখানা বই হাতে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আছে অভিমন্যু। বিরক্ত মনের অবস্থায় হঠাৎ কেন কে জানে ঐ দৃশ্যটা ভারী ভালো লাগলো মঞ্জরীর। তবে নাকি মান খোয়ানোর প্রশ্ন! তাই অভিমন্যুর সঙ্গে কথা না কয়ে শুধু গম্ভীরভাবে বিছানার একধারে গিয়ে বসলো।

বইয়ের নীচে থেকে একবার কটাক্ষপাত করলো অভিমন্যু।

মঞ্জরী বললো, 'মা ফেরেন্‌নি ?'

'ফিরেছেন।'

যাক্ বাবা! তাহ'লে অন্ততঃ মঞ্জরীর অপরাধের গুরুত্বটা কিছু হ্রাস হয়েছে। ঈষৎ নড়েচড়ে ব'সে মঞ্জরী সন্ধির সুরে বলে, তুমি গিয়ে নিয়ে এলে বুঝি ?'

'তাই না তো কি নিজে এসেছেন ব'লে আশা করো ?'

আশা ? সহসা অভিমানে চোখের কোণে জলের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্জরীর ভাগে একটা নিতান্ত অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা পড়ায় যে অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো জামাইবাবুর উপর, সেই মেঘটাই ঝরে পড়তে চায় অসতর্কতার বাতাসে। 'আমার আবার আশা! কারো কাছেই কিছু আশা করবার নেই আমার। চিরদিনের একটা সাধ ছিল—'

বইটা মুড়ে পাশে রেখে দেয় অভিমন্যু।

হাতটা বাড়িয়ে অভিমানিনীকে কাছে টেনে নেয়।

দেখে আপাততঃ মনে হয় মসৃণ সুন্দর কাঁচের বাসনখানার গায়ে সেই কালো দাগটা, একটা দাগই শুধু। চিড় খাওয়া নয়।

আর সকালে দু'জনকে দেখে মনে হয় নতুন ক'রে প্রেমের জোয়ার এসেছে দু'জনের প্রাণে। পূর্ণিমাদেবী বিরক্ত চিত্তে ভাবেন, ছেলেটা কি অপদার্থ! দু'দিন একটু শক্ত হয়ে থাক্ ? তা নয়, গলে যাচ্ছে একেবারে। ছিঃ!

গতকাল অভিমন্যু দিদির বাড়ি গিয়ে কুপিত জননীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। বৌয়ের হয়ে অবশ্য কিছু কল্পনাপ্রসূত ভাষণ দিতে হয়েছে।

মঞ্জরী নাকি শুধু ঠাট্টা ক'রে সিনেমা করার কথা জামাইবাবুর কাছে বলেছিলো, তিনি ভোলানাথ মানুষ, ঠাট্টাকে সত্যি ভেবে সব ঠিকঠাক ক'রে বসে আছেন। মঞ্জরী যদি এখন 'না' করে, সে ভদ্রলোকের আর 'মুখ' থাকবে না। কাজে-কাজেই বাধ্য হয়ে মঞ্জরীকে, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

ভোলানাথ বিজয়ভূষণ ঠাট্টাকে সত্যি ভাবলেও ভাবতে পারতেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ণিমাদেবী মিথ্যাকে সত্যি ব'লে ভুল করেন না। তবু ভুলের ভান করেন, সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস পান না। এ তবু ভালো। এই ছদ্মবেশীর মিথ্যার অবতারণা করেও ছেলে তাঁর কিছু মর্যাদা রেখেছে। অতএব নিমরাজি ভাব রেখে ফিরে যাওয়া চলে।

কিন্তু এটুকু তো তিনি আশা করতে পারেন যে, দু'চারটে দিন অন্ততঃ ছেলে তার বৌকে কিছুটা অবহেলা করবে। রাগ-রাগ, বিরক্তি-বিরক্তি ভাব দেখাবে। তা নয়—যেন কাল ফুলশয্যা হয়েছে, দু'জনে

এমনি ভাবে ডগমগ। ছিঃ! একশোবার ছিঃ!

*   *   *

বই প'ড়ে ভূমিকা বুঝিয়ে দেবার পর প্রায় মাসখানেক কেটে যায়, ও পক্ষে আর কোন উচ্চ-বাচ্য নেই। মঞ্জরীর নিজের থেকে খোঁজ নিতে লজ্জা করে।

অভিমন্যু বলে, 'তোমার জামাইবাবুর আর কোটিপতি হওয়া হলো না মঞ্জু, কোম্পানী বোধহয় অঙ্কুরেই নির্বান লাভ করলো।'

মঞ্জরী ঠোঁট উল্টে বলে, 'মরুক্‌গে।'

'আহা তোমার ওই চিরদিনের সাধটা।'

'কী পার্টই না' দিচ্ছিলো, মরি-মরি। না হ'লেই ভালো।'

স্ফূর্তিবাজ অভিমন্যুর কঠিন মূর্তিটা আর উঁকি মারে না। সে তার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যে উত্তর দেয়, 'তা সত্যি! নায়িকাই যদি না হতে পেলো তো জাত খুইয়ে লাভ কি?'

এদিকে পূর্ণিমাও ক্রমশঃ 'ছোটবৌমা' ব'লে ডেকে কথা কইছেন। সহসা এই স্থির গঙ্গায় আবার ঢেউ উঠলো। অপ্রত্যাশিত নয়, অবাঞ্ছিত যে। তাই আবার অভিমন্যুর জ্যোৎস্নাভরা মুখাকাশে নামলো মেঘ, পূর্ণিমার মুখে অমাবস্যা।

কি একটা ছুটির দিন, বিজয়ভূষণ একেবারে গাড়ি নিয়ে হাজির।

'এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নে, বইয়ের মহরৎ হচ্ছে।'

'মহরৎ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' শুভদিন দেখে একদিন—মানে, যে যতোই সাহেব হোক, পাঁজিপুঁথি দেখে একদিন শুভক্ষণে-শুভলগ্নে না কি করতে হয় এসব। মানে করে সবাই। তোকে আগে খবর দিতে বলেছিলো, আমারই বিস্মৃতি। যাক্‌গে দেরী আছে এখনো। তুই তৈরী হয়ে নে, আমি বসছি।,

অভিমন্যু নীরব। পড়া খবরের কাগজখানা থেকে চোখ আর ফেরাতে পাচ্ছে না। মঞ্জরী বিমূঢ়ভাবে এক পলক স্বামীর ভাবশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, 'এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নেবো, সে কি আর সম্ভব হবে?'

বিজয়ভূষণের এসব 'ভাব' এবং ভাবশূন্যতার প্রতি দৃষ্টিমাত্র নেই। তিনি সরব প্রতিবাদ ক'রে ওঠেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হওয়া যাবে না। ক'খানা শাড়ী পরবি? হুঁঃ। বললে তো তোমাদের আবার গোসা হয়। সাধে কি আর 'মানুষ' কথাটার আগে একটা 'মেয়ে' শব্দ

জুড়েছে? নে বাবা, সওয়াঘণ্টা সময় নে। আমারই যখন দোষ, থাকছি ব'সে। ততোক্ষণ একটা তাকিয়া দে, তোফা খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তার আগে এক গ্লাস জল।...এই যে অভিমন্যু লাহিড়ী, আপনার কার্ড নিন। উঠে প'ড়ে বেশ পরিবর্তন করে ফেলুন।'

'আমি? কোথায় যাবো?' গম্ভীর হাস্যে প্রশ্ন করে অভিমন্যু।

'কোথায় আর! সাজঘরে। ছায়াচিত্রের আঁতুড়-ঘরেও বল্তে পারো।'

'পাগল হয়েছেন?'

'পাগল তো হয়েই আছি রে দাদা! এঁদের হাতে যখন পড়েছি।'

'আমার যাবার দরকার নেই। আপনারাই যান।'

বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেন, 'কেন, গেলে বুঝি অধ্যাপক মশাইয়ের সম্ভ্রমের হানি হবে? এতো তো আধুনিক, এ বিষয়ে এখনো পিউরিটান্ আছে? কাল বদলেছে ভায়া, কাল বদলেছে। যেকালে থিয়েটারের রাস্তা কোন্‌মুখে শুধোলে, সভ্য ভদ্দরলোকেরা উত্তর দিতো 'জানি কিন্তু বলবো না', সেকাল আর নেই। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই হচ্ছেন সিনেমা থিয়েটারের কর্ণধার। তাছাড়া গিন্নীকে যখন পর্দা আলো করতে ছেড়ে দিচ্ছো, তখন অতো শুচিবাই করলে চলবে কেন?'

অভিমন্যু অবশ্য এমন নির্বোধ নয়, যে ধরা পড়বে। অতএব সেও হাস্যবদনে বলে, 'কাজ আছে বড়দা, না হ'লে যেতাম।'

'কাজ? হুঁ! তুমি আবার এত কাজের লোক কবে হ'লে হে? আসল কথা বুঝেছি, চক্ষুলজ্জা হচ্ছে। আচ্ছা থাক্। এ লজ্জা ভাঙবে।... ছোটশালী, একটা বালিশ দাও।'

❋ ❋ ❋

সংবাদটা ঘোষিত হতে দেরী হয় না। নতুন কোম্পানীর প্রথম বইয়ের মহরতের সংবাদ এবং সেখানে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ভদ্রজনের ও শিল্পীবৃন্দের গ্রুপ্-ফটো সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছে কাগজে। কারণ, অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজন যেমন-তেমন হোক, কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের রিপোর্টারদের সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছিলো, এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহার করা হয়েছিলো ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য "অতিথি নারায়ণ" নীতির অনুসরণে। শেষমেশ ভক্তি-অর্ঘ্যের নমুনা স্বরূপ প্রত্যেকের গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো, এক-একটি হৃষ্টপুষ্ট সন্দেশের বাক্স।

বিজয়ভূষণ নিজে ব্যবসাবুদ্ধিহীন হলেও তাঁর যে হিতৈষী বন্ধুটি তাঁকে এক টাকাকে একশো টাকা ক'রে তোলবার ফিকির শেখাতে নামিয়েছেন,

তিনি রীতিমত ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন। প্রতিপক্ষকে প্রথম থেকেই হাতে রাখবার কৌশল প্রয়োগ করেছেন তিনি। অতএব গ্রুপফটোর প্রত্যেকের তলায়-তলায় নাম পরিচয় ছাপা হয়। আর তরুণমহলে কাকলীদেবীর পার্শ্ববর্তিনী নবাগতা মঞ্জরীদেবীর মুখের কাট সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়ে যায়। এসব ব্যাপারে নামটা যে বদলালে ভালো হতো সে কথা মনে পড়ে এখন আর ভেবে লাভ কি। ইতিমধ্যে তো আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধব সকলের গোচরীভূত হয়ে গেছে নাম। এ সংবাদ ঘোষিত হবার পর আত্মিয়-সমাজে মঞ্জরীর ভয়াবহ ভবিষ্যতের কল্পনা, আর সেই নিয়ে আলোচনা ছাড়া কয়েকদিন আর কোনো কাজ থাকে না। অভিমন্যুর বন্ধুরা ভাবতে থাকে অভিমন্যুর ভবিষ্যৎ। তারা বাড়ী ব'য়ে এসে ব'লে যায়, 'নিজেই পায়ে কুড়ুল মারলে ভাই। এখন ফ্যাশানের খাতিরে করে বসলে বটে, পরে কিন্তু পস্তাতে হবে।'

অভিমন্যু প্রতিবাদ করে না, শুধু হাসে। বন্ধুরা রেগে বলে, 'এখন হাসছো ? আচ্ছা এরপর দেখবো। 'পরে কাঁদবি, বুঝলি ?'

অভিমন্যু মুচ্‌কি হেসে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তখন তোমরা হেসো।'

এমনভাবে বলে যেন হাসিটা তার কাছে পরম উপভোগ্য হবে।

বন্ধু সগর্জে প্রশ্ন করে, 'মুখটা কার ?'

'আমারই।'

'চমৎকার।'

* * *

অভিমন্যুর দিদিরা দু'জনে থাকেন কলকাতায়, দু'জন বিদেশে। যাঁরা বিদেশে থাকেন, তাঁরা আগেই অপর ভগ্নীদের পত্রে কানাঘুষো কিছু শুনেছিলেন, এখন সংবাদপত্র পাঠমাত্র সবেগে পত্রাঘাত করলেন। সে-সব পত্রের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও মর্মকথা একই। দু'জনে ইনিয়ে-বিনিয়ে এই কথায় বুঝিয়েছেন—অভিমন্যু একেবারে পাগল, ক্ষ্যাপা, উন্মাদ, পণ্ডিত-মূর্খ, অপরিণামদর্শী—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে দিদিরা কলকাতায় থাকেন, তারা নিজেরাই এলেন সবেগে। বড়দি রক্তমূর্তি হয়ে বললেন, 'তুই ভেবেছিস কি ? আমরা কি ম'রে গেছি ?'

অভিমন্যুর অটল হাসি-মুখ। 'সর্বনাশ! খামোকা এমন অলক্ষণে কথা ভাবতে যাবো কেন ?'

'থাম্-থাম্। চুপ কর ? সবরকম বংশের মুখ ডোবালি ?'

অভিমন্যু বললো, 'তোমরা ছ'জনে মিলে সেই ডুবন্ত মুখকে টেনে তুলতে পারবে না?'

'কাকে আর কি বলবো। তোর মতো বদ্ধ বেহায়াকে কিছু বলতে আসাই ঝকমারি। কিন্তু আমরা যে শ্বশুরবাড়ীতে মুখ দেখাতে পারছি না। ছোটঠাওর যখন কাগজখানা হাতে ক'রে বাড়ী মাথায় করতে করতে খবর দিলো—বৌদি, কাগজে তোমার ছোট ভাজের ছবি বেরিয়েছে। এই ছাখো—'নবাগতা মঞ্জরীদেবী'! তখন যেন আমার মাথাটা কাটা গেলো। ছি-ছি!'

অভিমন্যু সহাস্যেই বলে, 'বৌ যখন বিয়ের পর এম-এ পড়তে চেয়েছিলো, তখনো তো তোমাদের লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিলো।'

'তাই বুঝি এই অপরূপ গৌরবের কাজটার বেলায় আর কারুর পরামর্শ টুকুও নেওয়ার দরকার বোধ করোনি?'

'ঠিক বুঝেছো।'

ছোড়দি এসে প্রথমে গেলেন ভাইবৌয়ের কাছে। বললেন, 'এসব চলবে না। আমার বাপের বংশের সুনাম কলংকিত করবার তোমার অধিকার নেই।'

মঞ্জরী। এঁদের কাছে বরাবরই নতমুখ-নম্রবাক। বিয়ের সময় অনেক হাঁকা কথা আর ব্যঙ্গ কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিলো তাকে, কেবলমাত্র অভিমন্যু তাকে আগে থেকেই এসব বিষয়ে প্রস্তুত করে রেখেছিলো। এখনও চোপা করলে না। শুধু শান্তভাবে বললো, 'একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এতো বড়ো ক'রে দেখছেন কেন ছোড়দি?'

'তুচ্ছ? তা তোমার কাছে তুচ্ছ বৈকি। আমার বাবার বংশমর্যাদার মর্ম তুমি কি বুঝবে? স্টেজে নেচে-গেয়ে দেহসৌষ্ঠব দেখিয়ে বাহবা কুড়ানো যায় ছোটবৌ, সম্ভ্রম পাওয়া যায় না।' ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো মঞ্জরীর, কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মুখটা ছাইয়ের মত বিবর্ণ কালচে।

অভিমন্যু ওপাশে ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়েছিল। ওর ওই মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভারী মমতা লাগালো তার। চুপ ক'রে থাকতে না পেরে বললো, 'এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ছোড়দি।'

'বাড়াবাড়ি।' ছোড়দি নাক কুঁচকে বললেন, 'তা বটে। বাড়াবাড়িটা আমাদের কিন্তু, তোর রোজগারে বুঝি আর সংসার চলছে না! উনি বলছিলেন, অভিমন্যুকে বোলো সে যদি চাকরি করতে চায় তো আমার অফিসে চাকরি করে দিতে পারি। মোটা মইনের কাজ!'

'উনি' যখন বলেছেন, তখন একবার বিবেচনা করা দরকার।'

ছোড়দিকে 'উনি' নিয়ে ক্ষ্যাপানো অভিমন্যুর চিরদিনের অভ্যাস। রাগ ক'রে চলে গেলেন ছোড়দিকে মাতৃ-দরবারে। সেখানে অনেক কথা, অনেক আক্ষেপ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, মা বিনা বাক্যব্যয়ে ছোট মেয়ের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। অভিমন্যু গিয়ে মা'র চাদরের খুঁট্ ধরে বললো, 'মা' কি পাগলামী হচ্ছে।

মা বললেন, 'পাগল বলেই তো তোমাদের মতো বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না বাবা। ছাড়ো।'

অভিমন্যু দৃঢ়স্বরে বলে, 'বেশ, আমাকে ত্যাগ করো তো তোমার অন্য ছেলেদের কাছে যাও। জামাইবাড়ী গিয়ে থাকা চলবে না।'

ছোড়দি ফুঁসে উঠে বললেন, 'ওঃ, তার বেলায় বাবুর লজ্জা ফেপে উঠলো, কেমন।'

'তা উঠলো।'

'কেন, আমরা মা'র সন্তান নই বুঝি?'

পূর্ণিমা বাধা দিয়ে বললেন, 'তর্ক থাক্ ইন্দু, কারুর বাড়ীতেই আর থাকতে রুচি নেই, তুই বাড়ী যা। আমি খড়দায় গিয়ে থাকবো।'

খড়দায় পূর্ণিমার গুরুবাড়ী। খড়দায় অবশ্য গেলেন না, কিন্তু এমনভাবে থাকতে লাগলেন বাড়ীতে, যেন এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর।

* * *

ওদিকে স্যুটিং সুরু হয়ে গেছে। অভিমন্যুর সেখানে এক অদ্ভুত অবস্থা।

আমার স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী, তার ওপর আমার কন্ট্রোল নেই, একথা স্বীকার করা চলে না। কাজেই সকলের সমস্ত গালমন্দ হজম ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হয় তাকে। লোকের কাছে দেখাতে হয় তার নিজের সখেই এই অঘটন। আর সেই হাসি-ঠাট্টার পরই মঞ্জরীর উপর স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করতে লজ্জা হয়। বরং মাঝে মাঝে মুখ ফস্কে ব'লে ফেলতে হয়, 'বাবা, কি যে করছে সব। একেই বলে তিলকে তাল।'

মঞ্জরী চুপ ক'রে থাকে। কারণ তার নিজের মা-দাদাই বাড়ী বয়ে এসে যথেচ্ছ কটুকাটব্য ক'রে গেলেন।

তবু ছবি উঠছে। লোকলজ্জা শুধু একদিনেই থাকে না। এতদূর এগিয়ে পিছিয়ে পড়াও যে মৃত্যুতুল্য। 'স্ত্রী আমার অবাধ্য' একথা স্বীকার করা পুরুষের পক্ষে যেমন অপমানজনক, মেয়েদের পক্ষেও তেমনি অপমানকর—

দাম্পত্যজীবনে আসুক মনোমালিন্যের মালিন্য, সংসারে নামুক অশান্তির বিষাক্ত বাতাস, বাইরের জগতের সুখ থাক্।

বাইরের লোক জানুক আমি উদার, আমি স্বাধীন।

মঞ্জরীর বাপের বাড়ীর অপরাপর লোকদের এ ব্যাপারে বংশ-মর্যাদা হানির প্রশ্ন নেই, কাজেই তাঁরা সকৌতূহল প্রশ্নে স্টুডিও আর স্যুটিং সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, এবং সহাস্যে বলেছেন, 'ধন্যি মেয়ে। খুব যাহোক কীর্তি রাখলে বাবা।' অবশ্য এ পক্ষেও এমন দু'চারজন আছেন। যথা অভিমন্যুর দুই বৌদি। একজন থাকেন থিয়েটার রোডে অপরা সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুতে, কিন্তু একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে। হঠাৎ একদিন একজনের গাড়ী চ'ড়ে দু'জনে বেড়াতে এলে পুরনো বাড়ীতে। বিজয়া দশমীর পরে সময় সুবিধা মত একদিন শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে যাওয়া ছাড়া এ-বাড়ীতে পদার্পণ তাঁরা দৈবাৎ করেন। তবে এলে অবশ্য সপ্রতিভ ভাবের ঘাটতি দেখা যায় না। এসেই তাঁরা অভিমন্যুর ঘরে জাঁকিয়ে বসলেন। বললেন, 'তুমিই যাহোক একটা কিছু করলে ছোট ঠাকুরপো পাঁচজনের কাছে বলতে-কইতে মুখোজ্জ্বল। আর কি অদ্ভুতদের হাতে আমরা পড়েছি! একালের হালচাল কিছু শিখলো না গো! বোঝে খালি পয়সা, আর জানে খালি ব্যবসা! ছি!'

অভিমন্যু মৃদুহাস্যে বলে, 'সেটা আপনাদের কপাল দোষ নয়, ক্যাপাসিটির দোষ। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার ক্যাপাসিটি থাকলে আর আক্ষেপ করতে হতো না!'

'তা সত্যি! সে হাতযশ ছোটবৌয়ের আছে।—তা ছোটবৌ, সিনেমার পাশ-টাস দিবি তো ভাই? জীবনভর খালি পয়সা খরচা করেই দেখে এলাম, এবার বিনিপয়সায় দেখা যাবে, কি বলো মেজবৌ?' মেজবৌ হেসে গড়িয়ে পড়েন। অভিমন্যুর মুখটা আর কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে চায় না। মঞ্জরী অতিথি বড়োজায়েদের 'সেবা'র জন্য ইলেকট্রিক হীটারটাকে জ্বালাতে বসে।

ওঁরা আর একগাল হেসে মন্তব্য করেন, 'একেই বলে লক্ষ্মীবৌ। দরকার হ'লে সিনেমা থিয়েটার করতে পারে, দরকার পড়লে গেরস্থালী কাজও করতে পারে। আর আমরা? হি-হি-হি। পারি খালি খেতে, ঘুমোতে, আর দিন-দিন মোটা হতে।—ছোটবৌ আমাদের দলে আসেনি। দিব্যি তালপাতার সিপাইটি আছে। না থাকলেই-বা চলবে কেন? হ্যাঁ-রে ছোটবৌ নাচতে-টাচতে হবে তো?'

কান মলে মঞ্জরী, আর ভাবে, যা হয়েছে-হয়েছে বাবা, এই শেষ। কে জানতো, এই একটা জিনিষ নিয়ে এতো তোলপাড় হবে!

ছবি রিলিজের দিন বিজয়ভূষণ আবার এলেন। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই, যেতেই হবে অভিমন্যুকে। না যাওয়াটা অশোভন! তাছাড়া আজ না গেলে ধরা প'ড়ে যাবে অভিমন্যুর বিরুদ্ধ মনোভাব। কৌতূহলও আছে। আর—আর? হ্যাঁ মমতাও আছে বৈকি! সত্যিই কি আর পাষাণ হয়ে গেছে অভিমন্যু? ও কি আর মঞ্জরীর জল ছলোছলো চোখ, অভিমান কাঁপা-কাঁপা ঠোঁট, আর বিষাদ মুখ দেখতে পাচ্ছে না? না, দেখে মন কেমন করছে না? কিন্তু কি করবে? ঘরে-পরে সকলে ব্যাপারটাকে এতো বেশী ফেনাচ্ছে, আর এতো ধিক্কার দিচ্ছে অভিমন্যুকে, যার জন্যে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না সে। বাইরে হাস্যবদনে লোকের কথা শুড়াচ্ছে, ভেতরে ততো গুম্ হয়ে যাচ্ছে। আজ তাই ফর্সা পাঞ্জাবীর ওপর একখানা শাল গায়ে দেখতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মঞ্জরীর কাছাকাছি এসে, নিজস্ব ভঙ্গিমায় হাসি-হাসি সুরে বললো, 'কি রকম দেখাচ্ছে? স্টারের স্বামী ব'লে মনে হচ্ছে?' অনেকদিন এমন ভালো সুরে কথা বলেনি অভিমন্যু। কিসে যে কি হয়। জল ছলোছলো চোখ আর শুধু ছলোছলো থাকে না, উছলে ওঠে।

'এই ছ্যাখো। এ-কী হচ্ছে? আরে?'

মঞ্জরী ফর্সা পাঞ্জাবী আর দামী শালকে কেয়ার করে না। চোখের জলে ভিজে ওঠে সেগুলো। অভিমন্যু ধীরে-ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোয়। নিজের উপর নিজের ভারী একটা ধিক্কার আসে, আসে অনুশোচনা। বেচারা মঞ্জু, না বুঝে একটা ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছে সত্যি, কিন্তু তার জন্যে কম লাঞ্ছনা তো পাচ্ছে না? আর অভিমন্যুও কিনা নিতান্ত নির্মায়িক ভাবে বাইরের লোকের মতোই ব্যবহার করেছে! করেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর বিরূপতা! নাঃ! ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কি একটা বলতে গেলো, বলা হলো না।

* * *

বিজয়ভূষণ হাঁক পাড়লেন,—প্রাইজ-টাইজগুলো পরে এসে দিলে হতো না? ওদিকে যে সময় চলে গেলো।'

সময় চলে গেলো! তাই বটে। সময় ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে। দু' দণ্ড বসার অবসর নেই, অবসর নেই শান্ত হয়ে ব'সে একবার আপনার হৃদয়খানিকে মেলে ধরবার। অবকাশ নেই আপনাকে নিয়ে চিন্তার

পিছু-পিছু! অশান্ত উদ্বেগ। দুঃসহ প্রতীক্ষা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথা, ছায়াছবির কাহিনী ছায়ার মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে, চৈতন্যের জগৎ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। কখন আসবে সেই মহামুহূর্ত! যখন পর্দার গায়ে ঝলসে উঠবে অশরীরি একখানি শরীর! দেহ নয়, দেহাতীত। জ্ঞানবিধি বহু রূপে, বহু সাজে আরশির মাঝখানে যাকে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, ভালবেসেছে, আশ মেটেনি, তাকে নতুনরূপে নতুন সজ্জায় অভিনব এই পর্দার আয়নায় একবার দেখবার জন্যে কতো না সংগ্রাম! আজ সেই সাধনার সিদ্ধি, স্বপ্নের সাফল্য! মন্ত্রাবিষ্টের মতো নিথর হয়ে ব'সে আছে মঞ্জরী। বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই ওকে দেখা যাবে। কি-না! অবশেষে এল সেই ক্ষণ! মঞ্জরী এসে দাঁড়ালো পর্দার গায়ে! ঘুরলো-ফিরলো, কথা বললো, চলে গেলো! আবার এলো, আবার কথা বললো। কিন্তু কি কথা বললো? কি স্বর? কার স্বর? শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি কি হারিয়ে ফেলেছে মঞ্জরী? নইলে কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না কেন? ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোই কি শুধু চোখের তারায় এসে হাজির হয়েছে?

'কি রে, উঠবি না কি? বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছিস্ যে একেবারে।'

সুনীতির ঠেলায় চমকে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জরী।

'চল্-চল্, ওরা নেমে গেলো!' ব'লে সুনীতি চলে এগিয়ে।

দেখা গেলো, সুনীতির মেয়েরা হাসতে-হাসতে ঠেলাঠেলি ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। গাড়ীতে উঠতে ছাড়াছাড়ি। বিজয়বাবু এখন যাচ্ছেন না, এখানে আরো বন্ধুবান্ধব রয়েছে। সুনীতি মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে চলে গেলো বাড়ীতে, এরা ফিরে এলো ট্যাক্সিতে। দু'জনের কেউ কথা বলছে না। ট্যাক্সির মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। শুধু থেকে-থেকে এক-একটা হালকা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। কে জানে সে নিঃশ্বাস উঠছে কার বুক থেকে। প্রথম কথা কইলো অভিমন্যুই। গায়ের জামাটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রাখলো, আর সেই অবকাশে পিছন ফিরেই বললো, 'বেছে-বেছে ভূমিকাটা দিয়েছে ভালো!'

মঞ্জরী আজ প্রতিজ্ঞা করেছিলো কিছুতেই রাগবে না। রাগা মানেই তো হার মানা! কিন্তু অভিমন্যুর এই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গমিশ্রিত ছোট্ট মন্তব্যটুকু সে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে দিলো না। সেও ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলো, 'তা সত্যি বটে! নায়িকার ভূমিকাটা পাওয়া উচিত ছিলো আমারই।'

'নায়িকা না হোক, অন্য কিছু হতে পারতে! পর্দার গায়ে রূপই

'কদর্য !'

'তাছাড়া ? যেমনি চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি, তেমনি কুৎসিত মুখভঙ্গি। করেছিলে কি ক'রে তাই ভাবছি।' ব'লে নাক কুঁচকে বিছানায় এসে বসে অভিমন্যু।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্জরীও মনে হলো—সত্যিই তো কি ক'রে করেছিলো সে। বিজয়ভূষণ বলেছিলেন, 'তোর কাছে তো পার্ট পার্টই নয়, ন্যাচারাল! দিব্যি একখানি আপ-টু-ডেট মেয়ে।' কিন্তু সত্যিই কি তাই ? চরিত্রটা একটি অতি আধুনিক মেয়ের ব্যঙ্গচিত্র। স্তব্ধ অরণ্যে উঠলো আলোড়ন! অনেকদিনের সঞ্চিত অশ্রু, অনেকক্ষণের ভারাক্রান্ত হৃদয়ভাব, অনেক অপমানের জ্বালা আর অভিমানের বেদনা, সহসা উছলে উঠলো দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাসে। আর সেই নিতান্ত পরাজয়ের স্বাক্ষর অভিমন্যুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মঞ্জরী অভিমন্যুর দিকে না তাকিয়ে।

সারারাত এলো না এ-ঘরে। অভিমন্যুও ডাকলো না মন খাটো ক'রে। ভাবলো, উঃ, এতো রাগ। অভিমানের বেদনাকে রাগ ভেবে ভুল করেই তো সংসারের যতো অনর্থপাত। সমস্ত রাত ঘুমিয়ে উঠে শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে অভিমন্যু প্রতিজ্ঞা করলো, বেশ ওর কোন কথায় আর থাকবো না। ওকে দেখিয়ে দেবো ওর কোন ব্যাপারেই কিছু যায়-আসে না আমার। আর সমস্ত রাত জেগে আর ভেবে মঞ্জরী সংকল্প করলো, বেশ আরও একবার নেবো চান্স্। সইবো আত্মীয়-বন্ধুর গঞ্জনা, কুড়োবে নিন্দে, তবু দেখিয়ে দেবো ওকে, সুন্দর রূপ ফোটাবার ক্ষমতাও মঞ্জরীর আছে। মহিমাময় সুন্দর রূপ !

'প্রেমে উজ্জ্বল, গৌরবে সমুজ্জ্বল! কিন্তু কোথায় আছে চরিত্র ?' বিজয়ভূষণের সখ বোধকরি মিটবে, তখন মঞ্জরী কাকে ধরবে তবে ? লুকিয়ে গিয়ে পরিচালক কানাই গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করবে ? আবদার করবে তাঁর পরবর্তী ছবির নায়িকার ভূমিকার জন্যে ?

* * *

ছোটজা ও দেওরকে নেমন্তন্ন করার সখ অভিমন্যুর বৌদিদের কদাচ দেখা যায়। সেই কদাচটি দেখা গেলো ক'দিন পরে—মেজবৌদি রঞ্জিতার কাছ থেকে। টেলিফোনে নেমন্তন্ন নয়, মেজদা প্রবীর স্বয়ং অফিস ফেরত গাড়ী ঘুরিয়ে এসে ব'লে গেলেন, 'ওরে মনু, তোর বৌদি কাল তোদের যেতে বলেছে। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি। ছোট বৌমাকে নিয়ে

'হঠাৎ নেমন্তন্ন ?'

'নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন কিছু নয়, অনেকদিন তো একসঙ্গে খাওয়া-টাও হয়নি, তাই তোর বৌদি বললে—ব'লে এসো ওদের। ছুটি রয়ে কাল! নতুন কি এক পোলাও রান্না শিখেছেন—'

'আমার ওপর দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে বুঝি? হেসে উঠে অভিমন্যু।

হেসে উঠলেন মেজদাও। হাসির আওয়াজ মেলাবার আগেই স্টা দিলেন গাড়ীতে। জানা আছে মা এখানে নেই, নিশ্চিন্ত। থাকে সৌজন্যবোধের দায়ে একবার অন্তত: নামতে হতো দেখা করতে।

যেতেই হবে। বড়োভাই ছোটভাইকে আদর করে অনুরোধ ক গেছে 'অনেকদিন একত্রে খাওয়া হয়নি' ব'লে, এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা কর যায় না। কিন্তু মঞ্জরী বেঁকে বসলো। বললো, 'তুমি যাও, আমি যাবো না।'

'না যাবার কারণটা কি দর্শাবো?'

'বোলো, শরীর খারাপ।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'তা বটে!' মঞ্জরী তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমার তো ওই প্রাপ্য। যাক্, আজ বিশ্বাস না করুন ভবিষ্যতে করতেও পারেন।'

অভিমন্যু থমকে বললো, 'মানে?'

'মানে নেই।'

'মানে নেই?'

'না।'

অভিমন্যু একবার ওর মুখের দিকে তাকালো।—সত্যিই তো অস্বাভাবিক ক্লান্ত আর করুণ দেখাচ্ছে মঞ্জীকে। মুখটা শুকনো, রংটা ফ্যাকাসে, চোখদু'টো ছল্‌ছলে। চোখের নীচে কালি। ভারি মায়া লাগলো। কতোদিন মঞ্জরীর মুখের দিতে তাকি দেখেনি অভিমন্যু?

সন্দিগ্ধভাবে বললো, 'ঠিকই তো! তোমাকে তো খুব খারাপই দেখাচ্ছে কি হয়েছে বলো তো?'

অভিমানিনীর বড়ো ভয়, পাছে প্রিয় স্নেহস্পর্শের বাতাসে ঝ'রে পড়ে পানার আগায়-আগায় সঞ্চিত শিশিরকণা। সে বড়ো লজ্জার। তার চাইতে হেসে ওঠা ভালো। হোক সে হাসি অস্বাভাবিক।

'এতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'ইচ্ছে করে শরীর খারাপ দেখাচ্ছি, অভিনেত্রী কিনা!'

অভিমন্যু নিষ্পলক দৃষ্টিতে একবার ওর ওই অসঙ্গত হাসি-মাখানো মুখের :কে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বললো, 'কি জানি! তবে না গেলে কিন্তু :মজদা-মেজবৌদি খুব দুঃখিত হবেন।'

'তুমি তো যাচ্ছো!'

'আমি তো আধখানা—' মিষ্টি একটু হাসলো অভিমন্যু।

'তুমি একাই একশো!' মঞ্জরীও হাসলো আরো মিষ্টি ক'রে।

'সত্যিই যাবে না?'

'না-গো। ভালো লাগছে না।'

'আমার মন কেমন করবে।'

'আহা!'

'আহা মানে? মেজবৌদির হাতের নতুন পোলাও খাবো আর চোখ দিয়ে জল ঝরবে!'

নিজস্বভাবে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠলো মঞ্জরী, অনেকদিন আগের াতো। হেসে-হেসে বললে, 'তা ঝরতে পারে। সব মশলার সেরা মশলা য লঙ্কা, মেজদি। এ থিয়োরিতে বিশ্বাসী।'

'বাড়ীতে তাহ'লে আজ তোমার জন্যে ভালো-ভালো রাঁধতে দাও?'

'কি যে বলো!'

'কেন অন্যায় কি বলেছি? নিজেদের বিষয়ে উদাসীন ভাব, ওটা পৌরাণিক হয়ে গেছে।'

'উদাসীন আবার কি? রোজ কত যেন খাচ্ছি!'

'খাচ্ছো না?' অভিমন্যু আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে বলে, আমার ওপর রাগ ক'রে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছো?'

হ্যাঁ, দিয়েছি! বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে চান করতে যাও দিকি! রী হ'লে মেজবৌদির কাছে বকুনি খাবে।'

'ওই জিনিষটাই খেয়ে মানুষ আমি।' শিস্ দিতে-দিতে স্নানের ঘরে াকে অভিমন্যু। তার উদ্দাম স্নানের কলকল্লোল ধ্বনি শোনা যায় াইরে থেকেই।

চিরদিনের নির্মল নীল আকাশ কখনো ঢাকা প'ড়ে যায় ভুল বোঝার য়াশায়, আবার ঝলসে ওঠে সহজকথা আর সহজহাসির সূর্যোদয়।

* * *

খানে গিয়ে অভিমন্যু দেখলো চাঁদের হাটবাজার। দুই দিদি এসেছেন,

এসেছেন মা। বড়বৌদি এসেছেন বড়দাকে বাড়ীতে রেখে। মোট ক
বেশ মোটা খরচ ক'রে বসেছেন মেজগিন্নী। উপলক্ষ্য? উপলক্ষ্য কি
নয়, এমনি। তবে নাকি অভিমন্যু চিরকেলে দুষ্টু, তাই আবিষ্কার ক'
বসলো অন্তর্নিহিত উপলক্ষ্য—অভিমন্যুর বিচার! কিন্তু বড়ো ব্য
পেয়েছেন এঁরা, তার অপরাধের দলিলটি সঙ্গে না দেখে; তাহ'
সত্যিকার জমতো।

'ছোটবৌ এলো না?'

'ওমা, সেকি?'

'কেন?'

'শরীর খারাপ?'

'কই, কাল কিছু শুনলাম না তো?'

'হঠাৎ এমন কি হলো, যে একবারটির জন্যে আসতেই পারলো না?'

এক ডজন প্রশ্নকর্ত্রী, উত্তরদাতা একা অভিমন্যু। প্রত্যেকের প্রশ্নে
অবিশ্বাসের সুর। প্রত্যেকের মুখের আশাভঙ্গের গ্লানিমা। আশাভঙ্গে
আক্ষেপ শেষ হ'লে সুরু হলো আসল কাজ।

'অভিমন্যু কি ভেবেছে?'

'একবারেই শিক্ষা হয়েছে, না জের চলতে থাকবে?'

'ও বড়ো ভয়ানক নেশা।'

'বাঘিনীর কাছে রক্তের আস্বাদ! এই বেলা অঙ্কুরে বিনষ্ট না করলে
অভিমন্যুর আর রক্ষে নেই।' 'স্ত্রী যদি প্রফেশন্যাল অভিনেত্রী হয়ে দাঁড়ায়
অভিমন্যুকে আর প্রফেসরী ক'রে খেতে হবে?' নানা ছন্দে, নানা ভাষায়
নানা কসরতে একই প্রশ্ন। আশ্চর্য! অভিমন্যু আগাগোড়াই অবিচল
স্ত্রীর কাজটাকে আদৌ নিন্দনীয় ব'লে স্বীকার করলো না সে, উল্টে সমর্থ
করলো। বললো, 'কার ভেতর কি প্রতিভা লুকানো থাকে, কে বলতে
পারে? হয়তো—কালে মঞ্জরীদেবীই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ তারকা হয়ে
উঠবেন।

'প্রতিভা! প্রতিভার গলায় দড়ি! তুই তখন বেশ বড়োমুখ ক'রে
বেড়াতে পারবি তো?'

'অবশ্যই! কেন নয়? তখন বড়ো গাড়ী চ'ড়ে বেড়াবো নিশ্চয়।
বড়ো গাড়ী চড়লে মুখ আর বুক আপনিই বড়ো হয়ে ওঠে।'

'ছাত্রীরা গায়ে ধুলো দেবে।'

ছাত্রী? দিন পেলে আর ছাত্রী ঠেঙাতে যাচ্ছে কে? পায়ের ওপর পা
দিয়ে ব'সে খাবো। এবং ভবিষ্যতে একদিন ডিরেক্টর হয়ে জাঁকিয়ে বসবো।'

—কথায়-কথা বাড়লো, তর্কে-তর্ক। কিন্তু কিছুতেই পেড়ে ফেলা গেলো না অভিমন্যুকে! মঞ্জরীকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিলো অভিমন্যু, না-আসার জন্যে! তারিফ করলো তার বুদ্ধির। সঙ্গে এলে সামনে থাকলে কি হতো বলা যায় না। থাকলে হয়তো এতো ফ্রি হতে পারতো না অভিমন্যু। অবশেষে এঁরা হাল ছাড়লেন। বুঝলেন, একেবারে স্ত্রৈণ হয়ে গেছে ছেলেটা।

এরপর সমস্যা পূর্ণিমাদেবীকে নিয়ে। রাগ করে চলে গিয়েছিলেন মেয়ের বাড়ী, সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! অথচ জেদ রয়েছে প্রবল। অতিষ্ঠ অবশ্যই উভয়পক্ষেই। ছোট মেয়ে এসে অভিমন্যুকে বললো, 'তোর উচিত মাকে সাধ্যি-সাধনা ক'রে নিয়ে যাওয়া।'

অভিমন্যু ভুরু কোঁচকালো, 'সাধ্যি-সাধনা মানে? কেন?'

'মা কিরকম অভিমান ক'রে এসেছেন, জানিস্ না সে-কথা?'

'এমনও তো হতে পারে, আমিও তাতে ভীষণ অভিমানাহত হয়ে ব'সে আছি।'

'বকিস্ নে। তোর রাগের মুখ আছে? ভেবেছিলাম, ছোটবৌকে নিয়ে তুই আসবি আমার বাড়ী।'

'অদ্ভুত! দেখছি—মা মেয়ের বাড়ী তোফা আরামে রয়েছেন।'

ভাবনা ধ'রে গেলো ছোড়দির। মতলব কি এদের? বুড়ো মাকে তার ঘাড়ে চাপাতে চায় নাকি? হতে পারে বৌ যদি হাওয়ায় ওড়েন, মাকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট তো! না বাবা, এই বেলাই প্রতিবাদ দরকার। অন্যও পন্থা ধরে ছোড়দি বললো, 'আরামে থাকলে কি হবে, এদিকে অন্তরে-অন্তরে কোলের ছেলের জন্যে হেদিয়ে পড়েছেন।'

'তাই নাকি? তোমার তো খুব অন্তর্দৃষ্টি!'

আর কোনো কথা হলো না। অভিমন্যু মা'র ধারে কাছেও ঘেঁসলো না, অথচ সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে অভিমন্যু অবলীলাক্রমে বললো, 'মা, এসো!' যেন ওর সঙ্গেই এসেছিলেন পূর্ণিমা।

বলা বাহুল্য, দ্বিরুক্তিমাত্র না ক'রে পূর্ণিমা গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। আর বাড়ী এসে? বাড়ী এসে দু'দিন পরেই আবিষ্কার করলেন পূর্ণিমা, শরীর খারাপ হবার সঙ্গত কারণ আছে মঞ্জরীর। পুলকে উল্লসিত হলেন পূর্ণিমা। ভাবী পৌত্রের মুখ সন্দর্শনের আশায় যতোটা না হোক, মঞ্জরীর ডানা ভাঙ্গলো ভেবে।···নাও, এইবার করো যা খুশি? আর চলবে না। জব্দ, একেবারে জব্দ! সৃষ্টির আগে মানুষের সৃষ্টিকর্তা মেয়েমানুষকে জব্দ ক'রে রাখবার যে অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, মনুষ্যসমাজ

তার সুযোগ নিয়ে আসছে পুরোপুরি। মেয়েমানুষকে ছেড়েকথা কয় না।

❁ ❁ ❁

বিজয়ভূষণ আরাম কেদারায় লম্বা হয়ে পা নাচাতে-নাচাতে বললেন, সুনীতি, তোমরাই তোমাদের চিনেছো।'

সুনীতি বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছিলো, হাতের কাজ স্থগিত রেখে ভুরু কুঁচকে বললো, 'মানে ?'

'মানে, বলছিলে তাই। তোমার ভগিনী বলছে, আবার ছবিতে নামবে।'

'বলেছে এই কথা ? কাকে বলেছে ? কখন বলেছে ?'

'কাকে আবার ? আমাকে।'

'তোমাকে !, সুনীতি বিস্ময়ে বলে, 'তোমাকে ও পেলো কখন্।'

'আছে রহস্য ! পাবার চেষ্টা করলে নিভৃতের অভাব আছে।'

'হুঁ ! তা নয় ? এতো সাহস আছে যে, তোমার অজানিতে শ্যালীসঙ্গ সুখ আস্বাদন করতে যাবো ? চিঠি লিখেছে হে গিন্নি, চিঠি লিখেছে।'

'চিঠি ? ওমা ! চিঠি আবার কখন্ এলো ? আমি দেখলাম না !' অফিসের ঠিকানায় লিখেছে। ভেবেছিলো বোধহয় তুমি টের পাবে না !'

'ঢং ! কই দেখি চিঠি !'

বিজয়ভূষণ বুক পকেটে হাত দিয়ে করুণ স্বরে বললেন, 'দিয়ে দেবো ? জীবনের প্রথম পরস্ত্রী পত্র নিজের স্ত্রীর হাতে তুলে দেবো ?'

ব'লে সুনীতি রাগ-রাগ ভাবে একটা ছোট ওয়াড় একটা বড়ো বালিশে টানাটানি করে পরাতে চেষ্টা করে, আর ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠেন বিজয়ভূষণ।

'করছো কি ? এভাবে ধরা পড়ছো ? ওদিকে বালিশ বেচারার বক্ষপঞ্জর যে চূর্ণ হয়ে গেলো ! এই নাও ! এরপর আটকে রাখো হৃদয়হীনতা।'

বলা বাহুল্য, ততোক্ষণে চিঠিটা কেড়েই নিয়েছে সুনীতি।

চোখটা বার-দুই বুলিয়ে নিয়ে চিঠিখানা মুঠোয় চেপে সুনীতি অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে, 'দেখলে, বলিনি আমি ? বলিনি একবার বাঁধ ভেঙে দিলে আর রক্ষে নেই ! নাও, এখন শালীর হিরোইন হবার সাধ কি করে মেটাবে মেটাও। তুমি ! তুমিই যতো নষ্টের মূল। তুমিই ওর মাথাটা খেলে।'

বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেন, 'তা'হলে ছাখো এই বৃদ্ধবয়সে সে ক্যাপাসিটি রাখি।'

'আচ্ছা যাচ্ছি আমি, সেই রাক্ষুসীকে দেখে নিচ্ছি।' সুনীতি বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু যাবে কোথায় ? বিজয়ভূষণও সঙ্গে-সঙ্গে পিছু নিয়েছেন। খপ্

ক'রে আঁচলটা ধরে ফেলে বলেন, 'ওর আর্গুমেন্টটা কিন্তু খুব অসঙ্গত নয়। নেমেইছে যখন, তখন একটা পার্টের মতো পার্টে নেমে লোককে তাক্ লাগিয়ে দেবার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক।'

'হুঁ নেমেছে যখন, তখন পাতাল পর্যন্ত নামুক!'

বিজয়ভূষণ তবু সিরিয়াস্ হবেন না। তিনি সুনীতির রাগ দেখে হা-হা করে হাসবেন। ছোট্ট একটি ব্যাপার, তাই নিয়ে এত আলোড়ন। ছোট্ট একটি ঢিল যেমন আলোড়ন তোলে নিস্তরঙ্গ নদীর জলে।

* * *

এদিকে কিন্তু আপততঃ নির্ম্মল নীল জল। মায়ের ঘর থেকে এসেই অভিমন্যু হাসি-উপ্‌চানো মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ লাগিয়ে বলে, 'নাও, এখন ডাক্তারবাড়ী চলো!'

'ডাক্তারবাড়ী?' মঞ্জরী চম্‌কে মুখ তুলে তাকায়, 'কেন?'

'কেন তা তুমিই জানো, আর জানেন তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী।'

মঞ্জরীর পাণ্ডুর মুখে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। তবু কণ্ঠে স্বাভাবিকত্ব রেখে বলে, 'ডাক্তারবাড়ী যাবার কোন দরকার নেই।'

'তুমি 'নেই' বললে আর শুনছে কে? পূর্ণিমাদেবীর হুকুম। একালে নাকি ডাক্তার দেখানোই ফ্যাসন হয়েছে, অতএব—উঃ, এতো খুশী লাগছে! ইচ্ছে হচ্ছে ভীষণভাবে শিস্ দিই।'

'বটে! আমাকে ডাক্তারবাড়ী যেতে হবে শুনে, খুশীতে তোমার শিস্ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হচ্ছে তো দেখছি।'

'থামো! ভীষণ খারাপ লাগছে আমার।'

'খারাপ লাগছে?'

'লাগছেই তো। যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ লাগছে।'

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় অভিমন্যু। গম্ভীর সুরেই বলে, 'এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়।'

'তা কি করা যায়! মনোবৃত্তি যদি সবসময় প্রশংসার পথ ধ'রে চলত, তাহ'লে তো পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হতো! বিশ্রী লাগছে আমার—খুব বিশ্রী!'

অভিমন্যু আর একটা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, ঘরের দরজায় আবির্ভাব ঘটলো ভৃত্য শ্রীপদ'র। ছিম্‌ছাম্-ফিট্‌ফাট্ সভ্য চাকর। পূর্ণিমার ডানহাত। বললে 'ছোটবৌ, আপনাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন।'

'আমাকে?' মঞ্জরী সবিস্ময়ে বলে, 'আমাকে আবার কে ডাকবে রে। যারা ডাকে, সবাই তো তোর চেনা।'

অভিমন্যুর দিকে আর দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে চুলটা হাতে জড়িয়ে আলনা থেকে একটা স্কার্ফ টেনে নিয়ে গায়ে জড়াতে-জড়াতে নীচে নেমে যায় মঞ্জরী।

এসেছেন দু'জন ভদ্রলোক। জোরালো ভদ্র, বিনয়ে বিগলিত, জোড়হাতের জোড় খোলে না প্রায়। যাই হোক, ভদ্রতা বিনিময়ের পালা চুকলে আসলে কথা পাড়েন তাঁরা। মঞ্জরী আরক্তমুখে জানায়, এ অনুরোধরাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, মাপ করতে হবে।

কিন্তু মাপ করার জন্যে তো আ-মাপা খানিকটা সময় হাতে নিয়ে আসেননি তাঁরা। কোন্ কথার উত্তরে কি যুক্তি দেখাতে হবে, সে তাঁরা মেপেজুপেই এসেছেন। অতএব মঞ্জরীকে বুঝিয়ে ছাড়েন ভদ্রলোকধুগল— ছোট্ট একটি 'রোলে' যে টাচ্ দিয়েছে মঞ্জরী, তাতেই তাঁদের অভিজ্ঞ চক্ষু টের পেয়েছে মঞ্জরীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! 'স্টার' হবার প্রতিভা নিয়েই জন্মেছে। কথার বৃষ্টি! কথার ফুলঝুরি! কথার ঢেউ! কোন্‌টা থেকে আত্মরক্ষা করবে মঞ্জরী?

যতোই সে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে থাকে, তাঁরা ততোই কোণঠাস করে ফেলেন তাকে মোক্ষম যুক্তিবাণে। শেষ পর্যন্ত 'ভেবে দেখি' বলে তাঁদের আপাততঃ বিদায় করে মঞ্জরী। তবে যাবার বেলায় জানিয়ে যায় তাঁরা—'ভেবে দেখা-টেখা চলবে না, আসতেই হবে মঞ্জরীকে দর্শকের দাবি মেটাতে।' এবং এ আশ্বাসও দিয়ে যান, কাল-পরশুই আসছেন তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়া নিয়ে।

নীচেরতলার ছোট্ট এই একটা ঘর নিজেদের প্রয়োজনে রেখেছে অভিমন্যু যেটা দিনে বৈঠকখানা, রাতে শ্রীপদ'র শয়নমন্দির!

বলা-বাহুল্য, শ্রী শয্যার বালাই বিশেষ নেই, অভিমন্যুর বাবার আমলের খানকতক রংচটা চেয়ার আর একটা বনাত-মারা সেকেলে টেবিল বক্ষে ধারণ করেই বৈঠকখানা নামের গৌরব বহন করছে এই ঘর! বাড়তি আছে শ্রীপদ'র চৌকি আর রাজশয্যা! মঞ্জরী কোনদিন এ ঘর নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কারণ ওর বন্ধু-বান্ধবী আত্মীয়-পরিজন যেই আসুক, সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে যায়।

অভিমন্যুর বন্ধু-বান্ধবেরা এলেই এ-ঘরে বসে। আজ চারিদিকে একবার তাকিয়ে মঞ্জরীর মনে হলো ঘরটা কি বিশ্রী! উঠে এসে শ্রীপদকে বললো, 'ঘরটা অতো বিচ্ছিরি করে রেখেছিস কেন?'

শ্রীপদ মাথা চুলকে বললো, 'আজ্ঞে'?

'তোর এই তেলচিটে বিছানাটা ঢাকা দিস্‌নি কেন?'

কথাটা নতুন। তাই শ্রীপদ আর একবার মাথা চুলকে নিলো।

অভিমন্যু খবরের কাগজের আড়াল থেকে বললো, 'এ যাবৎ গণ্য-মান্য অতিথির পায়ের ধুলো তো পড়েনি, তাই খেয়াল করেনি বেচারা!'

স্তব্ধ হয়ে গেলো মঞ্জরী। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকলো পাশের ঘরে।

অনেকক্ষণ কিছুই ভাবেনি। ভাবতেও পারিনি।

হঠাৎ একটা বড়ো আঘাত খেলে যেমন আঘাত প্রাপ্ত জায়গাটা খানিকক্ষণের মতো অসাড় হয়ে যায়, তেমনি অসাড় হয়ে থাকে মনটা।

নীচে থেকে উঠে আসবার সময় ভাবছিলো—মঞ্জরীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার জন্যে অভিমন্যুর উপর তীব্র অভিমান দেখাবো, কী সাংঘাতিক অবস্থায় প'ড়ে 'ভেবে দেখবো' ব'লে আপাততঃ রেহাই পেতে হয়েছে তাকে, সেটা অন্ততঃ আড়াল থেকেই দেখলে পারতো অভিমন্যু। দেখলে বুঝতো। সে-সব কিছুই হলো না।

স্তব্ধ হয়ে থাকতে-থাকতে কোথা থেকে আসে চিন্তার ঢেউ। সে ঢেউ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় মঞ্জরীকে! বিপদ? কিন্তু এই বিপদই কি মনে-মনে প্রার্থনা করছিলো না মঞ্জরী? এই তো ক'দিন আগে জামাইবাবুকে নিজে হাতে করে চিঠি দিয়েছে সে অভিমন্যুর অজান্তে। দ্বিতীয়বার পর্দায় নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করেই সে চিঠি।

তবে? জামাইবাবুর প্রেরিত লোকও তো হতে পারে এরা!

না কি ঈশ্বর প্রেরিত?

মঞ্জরীর গোপন প্রাণের কামনা শুনেছেন তিনি, পাঠিয়েছেন অভিষ্ট পূরণের সুযোগ! এ সুযোগকে দুর্যোগ ব'লে সরিয়ে দেবে মঞ্জরী?

টুকরো-টুকরো ভাঙাচোরা লাইন। ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে মনের মধ্যে। ভাঙতে থাকে মঞ্জরীর দ্বিধা।

'নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনার এখনো কোনো ধারণা নেই মঞ্জরীদেবী।'

'কি আশ্চর্য! এতে নিন্দে হবার এ-যুগে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! সভ্রান্তঘরের মেয়েরাই তো আজকাল এ-লাইনে বেশী আসছেন...'

'বিশ্বাস না হয়, অনুগ্রহ ক'রে একদিন আসুন আমার বাড়ী।'

'কে বলেছে এ-কথা আপনাকে?...বাড়ী থেকে পালানো মেয়ে!'

'...হা-হা-হা, কী যে বলেন! বাপ মেয়েকে নিয়ে, স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে সে সাধ্যিসাধনা করছে—'

'তাদের!'

'সকলের মধ্যেই কি প্রতিভার অঙ্কুর থাকে মঞ্জরী দেবী?'

'না, সকলের মধ্যেই কিছু আর সঞ্চিত না প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, সকলকেই

কিছু আর চান্স দিয়ে দেখা যায় না। তাই যারা সাধ্যিসাধনা করে মরে তাদের 'বেরিয়ে যাবার' দরজা এসে সাধ্যিসাধনা করেছেন।'

মঞ্জরী নিজে জানে না। জানে না কোথায় লুকনো আছে, তার প্রতিভা সেই অগ্নিভাণ্ডার! যার থেকে উৎসারিত একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে মঞ্জরীকে। কিন্তু মঞ্জরী এখন কি করবে?

হায়! অভিমন্যু যদি তার এই দুঃসাধ্য চিন্তার ভাগীদার হতো।

কিন্তু কেন? কেন অভিমন্যুর এই অসহযোগিতা?

বিজয়বাবু সোল্লাসে বললেন, 'এই ছ্যাখ্! মনে-মনে যা চাইছিলি হাতে-হাতে তাই পেয়ে গেলি, আবার মুখ শুকিয়ে ছুটে এসেছিস্, মানে বরং চাইছিলি চার আনা, পেয়ে গেলি ষোল আনা। এ নিজের দিক থেকে আবেদন-নিবেদন নয়, আবেদন-নিবেদন ওপক্ষে। এ যে আশার অধিক।'

সুনীতি তীব্র আপত্তি তোলে—'মেয়েটাকে কি উচ্ছন্নে পাঠাতে চাও যা দেখছি, নিমিত্তের ভাগী তুমিই হ'লে।'

'আহা, তা একজনকে তো হতেই হবে। আমার কিন্তু বেজায় স্ফুর্তি লাগছে। গগন ঘোষ বাড়ী ব'য়ে এসে খোসামোদ ক'রে যায়। লেগে যা শালী? তবে আর সৌখিন অভিনয় নয়। মোটা টাকার দাবি নিয়ে ব'সে থাক গ্যাঁট হয়ে, দেখিস্, ঠিক দেবে। ওদের যখন যার ওপর মন পড়ে, তার জন্যে—'

'থামো তুমি!' গর্জে ওঠে সুনীতি, 'কখ্খনো নয়। পয়সা নিয়ে করা মানেই তো পেশাদার হয়ে যাওয়া—'

বিজয়বাবু হতাশার ভানে বলেন, 'কি মুস্কিল! এ-জগতে পেশাদার নয় কে? প্রত্যেকেরই কিছু-না কিছু পেশা আছে কিনা?'

'থাক্! তাই ব'লে ভদ্রলোকের মেয়ে রূপ-গুণ বেচে পয়সা—'

'ধীরে সুনীতি, ধীরে! রূপের কথা উঠছে কেন? রূপ তো তোমার ছোটবোনের চাইতে তোমার এখনো অনেক বেশী, কিন্তু তোমাকে কি কেউ 'অফার' করবে? কেউ না! তবে হ্যাঁ, গুণের কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু গুণ বেচে পয়সা নিচ্ছে না কে? গায়িকারা নিচ্ছে না? বাদিকারা? লেখিকারা? চিত্রিকা? শিক্ষিকা? সীবনিকা? বুননিকা? কে নয়?'

সুনীতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে উত্তর খোঁজে, তার আগেই বিজয়বাবু আবার বলেন, 'আরে শোনো। আসলে মঞ্জুর মতো আমারও ইচ্ছে হয়েছে, ছুঁড়ি একটা পুরো ভালো পার্টে নেমে ওর ক্যাপাসিটিটা দেখিয়ে দিক সবাইকে এই শেষবার!'

মঞ্জরীও মনে-মনে সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলো।

শেষবার। আছে অভিলাষ পূরণের উন্মাদনা, আছে অনুরোধ উপরোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার স্বস্তি, আছে ভয়, আছে অভিমান, আছে অসহায়তা। তরুণ একখানি বুক, কি ক'রে বইবে এতগুলো দুরূহ বোঝার ভার?

আর—দেহের সঙ্গোপনে তিল-তিল করে বর্দ্ধিত হচ্ছে যে অজানিত অনুভূতির ভার? তার জন্যেও যে কতো আশংকা, কতো যন্ত্রণার আনন্দ! যেন কী এক নিরবলম্ব অনিশ্চয়তার মধ্যে পথ হারাতে বসেছে মঞ্জরী, কেউ আশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দেবার নেই।

মাঝে-মাঝে দেহের গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে কী এক অসহ্য যন্ত্রণা মোচড় দেয়, থর-থর ক'রে ওঠে বুক, অকারণে চোখের কিনারায় জল ওঠে উপচে। অথচ বলতে পারে না কারো কাছে।

কাকে বলবে? যাকে সব বলতে পারতো, আবেশে আর আবেগে, লজ্জায় আর গৌরবে, সে যেন কাঁচের দেওয়ালের ওপিঠে দাঁড়িয়ে। চোখের সীমানায় রয়েছে, স্পর্শের সীমানায় নেই।

আর আছেন দিদি। তাঁকে কিছু বলতে ভয় করে। যদি তিনি কড়াশাস-নর হুমকি দিয়ে বন্ধ ক'রে দেন মঞ্জরীর ছবির কাজ? সেই ভয়ে দিদির কাছে বলা হয় না কিছু!

আরো একজন অবশ্য আছেন। কিন্তু বড়ো বেশী প্রখর তাঁর উপস্থিতি। উঠতে-বসতে উপদেশের বাণে জর্জরিত ক'রে ছাড়ছেন মঞ্জরীকে। হ্যাঁ—পূর্ণিমার অতি সাবধানতার জ্বালায় নতুন কোনো চেতনার ইঙ্গিত, নতুন কোনো অনুভূতির আভাষ জানানো যায় না তাঁকে, জানানো যায় না দৈহিক কোন উপসর্গের অস্বস্তি।

কাজেই সব সময় হাসতে হয় মঞ্জরীকে। হেসে ওড়াতে হয় পূর্ণিমার দুশ্চিন্তার ভীতি আর সাবধান বাণীকে। বলতে হয়, 'কি যে বলেন! আমি তা কই কিছু বুঝতেই পারি না। যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনিই তো আছি।'

দেহে আর মনে। ঠিক যেমনটি ছিলো, ঠিক তেমনটি আছে এই দেখাবার চেষ্টার আর অন্ত নেই। অসময়ে শুতে ইচ্ছে করলে বসে থাকতে হয় সতেজ সোজা। খেতে বসতে হয় ওদের অনুপস্থিতির সময়।

বিশ্রামের প্রয়োজন জানাতে মেরুদণ্ড টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে, মিনতি জানায়, আবেদন অগ্রাহ্যের আক্রোশে তীব্র দংশন দিতে সুরু ক'রে, পিঠটান ক'রে বসে থাকে মঞ্জরী। যতোক্ষণ না রাত আসে, শোবার দাবি জন্মায়, ততোক্ষণ বিছানায় পিঠ পাতবে না, এই যেন ওর পণ!

না খেয়ে খেয়ে দুর্বলতা বেড়ে চলে, বলতে পারে না সে-কথা। যে

অপরাধের খাতায় স্বাক্ষর ক'রে ব'সে আছে, পাছে তার থেকে নাম খারিজ হয়ে যায়, পাছে এরা মেডিকেল সার্টিফিকেটের জোরে মঞ্জরীর স্বাধীনতার সনদ কেড়ে নেয়।

সে তো ভারী লজ্জার! চমৎকার বই, প্রায় 'সাবিত্রী-সত্যবান'-এর উপাখ্যানের কাছাকাছি দর্শকচিত্তের চাহিদা হিসেব ক'রে গগন ঘোষ নিজেই গল্পটাকে খাড়া ক'রে ফেলেছেন। আর সত্যি গল্প একটা খাড়া করা শক্তটাই বা কি? গগন ঘোষ তা ভেবেই পান না, কেন আর-পাঁচজনে 'বই-বই' ক'রে মরে। লাইব্রেরী উজাড় ক'রে বই প'ড়ে মরেছে, বইলিখিয়াদের কাছে ছুটছে, অকারণ টাকা দিতে হচ্ছে ওইসব লিখিয়াদের, অথচ কি দরকার কিছু না—স্রেফ্ অপব্যয়!

লিখিয়াদের আবার আজকাল দেমাক কতো। বরের বাপের মতো খাঁই নিয়ে ব'সে আছেন, আর দর হাঁকছেন। গগন ঘোষ অতো দেমাকের ধার ধারেন না। কী আছে ওর মধ্যে? যে যতোবড়ো লিখিয়ে তার বইয়ের মধ্যে ততো মাথার কচ্‌কচি। সেই কথার সমুদ্র ঠেলে 'গল্প'টুকু উদ্ধার করতে সময়টাই কি কম নষ্ট হয়?

অথচ কোনো দরকার নেই! গগন ঘোষের দরকার ছবির। মনস্তত্ত্বের তত্ত্বফেনা নিয়ে তিনি করবেনটা কি? তার চেয়ে বাবা দরকার মত গল্প তৈরী ক'রে নিলাম, চুকে গেলো ল্যাঠা। বাহুল্য অংশের বালাই থাকে না তাতে কিছুই না, প্রথমে গোটাকতক 'সিচ্যুয়েশান' গ'ড়ে ফেলে মনশ্চক্ষে দেখে নেওয়া—কোন্ কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কোন্ ভূমিকায় ঠিক খাপ খাবে। ব্যস্! তারপর খানিকটা কৌশল ক'রে 'সিচ্যুয়েশান'গুলো গেঁথে বেঁধা—একটা গল্পের চেন গড়ে নেওয়া।

ব্যস্। আর কি চাই? ছবি তৈরী করতে আসল যেটা চাই, সে হচ্ছে প্রযোজক। রাঁসালো একটা প্রযোকক জোগাড় করে ফেলতে পারলেই ছবি হয়। ইলে গল্প? ওটা গৌণ।

দু'টো দিন বসেই তো এই 'কমলিকা' গল্পটা তৈরী ক'রে ফেলেছেন গগন ঘোষ। এতে নেই কি? যেমন গান আছে, নাচ আছে, রঙ্গ-তামাসা আছে, তেমনি আছে দুঃখের সাগর শোকের অগ্নি-দহন। কুঞ্জবনও আছে, শ্মশানও রইলো। একটা আদালতের দৃশ্য নইলে ছবি জমে না, ওটা আছে; একটা রোগশয্যা আর ডাক্তার চাই ওটাও আছে। একটা কাণা-খোঁড়া-কুষ্ঠ অথবা বোবা-কালা কি বিকলাঙ্গ না হ'লে আবার আজকাল নাকি বায়োস্কোপ থিয়েটার জমে না, কাজেই ওটাও রাখতে হয়েছে।

মিলবে? মিলবে না। কাজেই সে বই নিলে ভাঙতে-চুরতে জোড়াতালি দিতে-দিতে বুকের প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কি দরকার অতো ঝামেলায়?

গগন ঘোষ পাকা লোক, তিনি জানেন লোক কি চায়। মানে, তাঁর দেশের লোক। জানেন—তারা, যে ইমারত ধ্বসে পড়ছে, তার ভাঙা ইট-পাটকেলগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়। তাই তাদের জন্যে চাই একান্নবর্তী পরিবারের মহৎ উদারতা আর অপূর্ব একাত্মতার ছবি, চাই হিন্দুনারীর অদ্ভুত পতিব্রতের রোমাঞ্চকর ছবি।

'বিজয়িনী' সেই ছবি দেখাবে! অবশ্য মৃত স্বামীকে যমরাজের কাছ থেকে কেড়ে আনানোটা নেহাত দেখানো চলে না, তাই মৃত-স্বামীর প্রতিকৃতির সামনে বৈধব্যের পবিত্র মূর্তি দিয়ে ছবি শেষ।

কাহিনী শুনে মনটা প্রথম একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিলো মঞ্জরীর। ওই বিধবার দৃশ্যটা যদি না থাকতো। কিন্তু এ খুঁতখুতুনি প্রকাশ করা চলে না। সেটা হবে লোকহাসানো! মনকে চোখ রাঙিয়ে এ দ্বিধাকে তাড়ালো। তাড়ালো আধুনিক মনকে দিয়ে পিতামহীর সংস্কারকে।

মেক্ আপের সময় যখন রূপসজ্জাকার ফণীদাস আধখাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই, তখুনি সেই হাত দিয়ে তুলে ধরে মঞ্জরীর ছোট্ট একটি টোলখাওয়া নিটোল চিবুকটি, আর তেমনি তুলে ধরে রেখেই অপর হাতে রঙিন তুলি বুলিয়ে-বুলিয়ে স্বভাব-সৌন্দর্যের উপর আনে কৃত্রিমতা, বিধাতার উপর চালায় মানুষের কারসাজি, তখন রূঢপুরুষ স্পর্শে, আর একটু উগ্রকটু কড়া সিগারেটের গন্ধে ঘৃণায় সর্বশরীর শিব্‌শিরিয়ে উঠলেও, দিব্যি অম্লানমুখে ব'সে থাকতে শিখলো মঞ্জরী।

শিখলো বারো-ভূতের সঙ্গে ব'সে সস্তা পেয়ালায় চা খেতে, শিখলো আরো অনেক কিছু আধুনিকতা। না শিখলে এরা যদি সেকেলে ব'লে বসে। স্মার্টনেসে কাকলি দেবীদের ওপর টেক্কা দিতে না পারলে কৃতিত্বটা কি?

'আপনি এই প্রথম নামছেন তো?'

প্রশ্ন করলো সহ-অভিনেতা নিশীথ রায়। নায়ক সাজবে নিশীথ। আর সে রূপগুণ আছেও ওর। বরং মঞ্জরীর মতো এমন নাম-খ্যাতিবিহীনা নায়িকাকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটাই আশ্চর্য। সেও হয়তো মঞ্জরী সম্পর্কে অজ্ঞতার ভাবই মনে পোষণ করতো, যদি না মঞ্জরী এমন নিখুঁত সুন্দর মুখের অধিকারিণী হতো। তাছাড়া শুনেছে, শিক্ষিতা মহিলা। অতএব সম্ভ্রম ভাব নিয়েই আলাপ করতে আসে।

'প্রথম? না তো!' উত্তর দেয় মঞ্জরী. 'এর আগে 'মাটির মেয়ে'তে

ছোট একটা রোলে নেমেছিলাম।'

'ও!'

'মাটির মেয়ে'র নামও শোনেনি নিশীথ রায়। নিজের বই ছাড়া অন্য বই দেখবার ফুসরতই জোটে না। তাই 'ও' ব'লে অন্য কথা পাড়ে, 'আপনাকে অনেক দূর থেকে আসতে হয়?'

তা হয়।

নিশীথ আশা করেছিলো, এই প্রসঙ্গে হয়তো মঞ্জরী নিজের বাড়ীর ঠিকানার সন্ধান দিয়ে ফেলবে, কিন্তু মঞ্জরী ছোট ওই উত্তরটুকুতেই কাজ সারলো। অতএব আবার প্রশ্ন, 'খুব অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই?'

'অসুবিধে আর কি! বেশ মজাই তো লাগে।'

নিশীথ রায় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে মৃদু হেসে বলে, 'এখন—প্রথম মজা লাগবে, এরপর—যখন নাইতে-খেতে অবকাশ পাবেন না, তখন মনে হবে সাজা।'

মঞ্জরী একমুহূর্ত ইতস্ততঃ ক'রে বলে, 'সে স্টেজ আসবার সম্ভাবনা নেই। কারণ, এই 'বিজয়িনী'ই আমার শেষ অভিনয়।'

নিশীথ রায় বিস্মিত দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত ক'রে বলে, 'তার মানে?'

'মানে অতি সোজা। নিছক সখের খাতিরে দু'বার নামলাম।'

নিশীথ রায়ের মুখে আসছিলো, 'বিনা পারিশ্রমিকে?' কিন্তু সামলে নিলো। বললে, 'আপনি ছাড়তে চাইলেই কি আর 'স্টেজ ছাড়বে?' বাড়ী থেকে টেনে আনবে। বিশেষ ক'রে আপনার মতো—ইয়ে শিক্ষিতা মহিলাকে।'

এবারেও সামলে নিয়েছে জিভকে। বলতে যাচ্ছিলো, 'আপনার মতো সুন্দরী মেয়েকে!'

একবারের জন্য বুকটা কেঁপে উঠলো মঞ্জরীর। বাড়ী থেকে টেনে আনবে? টেনেই তো এনেছে। সে ইতিহাস এই নিশীথ রায় জানে না কি? এই নিয়ম তো এখানকার? তোমার ইচ্ছে না থাকলেও এদের প্রয়োজনের দুর্বার আকর্ষণে আসতেই হবে আপন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে? মনের মধ্যে কেমন একটা অসহায় শূন্যতা বোধ করে মঞ্জরী। কে তাকে এদের এই তীব্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবে? অভিমন্যু যে তাকে ঝড়ের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখতে চাইছে।

আশ্চর্য! অভিমন্যু কি ক'রে এমন বদলে গেলো? বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এদের বাড়ীর সনাতনী আক্রমণ থেকে কিভাবে মঞ্জরীকে আগলে এসেছে অভিমন্যু, সেকথা তো ভুলে যায়নি মঞ্জরী।

ভিতরে একটা অসহায় শূন্যতা বোধ করলেও বাইরে সহজে দমে না মঞ্জরী, গম্ভীর মুখে বলে, 'টেনে আনতে চাইলেই কি আনা যায়?

নিশীথ রায় দৃঢ়স্বরে বললে, 'যায়! শুধু এ-লাইনের নয়, সারা জগতের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন, এই কেড়ে আনার খেলাই চলছে। প্রয়োজন! প্রয়োজনই হচ্ছে শেষ কথা? কার প্রয়োজন কোথায় কি ঘটছে চট্ ক'রে বোঝা শক্ত, তবু এটা ঠিক, সবাই আমরা অপরের প্রয়োজনের দাস। এই প্রয়োজনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে হাজারে-হাজারে নিরীহ ছাত্র রাজনীতির হাঁড়িকাঠে মাথা দেয়, লাখে-লাখে চাষী অবাধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ খোয়ায়, কোটি-কোটি সতী মেয়ে সম্ভ্রম আর পবিত্রতা হারায়।'

চম্‌কে ওঠে মঞ্জরী, শিউরে কাঁটা দিয়ে ওঠে দেহের প্রতিটি রোমকূপ, প্রতিটি রক্তকোষে রক্তকণার অগ্নিবিস্ফোরণ ঘটে।

এ কী কথা? এ কোন ভাষা? কোন ভয়ঙ্করের ইঙ্গিত এ? নিশীথ রায় কি তাকে ভয় দেখাতে চায়? অম্লান মুখে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে এ কি নিষ্ঠুর ভয় দেখানো! মঞ্জরীকে ভয় দেখিয়ে ওর লাভ কি? তবে কি এ সাবধান বাণী? হিতাহিত-জ্ঞানহীন মঞ্জরীকে সাবধান ক'রে দিতে চায় নিশীথ রায় বন্ধুর মতো?

মনের মধ্যে প্রশ্নের তাণ্ডব নর্তন, দেহের মধ্যে রক্তের।

তবু কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে বলে মঞ্জরী, 'নিজের খুঁটিতে নিজে ঠিক থাকলে কিছুই হবে না।'

বলে বটে, তবে কণ্ঠস্বরটা ভারী ক্ষীণ শোনায়।

'নিজের খুঁটি?' হেসে ওঠে নিশীথ রায়। হেসে আর-একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলে, "মহাভারতের গল্প জানেন? ভীমের মুঠোর টানে শিকড়সুদ্ধ তালগাছ উঠে আসার গল্প? পড়েননি?'

মঞ্জরী কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে পড়ে। হঠাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে চিড়িক্ মেরে উঠেছে একটা ক্রূর যন্ত্রণা। অপ্রত্যাশিত অজানা যন্ত্রণা! নিশীথ রায় বিস্মিতভাবে বলে, 'কি হলো? শরীর খারাপ বোধ করছেন?'

চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে চোখদুটো একবার বুঁজে অসহ্য অবস্থাটা একটু সামলে নিয়ে মঞ্জরী মাথার ইশারায় সম্মতি জানিয়ে বলে, 'হুঁ! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো।'

মাথার কথাই বলা ভালো, যেটা সচরাচর, যেটা স্বাভাবিক। নিশীথ রায় চিন্তার ভান দেখিয়ে বলে, 'তাই তো! মুস্কিল হলো তো! আবার এখুনি গিয়ে লাগতে হবে! অসুবিধে বোধ করেছেন নাকি?'

'নাঃ! ঠিক আছে'—ব'লে উঠে দাঁড়ায় মঞ্জরী। সহ পরিচালক নজির

মিত্তির অদূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইসারায় ডাক দিচ্ছেন।

কি বিশ্রী এদের এই ভঙ্গিগুলো! একজন বাইরের ব্যক্তি কোনো ভদ্রমহিলাকে হাতের ইসারায় ডাকতে পারে, এ-কথা আগে কখনও ভাবতে পারতো মঞ্জরী? আর সে ভদ্রমহিলা আর কেউ নয়, মঞ্জরী নিজেই। এবং আরো অদ্ভুত কথা, বিনা প্রতিবাদে সে ডাকের নির্দেশে গুটি-গুটি এগিয়ে যাচ্ছে মঞ্জরী।

নাঃ! এসব জায়গায় প্রেষ্টিজ থাকে না। মোটেই না। খুব শিক্ষা হচ্ছে! এই শেষ! এই শেষ!

নিশীথ রায় উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলে, 'নাঃ! আর এক পেয়ালা চা না খেলে চলছে না। কই—আমাদের বিষ্ণুচরণ গেলেন কোথায়? মঞ্জরীদেবী, আপনার চা বলবে নাকি?'

'না!'

'খেলে পারতেন। শরীরটা ঠিক হয়ে যেতো।'

'ঠিক আছে—বলে এগিয়ে যায় মঞ্জরী। কিন্তু সত্যিই কি ঠিক আছে? সেই অদ্ভুত অজানার ক্রূর যন্ত্রণাটা বারেবারেই যে ছোবল হানছে মেরুদণ্ডে, মেরুদণ্ড বেয়ে-বেয়ে কটিতে, পাঁজরে। তবু মুখের হাসি বজায় রেখে কর্তব্য পালন ক'রে যেতেই হবে। বিশেষ করে ভূমিকার এই অংশটুকু। প্রেমগর্বিতা তরুণীবধূ পতির প্রবাসযাত্রা বন্ধ করতে চায় হাসি সোহাগের ব্রহ্মাস্ত্রে। স্বামী অর্থাৎ নিশীথ রায়ের হাত ধ'রে মধুর হাসি আর বিলোল কটাক্ষপাতের সঙ্গে বলতে হবে মঞ্জরীকে, যাও তো দেখি এ বাঁধন ছাড়িয়ে? দেখি কতো জোর?

অনেকবার শোনা পার্ট, তবু অনেকবার 'শট্' নিতে হয়। কিছুতেই প্রকাশভঙ্গি স্বাভাবিক হচ্ছে না মঞ্জরীর। বিরক্তি-তিক্তকণ্ঠে গগন ঘোষ বলেন, 'আগের শট্টা বেশ ওৎরালো, হঠাৎ কি হলো আপনার? মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বিছে কামড়াচ্ছে। নতুনদের নিয়ে এই তো হয় মুস্কিল! এই দিব্যি হলো, এই মার্ডার কেস্।···ওহে দীপক, কি মনে হচ্ছে? আরও একটা 'শট্' নিতে হবে নাকি?'

দীপক নির্লিপ্তভাবে বলে, 'হয়ে যাক্।'

অতএব আবার উৎফুল্লমুখে ছুটে এগিয়ে আসা, আবার নিশীথ রায়ের হাত ধ'রে মধুর হাসি আর বিলোল কটাক্ষপাতের সঙ্গে উচ্চারণ করা—'যাও তো দেখি এ বাঁধন ছাড়িয়ে? দেখি কতো জোর?'

আজকের মতো এইটুকুই হলেও শেষ, অথচ শেষ আর হতে চাইছে না। মঞ্জরীর নিজের দোষেই যে হতে চাইছে না, সে-কথা খেয়াল করে না মঞ্জরী ক্রমশই কিন্তু আর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

যাক্, বাঁধন কাটাকাটির পর্ব শেষ হয় আজকের মতো। নিশীথ রায়ের অন্যত্র স্যুটিং আছে, সে খালি হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই তোড়জোড় গুটিয়ে নেওয়া হলো। পরিচালক গগন ঘোষ বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে ফের বলেন, 'আপনার হঠাৎ কি হলো?'

শান্তস্বরে মঞ্জরী উত্তর দেয়, 'অসম্ভব মাথার মন্ত্রণা হচ্ছে।'

'তাই নাকি? আহা-হা, ইস্! ওরে কে আছিস, একটা ট্যাক্সি—'

নিশীথ রায় আর-একবার ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নির্লিপ্ত সুরে বলে, 'আমিও নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি, অবশ্য মঞ্জরীদেবীর যদি আপত্তি না থাকে।'

ট্যাক্সির জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হবে, মঞ্জরী আর ব'সে থাকতে পারছে না যেন। আপত্তি? আপত্তি আর কিসের? তাছাড়া সেটা যে বড্ড সেকেলেপনা। তাই মৃদু হাসির সঙ্গে বলতে হয়, 'আপত্তি? বরং বেঁচে যাই। ভীষণ ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে।'

গাড়ীতে উঠে নিজেকে একটা কোণের দিকে প্রায় ফেলে দিয়ে ব'সে থাকে মঞ্জরী, আর নিশীথ রায়ের হাতের গাড়ী যেন চলন্ত জলস্রোতের মতো তরতর করে এগিয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ পরে নিশীথ রায়ই নীরবতা ভঙ্গ করে, 'পথ চিনিয়ে দেবার ভার কিন্তু আপনার, আমি আপনার বাড়ী চিনি না।'

মঞ্জরী ঘাড় তুলে উঠে ব'সে বলে, 'চেনেন না? ওমা! এতোক্ষণ তা'হলে ঠিক পথে এগোচ্ছেন কি ক'রে?'

নিশীথ রায় ঘাড়টা ফিরিয়ে সহাস্যে বলে, 'কতকটা আন্দাজে। ভাবছিলাম, চালিয়ে তো যাই ভুল হ'লে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ হবে ভুলের বিরুদ্ধে?'

'এককথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত। আসলে বোধকরি, নিশ্চিন্ত ব্যবহার শৃঙ্খলে বাঁধা মানুষের দলের ওপর কোনো নাড়া পড়লেই প্রতিবাদ ওঠে। যুগ-যুগান্তের কুসংস্কার মনের উপর কেটে ব'সে থাকে গায়ের উপর চামড়ার মতো, সে সংস্কারকে উৎপাটিত করতে চাইলে আর্তনাদ ওঠাই স্বাভাবিক।'

'তাহ'লে সে প্রতিবাদে, সে আর্তনাদে কান না দেওয়াই উচিত?'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিশীথ রায় মৃদুকণ্ঠে বলে, 'আপনি যে কেন এ-প্রসঙ্গ তুলছেন বুঝেছি। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, কয়েকজনের স্বার্থ-ত্যাগ, কয়েক-জনের দুঃসাহসই বাকি চলার পথ সুগম করে দেয়।'

'কিন্তু উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তো আছে?'

'অবশ্যই। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অপরের কাছে নেই। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে 'উচিত বোধ' নামক জিনিসটা আছেই।'

'এ তর্কের শেষ নেই।'

'আচ্ছা, আপনি বোধহয় খুব পড়াশোনা করেন?'

'পড়াশোনা? হায়-হায়! বাসনা তো খুবই, সময় কোথা?'

'জানেন—আগে আপনাদের সম্বন্ধে কী সাংঘাতিক কৌতূহলই না ছিলো? এখন নিজেই ফেঁসে গেলাম আপনাদের দলে।'

'এখন বোধকরি কৌতূহল ভঙ্গ হয়েছে?'

'কি জানি!···দাঁড়ান, থামুন, আর সোজা এগোবেন না, ডানদিকে বাঁকতে হবে—উঃ!'

'কি হলো?'

'কিছু না। মাথার যন্ত্রণাটা—'

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অভিমন্যু দেখতে পায় ভালো একখানা গাড়ী দাঁড়ালো বাড়ীর সামনে, নামলেন ভালো স্যুট-পরা এক ভালো চেহারার ভদ্রলোক, নামলো মঞ্জরী। বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালে ভদ্রলোককে, ঢুকে এলো বাড়ীর মধ্যে। ভদ্রলোকটি নিতান্ত তরুণ বয়স্কের মতো লাফিয়ে ফের গাড়ীতে উঠে চালিয়ে দিলেন গাড়ী। খানিকটা শব্দ, খানিকক্ষণ শূন্যতা।

অভিমন্যু কি তাড়াতাড়ি মঞ্জরীকে সম্ভাষণ করতে যাবে! না কি যেচে প'ড়ে জিগ্যেস করতে যাবে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো—যিনি তোমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তিনি কে?

কে যাচ্ছে সম্ভাষণে? মনের মধ্যে তো শুধু বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা!

না, অভিমন্যু গেলো না, অভিমন্যু তেমনি স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকলো বারান্দায় রেলিঙের সামনে। পেছন থেকে মঞ্জরীই ডাক দিলো। ক্ষীণ করুণ কণ্ঠ—'শুনেছো! একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারো?'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো অভিমন্যু।

'ডাক্তারবাবুকে? কেন! কি হলো?'

'শরীরটা ভয়ানক খারাপ লাগছে! বোধহয়—বোধহয়—তুমি যাও, একখুনি যাও। দেরী করলে মুস্কিল হবে—'

অভিমন্যু উদ্বিগ্ন অথচ রুক্ষভাবে ব'লে ওঠে, 'হলো কি হঠাৎ? প'ড়ে-টড়ে গেছো না কি? তাই বুঝি গাড়ি ক'রে—'

'আঃ! প্রশ্ন পরে করো, দোহাই তোমার। তাড়াতাড়ি যাওগে।'

দরজার পর্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মাটিতে শুয়ে পড়ে মঞ্জরী, আর বোধকরি সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারায়।

❋ ❋ ❋

নিঃশব্দ চলা···নিঃশব্দ বলা···আলোয় নেই প্রখরতা। মৃদু নীল আলোটা জ্বলছে ঘরে, পাখার ব্লেড ক'খানা ঘুরে চলেছে আস্তে-আস্তে!

ডাক্তার এইমাত্র বিদায় নিয়ে গেছেন, বিদায় নিয়ে গেছেন মেজদা আর মেজবৌদি। শুধু দুই দিদির মধ্যে একজন রোগিণীর মাথার শিয়রে বসে আছেন। অপরজনেরা মায়ের কাছে ব'সে হা-হুতাশ করছেন। পূর্ণিমা দেবী প্রায় ভেঙে পড়েছেন। বিধাতা যদি তাঁকে এমন আশাবৃক্ষের মগডালে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেন, মানুষকে তিনি কি দোষ দেবেন?

এই তিন-চার মাস ধ'রে মনে-মনে নিজের জীবনের যে নতুন প্রতিষ্ঠামন্দির রচনা করছিলেন পূর্ণিমা, তার ভিত্তিপ্রস্তরখানা স্থাপিত হবার আগেই গেলো গুঁড়িয়ে মঞ্জরীর উড়ন্ত ডানাকে কেটে তাকে মাটিতে নামাবার আশা শূন্যে মিলালো, অপরিণত অঙ্কুরটি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। অচৈতন্য মঞ্জরী জানতেও পারলো না, কতটা ক্ষতি হয়ে গেলো তার, কিন্তু পূর্ণিমা তো মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন কী পরিমাণ ক্ষতি তাঁর হলো!

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিদায় নিয়েছেন, পরিবারিক চিকিৎসক নীলাম্বর ঘোষকে ডাকা হয়েছে কেবলমাত্র আশ্বাসের আশায়। শুধু তাই নয়, অপরপক্ষে আবার তাঁর সম্মান রক্ষার প্রশ্নও আছে। অভিমন্যুর বাবার আমলের ডাক্তার নীলাম্বর, প্রায় আত্মীয়-অভিভাবকের সামিল।

খাটের বাজু ধ'রে অভিমন্যু দাঁড়িয়ে, রোগিণী নিমীলিত নেত্রে শয্যালয়। রক্তচাপ নির্ণয়ের যন্ত্রটা গুছিয়ে খাপে ভরতে-ভরতে নীলাম্বর ডাক্তার বলেন, 'না, এদিকে অন্য কোনো গোলমাল নেই, গোটা কয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যাচ্ছে!'

অভিমন্যু একবার নিথর নিদ্রিতার দিকে দৃষ্টিতে পলক ফেলে মৃদু স্বরে বলে, 'কিন্তু হঠাৎ এরকম হাওয়ার কারণটা কি মনে হয় আপনার?'

'কারণটা বলা শক্ত। মাত্র একটাই তো কারণ হতে পারে না, কোনো অসুখেরই তা হয় না। সাধারণতঃ অনেক রকম ছোটখাটো কারণ জমতে-জমতে দেহযন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে।'

'তবু এরকম ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা কারণ থাকেও তো।'

নীলাম্বর মৃদু গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'তা থাকে বটে, ধরো যেমন প'ড়ে গিয়ে আঘাত লাগা, আকস্মিক কোনো শোকে মনে শক্ লাগা, রাগ-দুঃখ ভয়, তখন মনে হচ্ছে জেনারেল হেল্‌থটাই হয়তো ঠিক ছিলো না। বাইরে থেকে এসেই এ'রকম হয়েছে বলছিলে না? কোথায় গিয়েছিলো? নেমন্তন্ন?'

বলার জন্যেই বলা। প্রবীণ লোক ধ'রে নিয়েছেন 'বাইরে যাওয়ার' ব্যাপারে অভিমন্যু অবশ্যই সঙ্গী ছিলো। কাজেই তার রিপোর্ট প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্ট। ইতিপূর্বে 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে 'কারণ' তিনিও পাননি। সব কথাতেই 'না' বলে অভিমন্যু।

ডাক্তারের প্রশ্নে আর একবার সচকিত হয়ে অভিমন্যু বলে, 'না! এমনি একটু বেড়াতে—ইয়ে কতোদিন রেষ্ট নেওয়া দরকার মনে করেন ডাক্তারকাকা?'

'কতো আর?' প্রস্থানের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে নীলাম্বর ডাক্তার বলেন, 'দিন দশেক একেবারে শুয়ে থাকুন, তারপর হপ্তাতিনেক বাড়ীতেই ঘোরাফেরা, এই আর কি। ভাবনার কিছু নেই।'

চলে যান ডাক্তার, পিছু-পিছু অভিমন্যু।

হাতে-হাতে টাকা দেওয়া চলে না, আত্মীয়ের মতো ডাক্তার। গাড়ীতে ওঠার পর নিঃশব্দে টাকাটা পকেটে গুঁজে দিয়ে আর একবার ম্লানভাবে বলে, 'তাহ'লে আপনি বলছেন ভয়ের কিছু নেই।'

'না হে বাপু, না। বলছি তো ঘাবড়াবার কিছু নেই, এসব তো হামেশাই হচ্ছে। তবে—কিছুদিন দৌড়-ঝাপ্‌টা একটু বন্ধ রাখতে হবে এই আর কি। ছোটবৌমা তো আবার একটু চঞ্চল আছেন। তোমার কাকীমা বলছিলো, 'সিনেমা' করছেন, ব্যাপারটা সত্যি নাকি?'

অবাক হবে না ভেবেও অবাক হলো অভিমন্যু।

আশ্চর্য! কোথাকার খবর কোথায় না যায়!

কুণ্ঠিত হাসি হেসে অভিমন্যু বলে, 'আর বলেন কেন, যতোসব পাগলামী খেয়াল। যাক্, এইবারে শিক্ষা হলো! ইয়ে—ইন্‌জেকশন যা দেওয়া হচ্ছে, কালকেও হবে?'

'ওবেলার অবস্থা দেখে! ইয়ে—তোমার মিত্তিরসাহের কি বলছেন?'

'উনি তো ব'লে গেলেন চালিয়ে যেতে আরো দু'তিন দিন।'

'আমার তো মনে হচ্ছে না দরকার হবে! তবে ওঁরা হলেন গে স্পেশালিষ্ট, ওঁনাদের কথাই শিরোধার্য।'

হেসে ওঠেন নীলাম্বর, ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দেয়।

মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অভিমন্যু উপরে উঠে এলো। দেখলো, নার্সটা রোগিণীর মুখের কাছে ঝুঁকে কি যেন বলছে। ঈষৎ আগ্রহ-ভরে অভিমন্যু চাপা-গলায় প্রশ্ন করে, 'উনি কি কথা বলছেন, মিসেস দাস?'

'হ্যাঁ, জল চাইলেন একটু আগে, আপনি কোথায় তাই জানতে চাইছিলেন!'

পুরো তিনটি দিন কথা বলেনি মঞ্জরী, জ্ঞান ফিরলেও অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রিতার মতোই প'ড়ে আছে। অভিমন্যু এগিয়ে খাটের কাছে যেতেই নার্স মিসেস দাস মুরুব্বিয়ানা চালে বলে, 'কথা বলবার চেষ্টা করবেন না, তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। শুধু শুয়ে থাকতে দিন।'

'কথা বলাচ্ছি না' ব'লে অভিমন্যু কাছে গিয়ে নীরবে মঞ্জরীর একখানা হাতের উপর হাত রাখে—রোদের আওতায় ঝলসানো রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো শিথিল কোমল যে হাতখানি এলিয়ে পড়েছিলো বিছানার পাশে। চোখ মেলে তাকালো মঞ্জরী, তাকিয়ে থাকলো একটুক্ষণ বোবাদৃষ্টি মেলে, তারপর সেই বোবাচোখে এলো ভাষার ভার। অনেকদিনের অনেক অকথিত বক্তব্যের ভার, পুঞ্জীভূত অভিমানের সঞ্চিত ভার, না-জানা, না-বোঝা এক অশরীরী ভয়ের প্রশ্নভার। তারপর চোখটা বুঁজলো, আস্তে-আস্তে সময় নিয়ে। আর বোঁজার পর দীর্ঘ পল্লবের প্রান্ত বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

'মিস্টার লাহিড়ী, আপনি অনুগ্রহ ক'রে পাশেব ঘরে যান। দেখছেন না, পেশেণ্ট আপসেট হচ্ছেন।'

নার্স মিসেস দাসের বিনীত-কাতর-অনুরোধ বাক্য।

❋ ❋ ❋

গ্রামের মেয়ে, অভাবে প'ড়ে শহরে এসে কোনরকমে এই বিদ্যাটি অর্জন ক'রে জীবিকা অর্জন করছে, তাই অধীত বিদ্যার প্রতি তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। সবাই জানে রোগীকে ডিস্‌টার্ব করতে নেই, আর এও জানে, সব থেকে ডিস্‌টার্ব রোগীর নিকট-আত্মীয়-স্বজনরাই করে, অতএব ঘর থেকে তাদের যথাসম্ভব বিতাড়িত করাই কর্তব্য। তাছাড়া—ছোট হয়ে বড়োর উপর, শ্রমিক হয়ে মনিবের উপর, অভিজ্ঞ হয়ে অজ্ঞের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে পেলে সে সুযোগ কে ছাড়ে?

অভিমন্যু লজ্জিত হয়ে সরে এসে বলে, 'আচ্ছা পাশের ঘরেই রইলাম আমি, প্রয়োজনবোধ করেন তো ডাকবেন। কিন্তু কেন উনি আমার খোঁজ করছিলেন, সেটা তো—'

'সেটা কিছু নয় মিস্টার লাহিড়ী, সেন্স্ ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে খোঁজাই তো স্বাভাবিক।'

'তাহ'লে আমার তো এ-ঘরে থাকা উচিত ছিলো মিসেস দাস। ইয়ে যদি আবার খোঁজ করেন—'

'না-না, মাপ করবেন। দরকার বোধ করলে আমি নিজেই ডাকবো। দেখলেন তো আপনাকে দেখে কি'রকম ইয়ে হয়ে পড়লেন।'

নিভুল কর্তব্য পালনে গৌরবান্বিতা মিসেস দাস রোগিণীর মাথার কাছে গুছিয়ে বসেন। অভিমন্যু ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পাশের ঘরে গিয়ে একটা আরামচেয়ারের উপর শুয়ে পড়ে অভিমন্যু, আর সহসা তার শরীরের মধ্যে যেন একটা তপ্ত বাষ্পোচ্ছ্বাসের আলোড়ন জাগে। কি নিষ্ঠুরতা করেছে সে। কি হৃদয়হীনতা।

মঞ্জু! মঞ্জু! তার আদরিণী মঞ্জরী, অভিমানিনী মঞ্জরী, কী কষ্টই তাকে দিয়েছে এতোদিন ধ'রে! অভিমানে-অভিমানেই ভিতরে-ভিতরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে মঞ্জরী! হ্যাঁ, তাই। ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, 'দুর্বলতাও একটা কারণ'। ইদানীং কী দুর্বলই না হয়ে গিয়েছিলো বেচারী, অথচ সেদিকে তাকিয়ে দেখেনি অভিমন্যু, মনে-মনে খালি অপরাধের বিচার করেছে। যদি মঞ্জরী মারা যায়।

যে-কথা মুখে উচ্চারণ করতে শিউরে ওঠে মানুষ, যে-কথা মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হতে থাকে, তার উপর হাত নেই কারো। তাই গলা টেপা প্রাণীর দম আটকানো বুকের মতো, পাথর চাপানো বুকের মধ্যে অবিরত ধ্বনিত হতে থাকে—মঞ্জরী যদি মারা যায়, মঞ্জরী যদি না বাঁচে! নিজেকে তা'হলে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে অভিমন্যু? লজ্জা রাখবার ঠাঁই কোথায়?

পুরুষ অভিমন্যু, শক্ত অভিমন্যু, নিজের সমস্ত মানমর্যাদা বিস্মরণ হয়ে যায়, তারও নিমীলিত দু'টি চোখের প্রান্ত বেয়ে বড়ো-বড়ো দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, যেমন ক'রে ফোঁটার পর ফোঁটা ঝ'রে যাচ্ছে পাশের ঘরে আর দু'টি বোঁজা-চোখের কোন বেয়ে।

দু'জনের বেদনা বিভিন্ন। একজনের মনে অভিমান আর আশাভঙ্গের বেদনা, আপনজনের উপেক্ষা আর অপরাধবোধের। কিন্তু অশ্রুজলের রূপ! প্রেম কি মরে? না শুধু অভিমান আর ভুল বোঝার কুয়াশা আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে-মাঝে মৃতের মতো মলিন দেখায়?

ছেলের ভাব-ভঙ্গিতে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়েন পূর্ণিমা! এ কী ছেলে তৈরী করেছেন তিনি! পুরুষমানুষ, না একটা মাটির ঢেলা? দুর্দান্ত বৌ, বেপরোয়া বৌ, কোনো বিধি-বিধান না মেনে যথেচ্ছাচার ক'রে এই অঘটন ঘটালো, আর তার ছেলে কিনা সেই বৌয়ের জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে! যাওয়ার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই, কলেজের মুখো হচ্ছে না, শুধু বৌয়ের ঘরের ধারে-কাছে ঘুরঘুরুনি। সেকাল হ'লে আর তেমন শক্ত পুরুষ হ'লে ও বৌকে ঘরে নিতো কিনা সন্দেহ!

পূর্ণিমার ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন দেয় তাঁর আদরের বড়োমেয়ে। পূর্ণিমা

যেটা শুধু মনে ভাবছিলেন, সে সেটা সরবে ঘোষণা করে—

'সহজ বৌ, সুস্থ বৌ, সেজেগুজে বাড়ী থেকে বেরোলো, আর ক'ঘণ্টা পরেই বেড়িয়ে ফিরে আসতে না আসতেই এই ব্যাপার? মানেটা কি? তোমরা যদি চোখ থাকতে অন্ধ সেজে ব'সে থাকো, লোকে তো আর অন্ধ হয়ে বসে থাকবে না মা?'

পূর্ণিমা বোধকরি ঠিক এ ধরণের সুরটা পছন্দ করেন না অথচ বড়ো মেয়ের কথার প্রতিবাদ করতেও সাহসে কুলোয় না, তাই তাড়াতাড়ি বলেন, 'কি জানি মা, কি করেছিলেন সেখানে! হয়তো নাচতে-টাচতে বলেছিলো।'

'হুঁ, নাচ নয়, নেত্য! কতো রকমের নেত্যই আছে মা, হিসেব রাখো তার? মোটকথা তোমার সোহাগের ছোটবৌমার জন্যেই বাপের বাড়ী আসা ঘুচলো আমাদের। অন্তত আমার। এরপরে আর আসতে চাইবো কোন্ মুখে। ছোটবৌয়ের এ ব্যাপারে কে না সন্দেহ করবে?'

স্পষ্ট পরিষ্কার নির্ভুল রায়। এর উপর আর প্রতিবাদ চলে না।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সকলেই ওই একই ইশারা দেয়। একটা জীব যে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেখতেই অন্ধকারের রাজ্যে ডুবে গেলো, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মঞ্জরী! কে জানে এ দুর্ঘটনা স্বেচ্ছাকৃত কিনা!

'কতো কলাকৌশলই তো বেরিয়েছে আজকাল! নিজের ওই সব নেত্য বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই হয়তো—'

অভিমন্যুর কান বাঁচিয়ে কোনো কথাই হয় না! বরং মনে হয় কানে ঢোকার জন্যেই চেষ্টা! নাঃ, কেউ আর সমীহ করছে না অভিমন্যুকে। মঞ্জরীই তার মর্যাদাহানি করেছে।

মেজবৌদি এসে ঘণ্টা-দুই বসেন আর সমানে আক্ষেপ ক'রে চলেন—'আহা! কতো আশা ক'রে রূপোর ঝিনুক-বাটি গড়তে দিয়েছিলাম ছোট ঠাকুরপোর ছেলের মুখ দেখবো ব'লে, ফুলকেটে কাঁথা সেলাই করছিলাম, সব গুড়েই বালি পড়লো গো!'

'শুধু-শুধু' অমনি হলেই হলো? আমি এই ষ্ট্যাম কাগজে সই করে দিচ্ছি, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

মায়ের ঘরে আসতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় অভিমন্যুকে।

কতো স্বচ্ছন্দে কী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করছে এঁরা?

তবে কি আর কিছু? মেয়েরাই মেয়েদের সহজে চেনে! রোদে-গলা মোম, রোদ-পড়া সন্ধ্যায় শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। মমতায় গলা হৃদয় ক্রমশঃ শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে ওঠে সন্দেহের পঙ্কস্পর্শে।

ওরা অভিজ্ঞ, ওরা পাকা, ওরা ঝুনো, ওরাই তো জগৎকে ঠিক বোঝে, ওদের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি অভিমন্যুর?

ক'দিন আগে নার্সটাকে মনে হচ্ছিলো শত্রু। ভেবেছিলো ওটা বিদেয় হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে যাবে মঞ্জরীর কাছে। নির্জন সান্নিধ্যের সুযোগ মিললেই ক্ষমা প্রার্থনায় দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে নিজেকে। বলবে, 'মঞ্জু, আমি পাগল, আমি পশু, আমি জঘন্য, তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

একা ঘরে বার বার উচ্চারণ করছে, 'মঞ্জু, তুমি বেঁচে ওঠো। ক্ষমা করো! ক্ষমা করো!'

কিন্তু নার্সটার যখন বিদায় নেবার সময় এলো, তখন সে ভাবোচ্ছ্বাস শুকিয়েছে। দাঁড়িপাল্লার অপর পক্ষের পাল্লায় অন্যায়, অপরাধ, অসঙ্গত দুঃসাহসের বাটখারাগুলো চাপাতে নিজের দিকটা হাল্কা হয়ে উঠে পড়েছে। ফুরিয়েছে সশঙ্ক রাত্রি জাগরণ, ঘুচেছে মৃত্যুভয়। এখন ক্ষমা প্রার্থনার চিন্তাটা হাস্যকর। অজ্ঞান নয়, চৈতন্যের বিলুপ্তি নয়, শুধু অপরিসীম একটা ক্লান্তিভার। সে ভার চেপে ব'সে থাকে দুই চোখের উপর! মুদিত নেত্রের নীচের আচ্ছন্ন অদ্ভুত একটা অনুভূতি!

ঘরে এতো লোক কারা? ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা বলছে, মৃদুচরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়—কতোজনের পায়ের শব্দ, নিশ্বাসের ভার!

মঞ্জরী কোথায় আছে? ঘরে না বাইরে? গাড়ীতে? নিশীথ রায়ের গাড়ীতে? না কি স্টুডিও'য়? কি হচ্ছে তার? অসুখ? কি অসুখ? কিছুক্ষণ আগেও কি অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল না? সে যন্ত্রণা সর্বশরীরে মোচড় দিয়ে দিয়ে কি এক ভয়ের রাজ্যে পৌঁছে দিচ্ছিলো না মঞ্জরীকে? সে যন্ত্রণাটা তো আর টের পাচ্ছে না! এখন শুধু ঘুম! কোমল-গভীর-নিথর একটা রাজ্যে তলিয়ে যাওয়া।

এটা কি? রাত্রি? হ্যাঁ, এই হাল্কা নীল আলোটা তো রাত্রেই জ্বলে।

কিন্তু এতো লোক কেন তবে?

মঞ্জরীর আশেপাশে শিয়রে, ঘরে দালানে দরজায়? ওরা কেন কথা বলছে না? ওরা কেন বাতাসের ফিস্‌ফিসানিতে চুপিচুপি ইসারা করছে? চেঁচিয়ে কথা বলুক না ওরা, যেমন ক'রে সহজ মানুষে কথা কয়। ওরা চেঁচিয়ে বলুক না মঞ্জরীর কি হয়েছে।

দরজার কাছে কে দাঁড়িয়ে? অভিমন্যু না? ওর মুখ অত বিষণ্ণ কেন?

ক্লান্তির ভয়ে ভেঙেপড়া চোখের দৃষ্টি, তবু ধরতে পারছে মঞ্জরী অভিমন্যুর মুখে কি বিষন্নতা। প্রাণের মধ্যে হাহাকার করে উঠতে চায়, দু'হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকতে ইচ্ছে যায়, কিছুই হয় না। শুধু ঠোঁটটা একটু ন'ড়ে ওঠে, চোখের দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

'তুমি কে ?'

'আমি নার্স ? নার্স কেন ?

'কেন ? কেন আবার ? জানেন না কি ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন ?'

'ব্যাপার ? কিসের ব্যাপার ?

'না-না, ইয়ে—আপনার অসুখ করেছে, তাই।'

'অসুখ ! কি অসুখ !'

'এমনি ! অসুখ করে না মানুষের ?'

'ওঃ !' আবার ক্লান্তিতে বুঁজে আসে দু'চোখের পাতা। আবার স্পষ্ট অনুভূতির জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া। আবার সেই রুদ্ধশ্বাস কক্ষে...অকারণ পদশব্দ, অর্থহীন ফিসফিসানি !···

'ওষুধটা খেয়ে ফেলুন মিসেস লাহিড়ী !'

ওষুধ ? ওষুধ কেন ?'

'কি মুস্কিল ! আপনার যে অসুখ করেছে !'

'ও-হ্যাঁ ! আচ্ছা দাও—'

'আর জল খাবেন ?'

'না। তোমার নাম কি ?'

প্রিয়বালা ! প্রিয়বালা দাস !'

'ও ! ঘরে আর কে আছে ?'

'এখন আর কেউ নেই, আমি আছি শুধু।'

'একটু আগে কি ডাক্তার এসেছিলো ?'

'হ্যাঁ ! এইমাত্র চলে গেলেন।'

'ডাক্তার কি বললো ?'

'বললেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন আপনি।'

'আঃ ! তা বলছি না।'

'কি বলছেন তাহ'লে মিসেস লাহিড়ী, অ্যাঁ !'

'বলছি-বলছি—কি অসুখ ?'

'কিছু না। এমনি দুর্বলতা।'

'শুধু ?' সান্দহের কাঁটা তীক্ষ্ণ মুখ দিয়ে বিঁধে চলেছে, তবু স্পষ্ট ক'রে জিগ্যেস করতে সাহস হয় না। জিগ্যেস করবার ভাষাই বা কি ?

'প্রিয়বালা !'

'এই যে ! কি বলছেন ?'

'উনি কোথায় ?'

'কে ? মিস্টার লাহিড়ী ? এই যে এইমাত্র নীচে নেমে গেলেন ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে ।'

'একবার ডেকে দিও তো ।'

'এখন থাক্ মিসেস লাহিড়ী ! এখন বেশী কথা বলতে চেষ্টা করবেন না । শুধু শান্ত হয়ে ঘুমোন !'

'ঘুম ? আর কতো ঘুমোবো ?'

'যতো পারেন ! ঘুমই তো এখন আপনার একমাত্র ওষুধ !'

'আচ্ছা ।'

'হঠাৎ অভিমন্যু ঢুকে বলে, 'মিসেস দাস ! উনি কি ঘুমোচ্ছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ।'

'কোন উপসর্গ নেই তো ?'

'আজ্ঞে না ।'

'কথা-টথা কি একেবারেই বলছে না ?'

'সামান্য ! কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আপনি আর কথা বলবেন না মিস্টার লাহিড়ী—পেসেণ্টেকে উত্তেজিত হতে না দেওয়াই আমাদের ডিউটি ।'

'ধন্যবাদ !'

উচ্ছন্নে যাও তুমি ! বোকা শয়তানী ।

* * *

'নার্স'কে আজ ছেড়ে দিচ্ছি—' অভিমন্যু এসে দাঁড়িয়ে বললো ।

বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিলো মঞ্জরী, পায়ের উপর আলোয়ান ঢাকা, হাতে হাল্‌কা একখানা সিনেমা পত্রিকা । বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো, 'হ্যাঁ, প্রিয়বালা বলেছে ।'

'ছাখো ভালো ক'রে ভেবে । ছেড়ে দিলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো ?'

আশ্চর্য সুন্দর করে হাসলো মঞ্জরী । বলে 'না-না, মোটেই না । ভালো হয়ে গেছি তো । আর এরপর তো তুমি আছোই ।'

এ হাসিতে প্রাণ দোলে, এ নির্ভরতায় মন গলে । বিছানার এক ধারে ব'সে প'ড়ে অভিমন্যু বলে, 'আমার আর কতটুকু সাধ্য ? সোজাসুজি জ্বর-টর হয়—খুব জোর মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপাতে পারি ।'

মঞ্জরী আবার হাসে—'সব সময় বুঝি সোজাসুজি ব্যাপারই ঘটবে ?'

'ঘটে না—বলেই তো মুস্কিল। উঃ মাথাটি তো একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে। না সত্যি, এমনি অসুখ-বিসুখ হ'লে অতো ভাবনা হয় না, এই সব তোমাদের মেয়েলি কাণ্ডে—'

'তা একটি মেয়ে নিয়ে ঘর করবে, অথচ মেয়েলি কাণ্ড পোহাতে পারবে না, এ তো হয় না।?

সহজ পরিহাসের কথা, মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে উচ্চারিত। কিন্তু অপর পক্ষের কোমল দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছে সঙ্গে-সঙ্গে। ভালোবাসার সম্পর্কে যখন ফাটল ধরে, তখন বুঝি এইরকমই হয়। অর্থহীন তুচ্ছ কথার কদর্থ আবিষ্কার ক'রে অনর্থ ঘটে।

এলিয়ে বসার ভঙ্গিতে ঋজুতা এসে পড়ে বোধকরি অজ্ঞাতসারেই। ঋজু-কঠিন অভিমন্যু নীরস গলায় বলে, "পারবো না' বললেই বা ছাড়ছে কে ? পারতেই হবে! তবে দৈব দুর্ঘটনাকে মেনে নেওয়া যতো সহজ, ডেকে আনা বিপদকে মেনে নেওয়া তত সহজ নয়।'

অভিমন্যুও খুব বেশী গভীর অর্থবোধক কিছু বলবার কথা ভাবেনি, কিন্তু মঞ্জরীর কানে ওর মন্তব্যটা রূঢ়ভাবে বাজলো। সেও কঠিন সুরে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো, 'ডেকে আনা বিপদ' কথাটার মানে' ?

'মানেটা নিজের মধ্যেই খোঁজো।'

'নিজের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হবে। আমি তোমার মনের ভাবটা তোমার মুখেই সোজাসুজি স্পষ্ট জানতে চাই।'

'স্পষ্ট কথা শোনার সাহস হবে ?' বাঁকা হাসি হাসলো অভিমন্যু।

'নিশ্চয়ই হবে। স্পষ্ট কথা শোনার সাহস তার থাকে না, যার মধ্যে গলদ আছে। আমার সাহস না হবার তো কোনো কারণ দেখি না।'

'বটে না কি ?' ব্যঙ্গহাসির প্রলেপ মাখানো এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মধ্যে অবিশ্বাসের অপমান।

মঞ্জরী আরক্তমুখে ব'লে উঠলো, 'স্পষ্ট বলো কী বলতে চাইছো ?'

অভিমন্যু ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুকের উপর আড় করে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে নিষ্করুণভাবে বলে, 'আলাদা করে আমি কিছুই বলতে চাই না, প্রত্যেকে যা বলছে আমি শুধু সেইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছি!'

'অশেষ ধন্যবাদ!' মঞ্জরী ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়। তার ভাণ্ডারেও ব্যঙ্গহাসির অপ্রতুলতা নেই। ছুরির মতো হাসি হাসতে সেও জানে।

'অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু দুঃখের বিষয়—তোমায় প্রত্যেকে কি বলেছেন, আমার তা জানা নেই।'

'প্রত্যেকে যা ঠিক তাই বলছে। যথেচ্ছাচার করে বেড়াবার ফলেই এই বিপদ। তবে তোমার কাছে অবশ্য বিপদ নয়, বিপদমুক্তি!'

'তা কতকটা তাই বৈ কি! অনিচ্ছুক মনের উপর অবাঞ্ছিত একটা দায় চেপে বসেছিলো, সে দায়টা ঘুচলো। দেখা যাচ্ছে, ভগবান সত্যিকারের প্রার্থনা কান পেতে শোনে!'

'কি বললে?' বাণ-খাওয়া পাখীর গলায় রুদ্ধ আর্তনাদ ওঠে, 'ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলাম আমি?'

রূঢ় কথার নেশা, বড়ো সর্বনেশে নেশা। এই বাণবিদ্ধ পাখীটার যন্ত্রণা দেখেও মমতা আসে না অভিমন্যুর, বরং একটা হিংস্র উল্লাস ফুটে ওঠে চোখে-মুখে। শিকারীর নিষ্ঠুর উল্লাস!

'এ ছাড়া আর কি ভাবা যায়?' ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের চোখে সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে শিকারী বলে, 'এটাই তো স্বাভাবিক। যে জঞ্জাল তোমার কাছে বিরক্তিকর, যাতে তোমার যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছিলো, সে জঞ্জাল দূর করবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে? এটা যে স্বেচ্ছাকৃত নয়, তারই বা নিশ্চয়তা কি!'

এ-কী কদর্য কুৎসিত সন্দেহ! তীব্র বিদ্যুতাহতের মতো সহসা একবার প্রচণ্ডবেগে চম্‌কে উঠেই মঞ্জরী পরক্ষণে স্থির হয়ে গেলো। ক্ষণপূর্বে চোখের স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে বাষ্প জমে উঠেছিলো, এই তড়িৎ শক্তিতেই বোধকরি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে উঠলো সে বাষ্প। খাটের বাজুটা শক্ত করে চেপে ধরে বললো মঞ্জরী, 'হ্যাঁ ঠিক! তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছো! কিন্তু এতো নীচ হয়ে গেছো তুমি, এতো নোংরা, এতো জঘন্য, তা জানতাম না।'

'তা বটে? বিশেষণগুলো আমার প্রতিই প্রযোজ্য বৈকি। পাঁচঘণ্টা বাড়ীর বাইরে একটা বদমাইসের গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফিরেই যদি—'

'যাও, তুমি এ-ঘর থেকে! যাও বলছি। নইলে আমি যাচ্ছি—'

উত্তেজনায় শয্যাসীনা রোগিনী খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত গিয়েই সমস্ত মান-মর্যাদার প্রশ্ন ভুলে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

* * *

বাড়ীতে বিছানায় নয়, হাসপাতালের খাটে। এবারে হাসপাতালেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশ। ক'দিন ধরে আবার চলেছিলো বিপদের আশঙ্কার বাড়াবাড়ি। চলেছিলো যমে-মানুষে টানাটানি, ক্রমশঃ আবার ভালো হয়ে উঠেছে। ডাক্তাররা অভিমত দিয়েছেন—'ক্রাইসিস্ কেটেছে!'

কেবিনের এই জানলাটা দিয়ে দেখা যায় গাছটাকে! সারাদিন রোদে আর বাতাসে ঝিল্‌মিল করে তার সেই সোনালী সবুজ পাতাগুলো! তাকিয়ে-তাকিয়ে মঞ্জরী দেখে আর ভাবে। কী ভাবে?

কতো কী ভাবে! হাসপাতালের খাটে শুয়ে-শুয়ে মঞ্জরী যেন দার্শনিক হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা! ভালোবাসা! এই 'ভালোবাসা' শব্দটাকে নিয়ে আদি অন্তকাল ধরে কতো কাণ্ড। কিন্তু কি তার মূল্য? ও যেন শব্দের হাটের একটা সৌখিন পণ্য! ওকে নিয়ে যতো বিজ্ঞাপন ততো প্রচার। সবটাই আরোপিত।···অশ্বত্থতলায় পাথরের নুড়ি! দৈবাৎ কবে কে ভুল করে একটা ফুল ছুঁড়েছিলো তার পায়ে, পরবর্তী-কাল সেই ভুলের তল্পি বইছে। নুড়ির গায়ে জমাট হয়ে উঠেছে সিঁদুরের প্রলেপ, জমেছে ফুল বিল্বপত্রের পাহাড়। কেউ আর নুড়ি বলে না, বলে 'বাবাঠাকুর'! বাবাঠাকুরের মাথার উপর সোনার ঝালর রূপোর ছাতা, বাবাঠাকুরকে ঘিরে মন্দির উঠেছে সাতচুড়োর! ঝড় লাগতে দেয় না কেউ বাবাঠাকুরের গায়ে, দেয় না বৃষ্টির জল লাগতে। ফুল পাতার পাহাড়ে নড়ে না, সিঁদুর লেপা গায়ের রং মোছে না।

পাথরের এই নুড়িটাকে নিয়ে কতো গৌরব, কতো মহিমা! কতো স্তবগান রচিত হচ্ছে তার নামে, কতো বন্দনা, কতো প্রশস্তি! কতো আরতি-আলিম্পন-নৈবেদ্য। বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর! 'নুড়ি' বললে আর রক্ষে নেই তোমার। তাহ'লেই তুমি পাপিষ্ঠ, তুমি শয়তান, তোমার মতবাদ মানবতাবিরোধী! রোগশয্যায় পড়ে থেকে থেকে দার্শনিক হয়ে যাওয়া মঞ্জরীর চোখে বুঝি ধরা পড়ে গেছে 'বাবাঠাকুর'-এর স্বরূপ।

ভালোবাসা! সাবানের ফানুসের মতো একটা অদ্ভুত ফাঁকা অপূর্ব রংচঙে জিনিস! ওকে কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে পারো, সুন্দর, চমৎকার! এতোটুকু টোকা লাগাও, ব্যস ফিনিশ্‌। তবে?

কাঁচের আলমারিতে সাজানো এই জিনিসটা থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? এই শূন্যগর্ভ রঙিন খেলনাটাকে বজায় রাখতে যদি জীবনের আর সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকিয়ে দিতে হয়, চলন্ত জীবনের মূল্যে কিনতে হয় অবরুদ্ধ কারাগার, কি প্রয়োজন তাতে?

যে আশ্রয়ে নিশ্চিন্ততা নেই, সে আশ্রয়ের মূল্য কোথায়?

এমনি অনেক কথাই ভাবে মঞ্জরী হাসপাতালের খাটে শুয়ে। কেবিনে জানলা দিয়ে দেখা যায় এক টুকরো আকাশ, দেখা যায় নাম-না-জানা এক নতুন-বসন্ত-লাগা গাছের সবুজ পাতার ঝিলিমিলি।

* * *

বিকেলে সুনীতি এলো, এলেন বিজয়ভূষণ। আজ অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে মঞ্জরীকে, অনেকটা স্বাস্থ্যরক্তিম। বাইরে থেকে অনেকখানি রক্ত শরীরে চালান করানোর জন্যে সে রক্তাভা একটু যা কালচে!

'বাবাঃ! তোর হাসিমুখ দেখে তবু বাঁচলাম। দু'বার করে কী ভোগানই ভোগালি বেচারা অভিমন্যুকে!' সুনীতির কথার ধরন-ধারনই ওই। সব সময় সুনীতি পুরুষজাতির পক্ষ টেনে কথা বলবে।

বিজয়ভূষণ ফুলফোর্সে পাখা খোলা থাকা সত্ত্বেও হাতের রুমালটা নেড়ে বাতাস খাওয়ার ভঙ্গি করতে-করতে বলেন, 'তোমার মন্তব্যটি তো চমৎকার! আর ভোগাটা বুঝি কিছুই নয়?'

'আহা, তাই কি আর বলছি! ও তো ভুগলোই, তার সঙ্গে সে বেচারাও তো কম ভুগলো না?'

'দেখছিস্ শালী দেখছিস্?' বিজয়ভূষণ করুণ বচনে বলেন, 'সব সময় তোর দিদির পরপুরুষের প্রতি পক্ষপাত! আর এই যে একটা অভাগা আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁর জন্যে অহরহ ভুগে চলেছে, তার দুঃখের কথা একবার মনেও পড়ে না।'

'ঢং! ঢং আর গেলো না কোনদিন!...মঞ্জু, তুই কবে ছাড়া পাবি শুনেছিস কিছু?'

'ছাড়া?' মঞ্জরী একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে, 'ছাড়া পেতে আর দিলে কই তোমরা? সকলে মিলে তো খাঁচার দরজা চেপে রেখে, ছাড়া পাওয়াটা আট্‌কালে।'

'বটে রে পাজী মেয়ে! খুব কথা শিখেছিস্ যে। ঠাট্টা রাখ্, বাড়ী ফেরার দিন-টিন শুনিস্‌নি কিছু?'

'কই না!' মঞ্জরী অদ্ভুত একটা উদাস হাসি হেসে বলে, 'শুনেই বা কি হবে! ভাবছি বাড়ীতে আর ফিরবো না।'

'দুর্গা-দুর্গা! এ কী অলক্ষুণে রে।'

বিজয়ভূষণ গম্ভীরভাবে বলেন, 'হঠাৎ এতো বৈরাগ্যে উদয় কেন? সে শালা তো ইদিকে 'পরিবার—পরিবার' করে জীবন-যৌবন সর্বস্ব পণ করে বসে আছে দেখতে পাই। তবু মন যাচ্ছে না বুঝি?'

'মন? ওটা কি আর একটা পাবার জিনিস জামাইবাবু?'

'সেই তর্কই তো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।'

'কোনদিনই মীমাংসা হবে না। আচ্ছা বড়দি, একটা পুরোপুরি

প্র্যাকটিক্যাল কথার উত্তর দেবে? এখান থেকে ও-বাড়ীতে না গিয়ে আমি যদি তোমার বাড়ী গিয়ে থাকতে চাই, জায়গা দেবে?'

প্রস্তাব শুনে সুনীতি চমকে ওঠে, বিজয়ভূষণও। এ কোন্ ধরণের কথা? চমকানিটা সামলে নিয়ে সুনীতি সহজ হবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলে, 'শোনো কথা! আমি বলে সেইজন্যেই পাঁচবার তোর ছাড়া পাওয়ার দিন জানতে চাইছি। এখান থেকে ছুটি হলেই কিছুদিন তোকে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে রাখবো বলে মনে করছি। মা থাকলে তো এ-সময় মা'র কাছেই—'

মঞ্জরী বাধা দিয়ে শান্তগলায় বলে, 'আমি তো কিছুদিনের জন্যে বলছি না বড়দি, চিরদিনের জন্যে বলছি।'

বিজয়ভূষণ আরো গম্ভীরভাবে বলেন, 'অভিমানের নদী যেন সীমালঙ্ঘন করে কুলপ্লাবিত করে ফেলেছে মনে হচ্ছে, মঞ্জরীদেবী!'

'অভিমান-টভিমান কিছু নয় জামাইবাবু, এটা আমার গভীর চিন্তার সিদ্ধান্ত।'

সুনীত ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তা সমস্ত দিন বাজে কথা চিন্তা করলেই তার ফল এই হয়। কি একখানা উপন্যাসে সেদিনকে ঠিক এমনি একটা কথা পড়ছিলাম। কিন্তু ঘর-গেরস্তর মেয়ে তো আর উপন্যাসের নায়িকা নয় মঞ্জু! সিনেমা করার পর থেকেই আমি তোর ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। আমি তো ভেবে অবাক হয়ে যাই—অতো ভাব ছিলো অভিমন্যুর সঙ্গে—'

মঞ্জরী সহসা হেসে উঠে বলে 'আমিও তো তাই ভেবেই অবাক বনে যাচ্ছি বড়দি। অতো ভাব ছিলো—হঠাৎ তার এতো অভাব কি করে হলো?'

'তোমারই বুদ্ধির দোষে! আর কি জন্যে?'

'তাই হবে! কি জানো বড়দি, আগে ধারণাটা একটু ভুল ছিলো। জানতাম, ব্যবসা-বাণিজ্য বজায় রাখতেই বুদ্ধির দরকার, ভালোবাসা জিনিসটা একবার এসে গেলে জমা থেকেই যায়। ওকে বজায় রাখতে হলেও যে বুদ্ধির দরকার হয়, তা ঠিক জানতাম না। যাক্‌গে, তোমার বাড়ীতে তাহ'লে জায়গা হবে না। জানতাম অবিশ্যি হবে না। তবু বলে দেখলাম।'

সুনীতি ব্যাকুলভাবে বলে, 'চল না বাপু। যতোদিন ইচ্ছে থাকবি। অভিমন্যু যতোদিন না তোর পায়ে ধরে মান ভাঙাবে—'

মঞ্জরী মৃদু হাসে, 'তুমি ঠিক তোমার মতোই রয়ে গেলে বড়দি! মান-অভিমানের কথাই নয় এটা! জীবনের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কথা। কিন্তু ও তুমি বুঝবে না। তা তুমিই সত্যি সুখী।'

বিজয়ভূষণ বলেন, 'তাহ'লে শ্যালিকা-ঠাকরুণের কি ধারণা কেবল-মাত্র অবোধরাই সুখী?'

মঞ্জরী হেসে বলে, 'সব ক্ষেত্রে নয়, ব্যতিক্রমও আছে। যেমন আপনি।'

'হুঁ।'

'আচ্ছা জামাইবাবু, একটা প্রশ্ন করবো, খুব ভালো ক'রে ভেবে উত্তর দেবেন?'

'আজ্ঞা হোক্!'

'ধরুন বড়দি যদি খুব অন্যায় কাজ করেন, খুব অন্যায়—মানে, ধরুন ভীষণ নিন্দনীয়, বড়দির প্রতি আপনার কী মনোভাব হবে?'

'হুঁ! কী মনোভাব হবে। রসগোল্লা খাওয়ার মতো অবশ্যই নয়। একটা লাঠালাঠি কাণ্ড ঘটে যাবে অবশ্যই!'

'লাঠালাঠি কাণ্ড করার মতো হাল্‌কা দোষের কথা বলছি না জামাইবাবু—'

'বুঝেছি, সিনেমা করার মত ভারীভূরি দোষের কথা বলছিস্! তাহ'লে—মানে, তোর বড়দি সিনেমায় নামলে—'

'আঃ জামাইবাবু, আপনাকে আর সীরিয়াস করা যাবে না। মনে করুন, দিদি কাউকে খুনই ক'রে বসলো—'

বেছে-বেছে সবচেয়ে জোরালো কথাটাই বলে মঞ্জরী।

বিজয়ভূষণ সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'তাহ'লে দেশের সমস্ত উকিল-ব্যারিষ্টার লাগিয়ে দিয়ে ক'ষে মামলা লড়বো, যাতে ফাঁসি রদ হয়।'

'নাঃ! আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার আশা বৃথা! কিন্তু আপনি কি সত্যিই কোনদিন ভেবে দেখেছেন জামাইবাবু, আপনাদের দু'জনের ভালোবাসা অক্ষয় অটুট কি না, ধাক্কা লাগলে ভেঙ্গে পড়ে কি না।'

'তা যদি বলিস্, ভাই, কোনোদিনই ভেবে দেখিনি সত্যি! তোর বড়দির সঙ্গে যে আমার ভালবাসার সম্বন্ধ এই কথাটাই কোনোদিন স্মরণে আসেনি। যেমন কোনোদিন ভেবে দেখিনি, আমার এই মাথাটা ঘাড়ের ওপর ঠিকভাবে ফিট্ করে আছে কি না, হঠাৎ কোনো ধাক্কা লাগলে স্ক্রু খুলে প'ড়ে যাবে কিনা!'

সুনীতি এইসব রহস্যাবৃত কথা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'বাজে কথা রেখে কাজের কথা কও তো। আমি বলি কি, অভিমন্যুকে বলি, মঞ্জুকে আমি নিয়ে যাই, শরীরটা বেশ সারুক, ওর যখন ইচ্ছে হবে, যাবে। আর সত্যি, শরীর-অশরীরে তো মেয়েরা মা বোনের কাছেই যায়। গোড়া থেকে আমি যদি নিয়ে যেতাম ছাই তাহ'লে হয়তো এ কাণ্ড হতোই না।'

তাহ'লে কি মঞ্জরীরই ভুল হচ্ছে কোথাও? কিন্তু শুধুই কি তাই? অভিমন্যুর সেই ভয়ঙ্কর কথাটা? সেই জঘন্য কুৎসিত সন্দেহ!

তবু সেই ঘরে ফিরতে হবে মঞ্জরীকে?

এতো বড়ো পৃথিবীতে আর কোথাও ঠাঁই হবে না তার।

বিমনা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে সুনীতি ব'লে ওঠে, 'যাক্ যা হবার তা হয়েছে, দুঃখ করিসনে। গাছের সব ফল কি আর টেঁকে? ভগবান আবার দেবেন। তবে এবার সাবধান হবে। যথেষ্ট শিক্ষা তো হলো? নাকে-কানে খত দে, আর ধিঙ্গিপনার দিকে নয়।'

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'আর নয় বলা কি ক'রে সম্ভব? আমাকে তো একটু ভালো হলেই স্টুডিওয় যেতে হবে।'

'কি বললি? আবার তুই ওমুখো হবি?'

মঞ্জরী বালিশ থেকে মাথা তুলে প্রায় উঠে ব'সে উত্তেজিত ভাবে বলে, 'কেন বলো তো? তোমাদের ধারণাটা কি? ওরা কি আমায় বিষ খাইয়েছিলো?'

বিজয়ভূষণ আস্তে-আস্তে ওর মৃদু একটু হাতের চাপ দিয়ে বলেন, 'চটছিস কেন ভাই, ওখান থেকে এসেই ও'রকম হওয়ায় সকলেরই একটা বিরক্তি হয়েছে, এই আর কি!'

'কিন্তু আপনিই বলুন, জামাইবাবু, কন্ট্রাক্টে সই করেছি, আধখানা ছবি উঠে গেছে, এখন আমি বলবো, আর আমার দ্বারা হবে না? মরে যেতাম সে আলাদা কথা, বেঁচে থেকে সুস্থ হয়ে কথার খেলাপ করবো? প্রথমবারের অসুখের সময় আমার নার্সটার মুখে শুনেছি স্টুডিও থেকে না কি রোজ খোঁজ নিতে আসতো কেমন আছি, কবে যেতে পারবো।'

বিজয়ভূষণ সাপ-মরা, লাঠি না-ভাঙার সুরে বলেন, 'তা এতো ব্যস্ততাও আবার ভালো নয়। মানুষের অসুখ হবে না?'

সেবার একটা ছবি প্রযোজনা ক'রে অনেক টাকার ঘাড়ে জল পড়েছে বিজয়ভূষণের, কাজেই ও লাইনের প্রতি তাঁর আর তেমন সহানুভূতি নেই। বোধকরি সুনীতিরও এতে আক্রোশের কারণ তাই!

'বুঝবে না কেন? বুঝছে তো। এতদিন ধ'রে বুঝছে। কিন্তু এতো টাকা খরচের পর যদি আপত্তি করি, তখন আর বুঝতে চাইবে না নিশ্চয়। চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে মঞ্জরীদেবীর নামে আদালতে 'কেস' উঠলেই কি আপনাদের খুব মুখোজ্জ্বল হবে?'

'ওই তো হচ্ছে ঝঞ্ঝাটের কথা এইজন্যেই—'

বাইরে গিয়ে ঘট্-ঘট্ করা দেখতে পারি না। মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে চাস্, তো ঘরের মধ্যে থাক্ বাপু।'

'যেমন কচ্ছপ! কি বলো বড়দি? হাত-পা-মাথা বাঁচাতে খোলার মধ্যে ঢুকে ব'সে থাকার নীতি।' মুচ্‌কে হাসে মঞ্জরী।'

সুনীতি গম্ভীরভাবে বলে, 'কি জানি বাবা, তোদের এখনকার মেয়েদের মতি-বুদ্ধি বুঝি না। বুকের পাটা দেখে অবাক হয়ে যাই। আমার মেয়েগুলোও তো হয়ে উঠেছেন এক-একটি অবতার। সকাল-সকাল বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারলেই তবে ঢিট্ হবে ছুঁড়িরা। বিষ-দাঁত উঠতে পায় না। তা তো হবে না, পঁচিশ-তিরিশ বছর ধ'রে আইবুড়ো থেকে—'

'মেয়ে হয়ে মেয়েদের প্রতি তোমার এমন পাশবিক হিংসে কেন বড়দি? মেয়ে জাতটা শুধু জব্দই হোক, এ ইচ্ছে কেন?'

'ওলো, হিংসে নয়, হিংসে নয়—মমতা! যতোই লেখাপড়া শিখিস্, ভালো ক'রে তলিয়ে বোঝবার বুদ্ধি তো এখনো হয়নি। মেয়েমানুষকে যে স্বয়ং বিধাতাপুরুষই জব্দ করে রেখেছেন—'

'অত এব মানুষেও তার ওপর এক হাত নিক্, কেমন?'

'না হ'লে যে পদে-পদে জব্দ হবে—'

'হোক! জব্দ হতে-হতেই একদিন তার দিন আসবে।'

'সে দিনটি কি ভাই?' ঝেঁজে উঠে সুনীতি, বলে, 'বিধাতাপুরুষ হার মেনে নতুন নিয়ম তৈরী ক'রে পুরুষদের দিয়ে ডিম পাড়াবে?'

সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে সুনীতি,—বিজয়ভূষণ অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'তোমার এই বড়ো দোষ! কটু কথা যুক্তি নয়!'

'যুক্তি-টুক্তি ওসবের কিছুর ধার ধারি না আমি'—সতেজে বলে সুনীতি কিছুমাত্র না দমে, 'আমার যা খুশি, আমি বলবোই!'

সব কিছু বিস্মৃত হয়ে এইটাতেই হঠাৎ আশ্চর্য লাগে মঞ্জরীর। ওর মনে আসে, অভিমন্যু যদি অপর কারোর সামনে এভাবে তিরস্কার করতো মঞ্জরীকে, নিশ্চয় অপমানে কালো হয়ে যেতো মঞ্জরী, স্তব্ধ হয়ে যেতো একেবারে।

বিজয়ভূষণ ঘরের আবহাওয়া বদলাতে হয়তো ব'লে ওঠেন, 'সেদিন আগত ঐ, তা-তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপটা কি সেটা কি নির্ধারিত হয়েছে দিদি? তোরা কি, নিজেরাই কি পরিষ্কার ক'রে ঠিক করেছিস্?'

'করেছি বৈকি জামাইবাবু। পুরুষজাতি যেদিন স্বীকার করবে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের মতোই সমান প্রয়োজনীয় আর যেদিন বুঝবে তাকে বাঁধতে যে জিনিসটা দরকার, সেটা সমাজ-শাসন আর বিধি-বিধানের

যাঁতাকল নয়, অন্য একটা জিনিস, সেই দিনই হচ্ছে প্রকৃত দিনের রূপ।,

'এটা তোর অবিচার শালী! পুরুষজাত কি শুধুই শাসন করে? তারা কি ভালবাসতে জানে না?'

'ভালবাসতে? তা হয়তো পারে? কিন্তু আমি যা বলছি—সে জিনিসটা তো ভালবাসা নয় জামাইবাবু!'

'ভালবাসা নয়? তার ওপরেও আবার কি আছে রে?'

'তার ওপরেও কিছু আছে বৈকি জামাইবাবু। সেটা হচ্ছে—বিশ্বাস। মায়া-মমতা-স্নেহ, সে তা লোকে পোষা কুকুরটাকেও করে।'

* * *

পরাজয়! পরাজয়! বারেবারেই পরাজয় ঘটছে অভিমন্যুর। আত্মীয় পরিজনের কাছে, মঞ্জরীর কাছে, নিজের কাছে। নিজের কাছে পরাজয় যে সবচেয়ে গ্লানিকর। অথচ কিছুতেই নিজেকে শক্ত করে রাখা যাচ্ছে না। মঞ্জরীর অচৈতন্য পাংশু মুখ দেখলেই বুকের মধ্যে অস্থির একটা যন্ত্রণা হতে থাকে, নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে মনে হয় -জীবনে আর কখনো কঠিন কথা বলবো না তাকে। কিন্তু কি অদ্ভুত পরিস্থিতিই ঘটেছে। চৈতন্য ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠেছে মঞ্জরী নিজেই। দু'জনের মাঝখানে কী বিরাট এক ব্যবধান! অপরাধিনীর চোখের দৃষ্টিতেই যেন বিচারকের ভ্রূকুটি। ভ্রূ-কুটি সকলের দৃষ্টিতেই।

পূর্ণিমা ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'বেরুচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোথায় আবার!'—অভিমন্যুর অসহিষ্ণু উত্তর।

এই এক অদ্ভুত প্রকৃতি অভিমন্যুর। যে সাপ তাকে অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছে, সেইটাকে বুক দিয়ে ঢেকে অপরের চোখ থেকে আড়াল করতে চায়।

পূর্ণিমা এই অসহিষ্ণু স্বরে আহত হন। ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে ওঠেন, 'তা জানি, হাসপাতাল ছাড়া যাবার আর জায়গা নেই তোর। কিন্তু এও বলি, তোর মতন নির্লজ্জ বেটাছেলে কি ভূ-ভারতে আর আছে? বৌয়ের পেছনে টাকা ঢালতে-ঢালতে তো সর্বস্বান্ত হলি, নিজের শরীর স্বাস্থ্যটাও কি নিঃশেষ করতে চাস?'

'আমার শরীরে আবার কি হলো?'

'কি হলো, জিজ্ঞেস করগে যা আরশিকে। পোড়াকাঠের মতন চেহারা হয়েছে—আর বলে কি না, শরীরে কি হলো! কেবিন ভাড়া দিয়ে রেখে

দিয়েছিস, দিনে রাতে ছ'টো নার্স পুষছিস, ডাক্তারে ওষুধে ত্রুটি তো রাখিস্‌নি কোথাও, ছ'বেলা নিজে হাজিরা না দিলে হবে না ?'

'যেতে বারণ করছো ?'

'বারণ !' পূর্ণিমা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'আমার বারণ তুমি শুনবে যে ! এখন বুঝছো না, পরে বুঝবে মা কেন রাগ করে ! এত আস্কারা পেলে আর মেয়েমানুষ মাথায় উঠবে না ? চোদ্দবার ছুটে-ছুটে গেলে ওর প্রাণে আর একতিল ভয় থাকবে ?'

অভিমন্যু মুখ টিপে হেসে বলে, 'আচ্ছা মা, তুমি তো নিজেই বলো— বাবা তোমার ভয়ে থর-থর ক'রে কাঁপতেন, কি-না।'

'বকিস্‌নে বকিসনে, থাম ! সেই ভয় আর তোদের এই মিন্‌মিনে কাপুরুষতা ? তার মানে বোঝবার ক্ষমতা তোদের নেই। ওই বৌ জীইয়ে উঠে ছ'দিন পরে আবার যদি বলে "আমার যা খুশী তাই করবো", পারবি আটকাতে ?'

পারবে কি না সে সন্দেহ অভিমন্যুরও আছে, তাই চুপ ক'রে থাকে। পরিহাসের হাওয়ায় এ প্রশ্নের উত্তর উড়িয়ে দিতেও পারে না।

'আমি তোর মা হই অভি, আমি তোকে এই হুকুম করছি, তুই ওখান থেকে বাক্যিদত্ত করিয়ে আনবি বৌকে, এসে যেন আর ওই সব উনচুটে বিত্তির ছায়া যেন না মাড়ায়।'

অভিমন্যু মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে ধীরভাবে বলে, 'আর যদি বাক্যিদত্ত হতে না চায় ?"

'তাহ'লে বুঝবো আমার গর্ভে আমি মানুষ ধরিনি, ধরেছি জন্তু।'

অভিমন্যু কি বলতে গিয়ে একবার চুপ ক'রে যায়, তারপর বলে, 'হয়তো তাই বুঝতে হবে তোমাকে, কিন্তু আরও একটা হুকুম তাহ'লে করো। রাজী যদি না হয়, তাহ'লে এ-বাড়ীর দরজা কি তার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে ?'

পূর্ণিমা ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে ছেলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ভার ক'রে বলেন, 'অতো লম্বা-লম্বা কথা ব'লে আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে এসো না অভি, বুঝতে পারছি তোমার দরজা আমার সামনেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

তবু যেতে হবে অভিমন্যুকে। মঞ্জরীকে আজ ইন্‌চার্জ ডক্টর ঘোষালের বিশেষ ক'রে দেখতে আসার কথা। অভিমন্যুই কথা কয়ে রেখেছে। মানুষ কতো নিরুপায় ! মানুষ কতো বেচারা ! প্রতি পদেই তার পরাজয়।

❋ ❋ ❋

সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি। কোথায় গেলো সেই দিনগুলি !

যার খাঁজে-খাঁজে লুকোচরি খেলতো ইন্দ্রধনুর বর্ণছটা। কে সেই সুখের ঘরে হানা দিলো? বিজয়বাবু? গগন ঘোষ? সমাজ-প্রগতি?

মানুষ চলছে, মানুষ এগোচ্ছে। চলা মানেই কি এগোনো? সে চলা—একই বৃত্তপথে ঘুরে-ঘুরে চলা কি না কে তার হিসেব দেবে? হয়তো এমনি এক হাস্যকর চলার গৌরব নিয়েই মানুষ অগ্রগতির দাবী করছে। অতীত যুগে একদিন মানুষ মানুষের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারতো, আজ বোমা ছুঁড়ে মারছে, এটাই কি অগ্রগতি? নাঃ। অগ্রগতি তাকেই বলা হবে যেদিন নারীকে নিয়ে পুরুষের দুশ্চিন্তা ফুরোবে।···ভাবতে-ভাবতে চলে অভিমন্যু··· যেদিন জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন ক'রে তাকে নিয়ে 'হারাই-হারাই' ক'রে অস্থির হতে হবে না পুরুষকে। যেদিন নারী নিজেকে রক্ষা করতে শিখবে।···

প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন, প্রত্যেকের চিন্তাধারা বিভিন্ন। যখন যেদিকে সেই চিন্তার আলো পড়ে, সেই দিকটাই সত্যের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কিন্তু যথার্থ সত্য কি আজও নির্ণয় হয়েছে? আজও কি মানুষ বুঝতে শিখেছে, তার সত্যিকারের কল্যাণের রূপ কি?···

সুনীতি বললে, 'তাহলে ওই কথাই থাকলো, কি বলো, হ্যাঁ গো? এখান থেকে প্রথমটা মঞ্জু একবার ওর নিজের বাড়ীতে যাক্, একবস্ত্রে অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে চলে এসেছে, এখান থেকে নিয়ে গেলে অসুবিধেয় পড়বে। বাড়ী গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে, তারপর যতোদিন না সেরে উঠবে, ততোদিন আমার কাছেই থাকবে। এই শেষ কথা, এর থেকে আর নড়চড় নেই।'

তরল চিত্ত সুনীতি হাত দিয়ে হাতি ঠেলাতে চায়, চায় ফুঁ দিয়ে প্লেন ওড়াতে। সহজ কথা আর সহজ ভঙ্গি দিয়ে সব কিছুর সমাধান ক'রে নিতে চায় সে। মঞ্জরী হাসে ওর ছেলেমানুষী দেখে।

বিজয়ভূষণ বলেন, 'একতরফা তো রায় দেওয়া হচ্ছে। শালীর মতটা পাওয়া গেলো কই? ওর যে বড়ো কড়া কন্‌ডিশান। তোমার সতীন ক'রে নিয়ে ওকে আমার ঘর করতে দিতে রাজী থাকো তো তোমার বাড়ী পদধূলি দেবে, নচেৎ নয়।'

'তা—তাতেই কি আমি অরাজী না কি? তিনদিন যদি তোমার ম্যাও সামলাতে পারে, বুঝবো।'

মঞ্জরী মৃদু হেসে বলে, 'যতো ছুতো করতে পারো। জামাইবাবুর মতো নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ আর আছে না'কি জগতে—'

'ওই ছাখো। ওহে সুনীতিবালা, ছাখো—গুণগ্রাহী কাকে বলে।

'আজ তা'হলে যাই রে মঞ্জু! কাল আসবো আবার। কই আজ তো অভিমন্যু এলো না! সন্ধ্যে হয়ে গেলো।'

বিজয়ভূষণ গম্ভীরভাবে বলেন, 'কিছু কলহঘটিত ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'বাজে ধারণা আপনার। কিছুই হয়নি।'

'কলহ-কোঁদল যদি না হয়, তা'হলে তো ব্যাপার আরো ঘোরালো ক'রে তুলছো মঞ্জরী দেবী। তুমি যে আমাদের ভাবিয়ে তুললে।'

'আপনাদের ভাবানোই তো আমাদের কাজ। নইলে পাছে ভুলে যান।'

বিজয়ভূষণ একটু কাছে এসে ওর মাথায় একটু আদরের থাবড়া মেরে স্নেহগম্ভীরস্বরে বলেন, 'দুর্বল মাথায় কতকগুলো বাজে-বাজে ধারণা নিয়ে তোলপাড় ক'রে শরীর খারাপ করিসনে দিদি! মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে কেবলমাত্র অকারণ সন্দেহে। অপরের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখতে-শিখতে হয়, আর অপরের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। যেই কারো প্রতি অভিমানে অন্ধ হবে, তখনি তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখতে চেষ্টা করবে—এক্ষেত্রে তুমি নিজে কি করতে। মান আর অপমান এ দু'টো শব্দই তো মানুষের তৈরী করা! দেশ ভেদে, সমাজ ভেদে, ব্যক্তি ভেদে ওর আলাদা-আলাদা রূপ। তবে আর ওই দু'টো কাঁচা শব্দ নিয়ে জীবনের জটিলতা এতো বাড়ানো কেন? কে কার মান কাড়তে পারে? কে কাকে অপমান করতে পারে? তোমার সম্মান তোমার নিজের কাছে। তার নাম 'আত্মসম্মান।'

হঠাৎ মঞ্জরীর দুই চোখ ছলছলিয়ে আসে, বলে, 'সেইটে বাঁচাবার জন্যেই তো পালিয়ে আসতে চাই জামাইবাবু। প্রতিষ্ঠার সমস্ত ফাঁকি সে ধরা প'ড়ে গেছে।'

বিজয়ভূষণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, সুনীতির সহর্ষ কলোচ্ছ্বাসে থেমে গেলেন। সুনীতি কাকে যেন উদ্দেশ্য ক'রে বলছে, 'এই যে! বাবুর এতোক্ষণে আসা হলো। আমরা সেই কতোক্ষণ এসে ব'সে থেকে-থেকে এবার উঠে পড়লাম। এতো দেরী কেন? ভালো আছো?'

তাকিয়ে দেখলেন বিজয়ভূষণ, তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরী। অভিমন্যু ঘরে ঢুকলো। একহাতে সন্দেশের বাক্স আর একহাতে এক ঠোঙা লেবু আর আপেল।

* * *

নাঃ! এখনো নাকি হসপিটাল থেকে রিমুভ্ করেনি। উঃ, কী কেলেঙ্কারী বলুন তো! আমি তখন বলেছিলাম, ওসব নতুন-ফতুনে কাজ নেই' সহকারী নলিনীবাব মুখখানা বেজার ক'রে বলেন. 'এখন দেখুন বিপদ।'

প্রযোজক পরিচালক গগন ঘোষ সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে স্মিত প্রসন্নস্বরে বলেন, সবই এ্যাক্সিডেন্টাল ! নতুন বলেই অসুখে পড়েছে, পুরনো হ'লে পড়তো না, এমন বলতে পারো না।'

'তা-না হয় না বললাম ! কিন্তু এই যে ছ'হপ্তা কাজ আটকে রইলো—'

'লোকসান তো হচ্ছেই, কিন্তু উপায় কি ? এখন তো আর ওকে বাদ দিয়ে নতুন ক'রে কিছু করা সম্ভব নয় ?'

এদিকে বনলতা যে জবাব দিতে চাইছে ! বলে কি না সামনের মাসে চেঞ্জে যাবে ।'

'তাই নাকি ? এটা আবার কখন বললো ?'

আজই ফোন্ ক'রে জানতে চাইছিলো সুটিং হচ্ছে কবে ? আমার কাছে "এখনো অথই জল" শুনে বললো, 'তাহ'লে এখন সমুদ্রে ডুবুন, আমি চললাম সামনের মাসে ।'

'কোথায় যাচ্ছে ?'

'কে জানে মুঙ্গেরে না কি যেন বললো ।'

'কোথাও যাবে না। ওসব দর বাড়ানো। যাও, এখন কিছু তৈল প্রদান করোগে। নতুন কি আর সাধে নিয়েছি ? এই সব ছুঁড়িদের চাল দেখে ইচ্ছে করে, গাঁ থেকে 'র' মেয়ে ধ'রে এনে কাজ করি। তাছাড়া—এই মঞ্জু না কি, এ মেয়েটার মধ্যে পার্টস ছিলো ! আর হপ্তাখানেক অপেক্ষা ক'রে।'

'দেবে না—নলিনীবাবু মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'এত শীগগির বাড়ী থেকে আসতে দেবে না ! পেটের দায়ে পয়সা কামাতে আসা তো নয়,সেরেফ্ সখ্। শুনলাম, স্বামী না কি প্রফেসর, স্বামীর দাদারাও আছে বড়ো বড়ো লোক। বাড়ীতে দারুণ আপত্তি, আধুনিকা কারো কথা শোনেননি।'

'এতো খবর তুমি কোথা থেকে জোগাড় করলে হে ?'

'খবর ? খবর হাওয়ায় হাঁটে।'

'সে যাক, বনলতাকে তোয়াজ ক'রে ঠিক ক'রে রেখো। ব'লে দিও ছবি না ক'রে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না।'

'আসছে ছবিতে দয়া ক'রে আর ওটাকে নেবেন না।'

'কোন্‌টাকে ? নতুনকে ?'

'না, বনলতার কথা বলছি। ভারী চাল। মুখ টিপে হেসে ভিন্ন কথা বলে না ! কথায় যেন অহঙ্কার ছিট্‌কোয়।'

'এখন ওর দিন রয়েছে করবে বৈ কি।' গগন ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে ক্ষুদ্রহাস্যে বলেন, 'কতোই দেখলাম ! ছুঁচ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বেরোয় !'

'আর আপনি জীবনভোর ব'সে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করুন!'

গগন ঘোষ হেসে ওঠেন। নলিনীবাবুর রাগে তার ভারী কৌতুক।

মঞ্জরী এদের সকলকে মুস্কিলে ফেলেছে, রীতিমত ফেলেছে। কিন্তু রাগ ক'রে বাতিল করা চলে না। ষ্টেজের থিয়েটার নয় যে একজনের অনুপস্থিতিতে আর একজন চালিয়ে দেবে। অনেক টাকা ঢেলে সীন তোলা হয়েছে! মুস্কিল বনলতাকে নিয়েও! তার ভারী অহঙ্কার। আসলে সে হচ্ছে মঞ্চাভিনেত্রী! গগন ঘোষই পর পর এই দু'খানা ছবিতে নামিয়েছেন তাকে! কিন্তু রাশি ক'রে টাকা নিয়েও তার ভাবভঙ্গি যেন গগন ঘোষের পিতৃদায় উদ্ধার করছে।'

'নিশীথ ঠিক আছে তো? না কি তিনি বিলেত যেতে চাইছেন?'

'চায়নি এখনো। চাইলেই হলো!'

অতঃপর এটা ওটা নানা কথা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত নলিনীবাবু গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বনলতার তোয়াজ করতে এবং মঞ্জরীর খোঁজ করতে। কবে নাগাদ সে কাজে যোগ দিতে পারবে, এটা জানতে পারলে কতকগুলো ব্যাপার ঠিক করে নেওয়া যায়।

গাড়ীতে উঠে নলিনীবাবু বেজার মুখে বিড়বিড় ক'রে বলেন 'ঝকমারি! শালার 'সহকারী' হয়েই জীবন কাটলো, স্বাধীনভাবে একটা ছবি করবার চান্স আর পেলাম না আজ পর্যন্ত। শুধু লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়িগুলোর তোয়াজ করতে করতে প্রাণ গেলো।'

* * *

'ক্ষতিপূরণ?' নলিনীবাবু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, ক্ষতিপূরণ হিসেবে কতো টাকা আপনি দিতে পারেন মিষ্টার—মিষ্টার—'

'লাহিড়ী!' অভিমন্যু বলে।

'ও, ইয়েস্! মিষ্টার লাহিড়ী! তাহ'লে প্রশ্ন করি, ছবিটার পেছনে এ পর্যন্ত কতো টাকা খরচ হয়েছে, সে আইডিয়া আছে আপনার?'

'ঠিক ধারণা না থাকলেও মোটামুটি একটা আন্দাজ অবশ্যই আছে!' আরক্তমুখে বলে অভিমন্যু।

নলিনীবাবু একচোখ কুঁচ্‌কে দরাজ স্বরে বলেন, 'বলুন! বলে ফেলুন আপনার আন্দাজটা!'

অপমানের কালি মুখে মেখে অভিমন্যু বলে, 'আপনার উকিলের কাছেই বলবো!'

'বে—শ, তাই বলবেন। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন মিষ্টার

লাহিড়ী, তাহ'লে বলছি, ইচ্ছে ক'রে ঝঞ্ঝাট ডেকে না আনাই ভালো। অবশ্য আমার কিছু বলা উচিত নয়, আপনার আর্থিক অবস্থা আপনিই বোঝেন, তবে অকারণ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা—তাছাড়া হেফাজেতও অনেক আছে।'

অভিমন্যু ভুরু কুঁচকে বলে, 'চল্লিশ-পঞ্চাশ! ছবি তো অর্ধেক মাত্র তোলা হয়েছে শুনলাম!'

অর্ধেক নয়, ওয়ান-থার্ড! খরচ-খরচার সম্পূর্ণ হিসেব অবশ্যই কোর্টে দাখিল করা হবে। কিন্তু ভেবে দেখুন মিষ্টার লাহিড়ী, মিসেস লাহিড়ীর অসুস্থতার জন্যে আপনি এতো করবেন, অথচ ওঁকে ঠিক বিশ্রাম দিতে পারবেন কি? কোর্টে হাজির হতে হলেও তো কষ্ট আছে—'

অভিমন্যু বিরক্তভাবে বলে, 'সে আমি বুঝবো!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তাই বুঝবেন। তবে কাজটা, ভালো করলেন না! অন্ততঃ একবার যদি আমাকে মঞ্জরীদেবীর সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে দিতেন। তিনি যখন নাবালিকা নন, তখন—'

'দেখুন, আমার এখন কাজের সময়। আপনি আসতে পারেন! আপনাদের যা কিছু বক্তব্য কোর্টেই বলবেন!'

'আচ্ছা নমস্কার।'—উঠে গিয়ে গাড়ীতে ওঠেন নলিনীবাবু, মনে-মনে গালিগালাজ করতে-করতে! কাকে নয়? অভিমন্যুকে, মঞ্জরীকে, গগন ঘোষকে, সিনেমা লাইনকে, নিজের ভাগ্যকে।

নলিনীবাবু চলে যাবার পর খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে বসে থাকে অভিমন্যু। ভাবতে চেষ্টা করছে ব্যাপার কি হয়ে গেলো। অনেক বচসা হলো লোকটার সঙ্গে, অনেক কথা কাটাকাটি। রাস্কেলটা শেষ পর্যন্ত কিনা কোর্টের ভয় দেখায়! প্রথমটা অভিমন্যু যথেষ্টই ভদ্রতার সুর বজায় রেখেছিলো, হাত জোড় ক'রে বলেছিলো, মঞ্জরী অসুস্থ, ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে, কিন্তু লোকটা যেন নাছোড়বান্দার শিরোমণি! হাত কচলায় আর বলে, কথা দিচ্ছি, ওঁকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেবো না। আউটডোরের কাজ নয়, ষ্টুডিওর মধ্যে! গাড়ী ক'রে যাবেন, গাড়ী ক'রে আসবেন! বলেন তো আমি নিজে পৌঁছে দেবো। নইলে মারা যাবো স্যার, সেরেফ্ মারা যাবো ইত্যাদি-ইত্যাদি। ওই ধূর্তশিয়ালটির মতো মুখের বিনয় বচন আর কতোক্ষণ সহ্য করা যায়! তবু হাত জোড় করে বলেছে অভিমন্যু, 'মাপ করবেন মশাই, ডাক্তারের নিষেধ! সেই কথায় হতভাগা বলে কি না, আমাদের একদিন ডাক্তার আনতে দেবেন স্যার? শহরের সেরা ডাক্তারকে নিয়ে আসবো কোম্পানীর খরচায়—'

এরপর আর ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঝগড়াই হয়ে গেছে। এবং

অভিমন্যু প্রস্তাব করেছে, চুক্তিভঙ্গের অপরাধে যা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সে তা দিতে প্রস্তুত !

ঝোঁকের মাথায় রোখ চেপেছিলো ! নলিনীবাবু চলে যাবার পর অভিমন্যু চোখের সামনে একটা ধোঁয়ার পর্দা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। ঝোঁকের মাথায় তো চোটপাট ক'রে বসলো, কিন্তু কোথা থেকে সেই প্রভূত পরিমাণ টাকা ধার করবে ? আত্মীয়-স্বজনের কাছে ? দাদাদের কাছে ? কারণটা কি বলবে ? তাহ'লেই কি মান বজায় থাকবে ? উঃ, মঞ্জরী কি তার এতো শত্রুও ছিলো ! অনেক কথা বয়ে যায় মনের মধ্যে নদীর স্রোতের মতো চিন্তার স্রোত !···সহসা এক সময় চমকে স্তব্ধ হয়ে যায় অভিমন্যু, নিজের এতোক্ষণকার অসতর্ক চিন্তার দিকে তাকিয়ে। নির্জন ঘরে নিজে-নিজেই মরমে মরে যায়।

হ্যাঁ, এতোক্ষণ মরার কথাই ভাবছিলো অভিমন্যু। নিজের নয়, মঞ্জরীর। ভাবছিলো, এর চাইতে মঞ্জরী যদি সেরে না উঠতো, যদি মারা যেতো, অনেক ভালো হতো। সমস্ত কুশ্রীতার হাত এড়িয়ে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র একখানি শোক নিয়ে দিন কাটাতে পারতো অভিমন্যু। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ এই অসতর্কতার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কাল মঞ্জরীকে হাসপাতাল থেকে আনার কথা। এখনো বাড়ী এসে পৌঁছয় নি, আর আজ যদি স্বার্থপর হতভাগ্য ব্যবসাদারেরা তার কাজে যোগ দেবার দিন ঠিক করতে ধর্ণা দিতে আসে, রাগ হয় না ? বারবার ভাবতে চেষ্টা করে অভিমন্যু, সে কেন রাগ ক'রে অমন নিষ্করুণ চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলো ? কিন্তু বারবার সমস্ত যুক্তি আড়াল ক'রে একখানি মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বেদনাবিধুর-বিষণ্ণ-শ্যামল একখানি মুখ। দীর্ঘপল্লবাচ্ছন্ন কালো ছ'টি চোখে অভিমানের ভর্ৎসনা হেনে বলছে, 'তুমি এই ?'

কিন্তু অভিমন্যু কি করবে ? সেও তো রক্তমাংসের মানুষ ?

কাল মঞ্জরীকে আনবার কথা। যদিও পূর্ণিমাদেবীর অভিমত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে পারেনি অভিমন্যু মঞ্জরীর কাছে। শুধু জানিয়েছে, এবার থেকে মা'র ইচ্ছাস্বরূপ চলতে হবে। নইলে নিশ্চয়ই পূর্ণিমাদেবী সংসার ত্যাগ ক'রে তীর্থে বাস করবেন। কিন্তু ইত্যবসরে সুনীতিদেবী বায়না নিয়ে ব'সে আছেন বোনকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখবেন। মঞ্জরীও যেন সেইদিকে নেমে আছে। উঃ! কী ক'রে যে এই দুর্দিন কাটিয়ে আবার সুদিনের মুখ দেখতে পাবে অভিমন্যু !

✲ ✲ ✲

সুদিনের মুখ। সত্যিই কি আর কোনোদিন দেখতে পাবে ?

'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি।'

সমস্ত রং যে কী এক ক্লেদাক্ত কাদা-জলের স্পর্শে ধুয়ে-মুছে বিবর্ণ হয়ে গেল। হয়তো শীঘ্রই মঞ্জরীর রোগ সেরে যাবে, ঘরে-বাইরে যতো ঝঞ্ঝাট, তাও একদিন যাবে। আত্মীয়দের কৌতূহল যাবে, পরিজনদের বিরাগও যাবে, কিন্তু মঞ্জরী আর তার অবাধ উন্মুক্ত হৃদয়ের মাঝখানে যে অভেদ্য প্রাচীরটা ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠেছে, সেটা কি কোনদিন যাবে?

বোবা সেই দেওয়ালটার দু'দিকে পরস্পর দু'জনে মাথা কুটবে আর দিন কাটবে। ধূসর-বিবর্ণ-আলোহীন-উত্তাপহীন দিন!

এখন আর ওসব দিদির বাড়ি-ফাড়ি গিয়ে কাজ নেই। অভিমন্যু মনে-মনে ভাবে। ওইসব সংস্পর্শে দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে মঞ্জরীর। মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকে বেশী পৃষ্ঠবল থাকা ভালো নয়। ফোন ক'রে বিজয়-বাবুকে জানিয়ে দেবে শীগ্‌গির, এখন আর মঞ্জরী ওখানে যাচ্ছে না, এখানে মা তাহলে বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

হবেন বৈকি, সত্যিই হবেন। রোগাতুরা পুত্রবধূকে কাছে না পেয়ে। নয়, উদ্যতবজ্র শাসন হাতে নিয়ে অপরাধিনীকে হাতে না পেয়ে। দু'বার ক'রে রোগে পড়ার অপরাধের শাস্তি তো পেল না মঞ্জরী।

ফোন্ করবে ব'লে উঠি-উঠি করছে, এমন সময় শ্রীপদ এলো।

'ছোটদাদাবাবু, ছোটবৌদির বড়দির বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছে।'

'ডাকতে এসেছে? কাকে ডাকতে এসেছে?'

'আপনাকে, আবার কাকে? যান, এক্‌খুনি যান, জরুরী ডাক।'

'কেন, তা কিছু বলেনি?'

'কিছু বলছে না। আপনি চলেই যান না তাড়াতাড়ি।'

'কি মুস্কিল! কে এসেছে কে?'

'ওনাদের বামুনঠাকুর।'

'কোথায় সে? ডাক্ না।'

'পথে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলছি দাদাবাবু, আপনি যান।'

শ্রীপদ'র আদিখ্যেতায় বিরক্ত অভিমন্যু গেঞ্জির ওপর একটা জামা গায়ে দিতে-দিতে নেমে যায়, আর একটা আশঙ্কায় মনটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। মঞ্জরী নিজেই জোর ক'রে হাসপাতাল থেকে ছুটি ক'রে দিদির বাড়ী গিয়ে ওঠেনি তো? ধ্যেৎ, তাই কখনো সম্ভব। হাসপাতালের কি একটা আইন নেই? ছাড়বে কেন তারা? অভিমন্যুর প্রশ্নের কি জবাব দেবে তারা? কিন্তু শুধু-শুধু সুনীতির হঠাৎ কি এমন দরকার পড়লো, যে এমন জরুরী তলব?

❋ ❋ ❋

সোনালী সবুজ পাতাগুলো পড়ন্ত বেলার সোনা-রোদে সবটা সোনালীহয়ে

গেছে। ঝিলমিল-ঝিলমিল, ঝিরঝির-ঝিলমিল, মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই। ঘরের মধ্যে খাটে শুয়ে বোঝা যেতো না কি গাছ, আজকাল বেড়াবার হুকুম পেয়ে বারান্দায় বেড়িয়ে এসে বুঝতে পেরেছে মঞ্জরী, কি গাছ ওটা।

তেঁতুল গাছ! বাতাসের ঢেউ লেগে, পাতায়-পাতায় জাগে শিহরণ। তাকিয়ে থাকতে ভারী ভাল লাগে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সোনারোদ ম্লান হয়ে আসে, পাতাগুলো সহসা যেন ঘন সবুজ হয়ে ওঠে, আর এই সময় আসে অভিমন্যু, আসে সুনীতি, আসে বিজয়বাবু। বেশী অসুখের সময় জায়েরা দেখে গেছেন একদিন প্রচুর আঙুর-বেদনা-আপেল-নাসপাতির ভেট নিয়ে। ননদেরাও দেখে গেছেন দু'জনে খালি হাতেই! নিকট সম্পর্ক, দূর সম্পর্ক অনেকেই এলো এক-একদিন। তখন শুধু শুয়ে থাকতো মঞ্জরী। এখন আর অন্য কেউ আসে না। এখন বারান্দায় বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে থাকতে ওরা আসে। আর আসার আগে পর্যন্ত কেমন যেন শূন্য-শূন্য লাগে।

মঞ্জরীর কি আর কেউ ছিলো? কোনদিন আর কোনো আশ্রয় ছিলো তার?

পাতাগুলো ঘন সবুজ হতে হতে গাঢ় কালো হয়ে গেলো, মুছে গেলো তার নৃত্যছন্দের ঝিলমিল। অন্ধকার হয়ে এলো আকাশ! সমস্ত পৃথিবী যেন ক্লান্ত হতাশায় মুখ গুঁজে বসলো।

নার্স ডাকলো, 'ঘরে চলে আসুন দিদি, ঠাণ্ডা লাগবে।'

'যাই'—বলেও চুপচাপ বসে থাকে মঞ্জরী ইজিচেয়ারটায়।

নার্স কাছে এসে বলে, 'দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, আসুন। আপনার বাড়ী থেকে আজ আর কেউ এলেন না বোধহয়।'

'তাই দেখছি।' যতোটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে মঞ্জরী।

'আর তো শুধু আজকের রাতটা! কালকেই তো চলে যাচ্ছেন নিজের লোকদের কাছে, কি বলেন দিদি? খুব মজা লাগছে তো?'

মঞ্জরী শুধু একটু হাসি দিয়ে উত্তর দেয়।

'সেইজন্যেই আজ আর কেউ এলেন না মনে হচ্ছে।'

'তাই হবে।'

'আসুন দিদি, চলে আসুন।'

'যাই।'

দুধের পর গল্পের বই। গল্পের বইয়ের পর রাতের আহার। তখনো মনের মধ্যে প্রতীক্ষার রেশ গুঞ্জরণ ক'রে ফেরে। কেবিনের নিয়ম শিথিল। অসময়ে আসা চলে। সন্ধ্যাবেলা কাজে আটকে গেলে, বেশী রাতেও আসা যায়।

কিন্তু কত বেশী রাতে ?

এগারোটা ? বারোটা ? তারপর কি গেট খোলা থাকে ? খোলা থাকে আসার পথ ? নার্সটা এক সময় ব'লে ওঠে, 'দিদির আজ ঘুম আসছে না ?'

'না। কি রকম যেন গরম হচ্ছে।'

'গরম নয়, আহ্লাদ !' নার্সটা হাসে, 'দেখি সব পেসেন্টকেই ছাড়া পাবার আগের রাত্তিরে আর ঘুমোয় না।'

আহ্লাদ ! মঞ্জরী ভাবতে চেষ্টা করে, হাসপাতালের ঘর থেকে ছাড়া পাবে ভেবে তার কি খুব আহ্লাদ হচ্ছে ? কই, বরং যেন আতঙ্ক ! হ্যাঁ, আতঙ্ক ! এ যেন বেশ ছিলো। দায়হীন-চিন্তাহীন শিকড়ে মাটির স্পর্শহীন অদ্ভুত একটা হাল্কা জীবন ! কাল থেকে আবার কতো যুদ্ধ !

কাল বেলা দশটায় ছুটি। সুনীতির সঙ্গে কথা হয়ে আছে, বিজয়বাবুও আসবেন বেলা দশটার সময়। হাসপাতালের লেখাপড়ার কাজ মেটানো হ'লেও অভিমন্যুর দায়িত্বের ছুটি। বিজয়ভূষণের সঙ্গেই চলে যাবে মঞ্জরী।

নিজের ঘর ? নিজের ঘর কোথায় মঞ্জরীর ? যে অভিমন্যুর স্পষ্ট সন্দেহ করতে বাধে না—মঞ্জরী তার অজাত সন্তানকে হত্যা করেছে, সেই অভিমন্যুর ঘর তো।

নির্লজ্জ সেই সন্দেহ, নগ্ন নিবারণ তার উদ্ঘাটন। সেই মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে গেছে। যাচাই হয়ে গেছে প্রেমের আর বিশ্বাসের। নির্ণয় হয়ে গেছে সম্পর্কের নিগূঢ় যত রূপ। আবার সেই ঘরে আশ্রয় নিতে যাবে মঞ্জরী ? আবার গর্ভে ধারণ করবে অভিমন্যুর সন্তান ?

ছি-ছি-ছি ! সমস্ত অন্তরাত্মা 'ছি-ছি' করে ওঠে। তবু জ্বালা নয়, যন্ত্রণা নয়, সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এক গভীর শূন্যতায়। সেই পাতা ঝিলমিল সন্ধ্যায় হতাশ প্রতীক্ষার শূন্যতায় ! অভিমন্যু এলো না ! আশ্চর্য মানুষের মন। আশ্চর্য রহস্যময়ী রাত্রির লীলা।

❋ ❋ ❋

সকালের রূপ আলাদা। সূর্য স্পষ্ট, সূর্য রূঢ়, সূর্য বাস্তব। সূর্যের আলোয় মোহময়ী দুর্বলতার ঠাঁই নেই। সকালের আলোয় মনকে দৃঢ় করে নিয়েছে মঞ্জরী। সকালবেলা অভিমন্যু এলো। দশটা বাজে তখন।

ক্লিষ্ট অন্ধকারে মুখে রাত্রি জাগরণের স্পষ্ট ছাপ !

না-না, ও মুখের দিকে তাকাবে না মঞ্জরী। ও ওর ওই ক্লিষ্ট মুখের অভিনয়ে পরাজিত করতে চায় মঞ্জরীকে ! এইতেই জিতে যায় পুরুষ। এই ওদের কৌশল, এ ওদের হাতিয়ার। কঠিন হতে হবে মঞ্জরীকে।

'চলো।'

'জামাইবাবু এলেন না ?'

'না।'

'আমার সঙ্গে কথা ছিলো, তিনিই আসবেন।'

'দেখতেই তো পাচ্ছো কথা রাখতে পারলেন না।'

'বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি যাবো না !'

'পাগলামী করো না। চারিদিকে এরা কৌতূহলী হয়ে শুনছে ?'

'বেশ, তুমি তাহ'লে আমাকে দিদির ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাও।'

'সে হয় না।'

'কেন হয় না ? বলছি তো তোমাদের বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি আর যাবো না।'

'আমি তোমায় মিনতি করছি মঞ্জরী, এখানে আর ছেলেমানুষী করো না।'

আবার সেই কৌশল। সেই ক্লিষ্ট-বিষণ্ণ-গভীর-বেদনাময় মুখের ফাঁদ ! উপায় নেই, কোন উপায় নেই ! এখানে কেলেঙ্কারী করা চলে না। জামাইবাবুর উপর ক্রোধে অভিমানে চোখ ফেটে জল আসতে চায়, দাঁতে-দাঁত চেপে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে মঞ্জরী।

বাড়ী পৌঁছে আর কোনো কথা নয়, টেলিফোনের দিকেই আগে এগিয়ে যায় মঞ্জরী। কিন্তু অভিমন্যু ভেবেছে কি ? ও কি মঞ্জরীকে নজরবন্দি ক'রে রাখতে চায় ? মঞ্জরীর রিসিভার-ধরা হাতটা চেপে ধ'রে বলে কিনা—'ফোন্ করো না।'

'কেন ?' ব্যঙ্গের হাসি হেসে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে মঞ্জরী, 'এ স্বাধীনতাটুকুও আমার নেই ?'

'তোমার ভালোর জন্যেই বারণ করছি মঞ্জরী !'

'আমার ভালো ? সে করবার সাধ্য আর ভগবানেরও নেই। ছাড়ো, আমি জামাইবাবুকে ডাকছি একখুনি আমায় নিয়ে যেতে।'

'উনি আসবেন না।'

'আসবেন না ? আমি ডাকলেও আসবেন না ? নিশ্চয়ই তুমি তাহ'লে ওঁদের সঙ্গে কিছু একটা করেছো। নইলে আমি ডাকলে—'

'তুমি কেন, কেউ ডাকলেও উনি আর আসবেন না মঞ্জরী। সহস্রবার ডাকলেও শুনতে পাবেন না ! কাল বিকেলে হঠাৎ ঘাড়ের শির ছিঁড়ে মারা গেছেন বিজয়বাবু।'

ভগবান ব'লে কি সত্যিই কেউ আছেন ? ভুল-ভুল, কেউ নেই। মানবজীবনের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা যদি কেউ থাকে, তো সে হিংস্র শক্তিধর ক্রুর একটা আত্মা। কোটি কল্পকাল ধ'রে অত্যাচারিত মানবের অভিশাপে আরো হিংস্র

হয়ে উঠেছে সে, উঠেছে উন্মাদ হয়ে।

* * *

আলুথালু সুনীতি মুখ তুলে মঞ্জুকে দেখে হাহাকার ক'রে ওঠে, 'আর কি দেখতে এলি ভাই? তোর জামাইবাবু আর নেই রে! তোকে আনতে যাবার বদলে নিজেই চলে গেলেন।'

পাথরের পুতুলের মতো ব'সে রইলো মঞ্জু। না দিলো দিদিকে সান্ত্বনা, না কাঁদলো নিজে। তিন মেয়ে সুনীতির ছোট মাসীর এই নির্মায়িক ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলো। এই তিনদিন তারা ওঠেনি, মুখে জল দেয়নি। সুনীতিই কথা বলতে থাকে, 'তুই এসে থাকবি ব'লে তোর জামাই-বাবুর কতো জল্পনা-কল্পনা, রোগামানুষ তুই, পাছে কোনো অসুবিধে হয়। আর কোনো দিকে তাকালেন না রে, সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।'

মঞ্জরী তখন নিশ্চল হয়ে ভাবছে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তার মূর্তিটা কি রকম। দিদির আক্ষেপ একটু থাকলে একসময় বলবে ভেবেছিলো, 'দিদি, তোমাকে ছেড়ে যাবো না, এখানে থাকবো বলেই এসেছি।'

বলা হলো না। সুনীতির আক্ষেপোক্তির মধ্যেই বোঝা গেল এ-বাড়ীতে আর মুহূর্তকাল টিঁকতে পারছে না সে, শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাধা হলেই চলে যাবে বড়ো ননদের কাছে। হাজারিবাগে! সুনীতিকে তিনি পেটের মেয়ের মতো দেখেন।

সংকল্প ছিল নিজের উপার্জনে নিজের ব্যয়ভার বহন করবে দিদির বাড়ীতেই থেকে। সংকল্প ছিলো উপার্জন ক'রে ক'রে শেষ ক'রে দেবে অভিমন্যুর ঋণ! না এই কয়েক বৎসরব্যাপী দাম্পত্যজীবনের অন্নবস্ত্রের ঋণ নয়, যে মুহূর্তে অভিমন্যু উচ্চারণ করেছে সেই ভয়ঙ্কর কথা, যে মুহূর্তে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, তারপর থেকে অনাত্মীয় অভিমন্যু যা খরচ করেছে মঞ্জরীর জন্যে, সে ঋণ শোধ ক'রে দেবে মঞ্জরী। আইনের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ? সেটা তো পরের ব্যাপার। সত্যিকার বিচ্ছেদ তো আগেই ঘটে।

মঞ্জরী রোগের জন্যে অনেক খরচই করেছে অভিমন্যু, যে রোগটা নাকি তার স্বকৃত। এ ঋণ শোধরাতে না পারলে মঞ্জরীর শান্তি নেই।

কিন্তু এ সব সংকল্প আপাততঃ টিঁকলো না। এতো বড়ো পৃথিবীতে মঞ্জরীর কোনো আশ্রয় নেই। ভাইয়ের ঘর? সে তো আরো তিক্ত!

যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছে মঞ্জরীর, আজ পর্যন্ত যে ঘরগুলো দেখেছে, সবগুলো পর-পর মনে করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কোথাও নেই আলোর কণিকা। সবাই যেন একজোটে মঞ্জরীর মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে

রেখে উপরে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

অতএব সেই বিডন স্ট্রীটের পুরনো তিনতলাখানা। যেখানে শুধু পূর্ণিমার ক্রুর সর্পিল দৃষ্টি, আর অভিমন্যুর আরক্ত থম্থমে মুখ।

সেই মুখ নিয়ে অভিমন্যু মঞ্জরীর মুখের সামনে নামিয়ে দেয় ওষুধের গ্লাস, নামিয়ে দেয় আঙ্গুর-বেদানা-ছানা-সন্দেশ সাজানো প্লেট!

দেখে রক্তের কণায়-কণায় জমে ওঠে ধিক্কারের গ্লানি।

স্নায়ুতে-স্নায়ুতে আর্তনাদ ওঠে বিদ্রোহের।

মঞ্জরীর শেষ পরিণাম কি তাহ'লে আত্মহত্যা?

❋ ❋ ❋

বান্ধবী রমলা অবাক হয়ে বলে, 'তুই কি ক্ষেপে গেছিস্? অভিমন্যুবাবুর মত ভালো লোক জগতে আছে? তাঁর সঙ্গে বনছে না তোর?'

মঞ্জরী কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'ধ'রে নে, আমিই বদ্‌লোক। কাজেই ঠোকাঠুকি। মানভরে চলে এসেছি, এখন ফিরে যেতে তো পারি না? 'পেয়িং গেষ্ট' হিসাবে রাখিস্ তো বল্ বাবা!'

প্রাণ ছিঁড়ে পড়ে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, অপমানে চোখ ফেটে জল ঝরতে চায়, তবু বজায় রাখতে হয় কাষ্ঠহাসির লজ্জাবরণ। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বন্ধুর কাছে চলে এসেছে সে, স্বামীকে জব্দ করতে। এর বেশী কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর কলহ! জগতের সমস্ত বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে যা হাল্‌কা। কিন্তু রমলাও তো বি, এ, পাশ করেছে, করেছে এতোদিন ধ'রে সংসার। দু'তিন ছেলের মা সে। সর্বোপরি মঞ্জরীর বন্ধু সে। অতএব সে নির্বোধ হ'লে কোন দিনই নাগাল পেতো না কাজেই তার চোখে মঞ্জরীর চেষ্টাকৃত এই আবরণ ভেদ ক'রে সত্য তথ্য ধরা পড়তে দেরী হলো না। মনে-মনে বললো, 'হুঁ বাবা, যখনি তুমি সিনেমায় নামতে গেছো, তখনি সন্দেহ করেছি, সুখের সংসারে আগুন লাগলো বুঝি! হয়েছে, বেশ ঘোরালো ব্যাপারই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তোমার ল্যাজের আগুন নিয়ে আমার সুখের সংসারে কেন বাবা? আমি কিন্তু ঘাড় পাতছি না।'

কিন্তু মুখে ভদ্রতার আর বন্ধুত্বের ঠাট বজায় রাখতেই হয়। তাই মঞ্জরীর সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে ওঠে, 'কী বললি? 'পেয়িং গেস্ট?" আমার বাড়ীতে দু'দিন থাকবি তুই পেয়িং গেস্ট হয়ে? যা-যা, বেরো-বেরো। যে মুখে এই পাপকথা উচ্চারণ করলি, সে মুখ আর দর্শন করতে চাইনে। কেন, আমার কি এমন হাঁড়ির হাল, যে তুই দু'দিন থাকলে—'

মঞ্জরী হাসিচাপা মুখের অভিনয় ক'রে বলে, 'দু'দিন কোথা? বললাম যে বরাবর, জন্মের শোধ।'

'ঈ-স্! তারপর অভিমন্যুবাবু এসে আমার গলায় গামছা দিয়ে শ্রীঘরে নিয়ে যাক্ আর কি!'

'গেলেই হলো! আমি কি নাবালিকা?'

'আরে বাবা, মেয়েমানুষ জাতই নাবালিকা। নাবালিকা কেন, চিরবালিকা। নইলে বুড়োবয়সে এই কেলেঙ্কারী করিস্? নে, আয় বোস।···কি? গাড়ীতে বেডিং-সুটকেশ আছে? তাহ'লে তো রীতিমত একটি উপন্যাস। ভাবনা ধরিয়ে দিলে যে। এ বাড়ীতে যে আবার আমার একটি অবোধ নাবালক পোষ্য আছে, তাকে নিয়ে একতিল স্বস্তি নেই আমার। সে আবার না ফাঁক পেয়ে পরকীয়া রস আস্বাদন করতে বসে। সামলাইগে বাবা!'

হাসির ঝঙ্কার তুলে চলে যায় রমলা, আর কালপেঁচার মতো মুখ ক'রে স্বামীকে গিয়ে বলে, 'ছ্যাখো কী সর্বনেশে উড়ো বিপদ!'

স্বামী-স্ত্রী অনেকক্ষণ পরামর্শ ক'রে কী-ভাবে কথা বলা যুক্তিসঙ্গত তার প্ল্যান ভেঁজে রমলা যখন ফের এ-ঘরে আসে—দেখে, না আছে মঞ্জরী, না আছে মঞ্জরীর ট্যাক্সি!

শুধু টেবিলের উপর একটুকরো কাগজে দু'লাইন লেখা—

'রমলা, একটু ঠাট্টা ক'রে গেলাম কিছু মনে করিস্ না ভাই। সত্যি তো আর পাগল হইনি আমি, যে তোর ছন্দে-গাঁথা সংসারের ছত্রভঙ্গ করতে এখানে থেকে যাবো।'

পরস্পর মুখের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে-আস্তে একটা নিশ্বাস ফেললো। ঠিক অস্বস্তির নিশ্বাস নয়, বরং লজ্জার। এতোক্ষণ ধ'রে দু'জনে মঞ্জরীর বিবেচনাকে যে কটু নিন্দাবাদ করেছে, ভারী হাস্যকর হয়ে গেলো সেটা। মঞ্জরীর কবলমুক্ত হবার জন্য যা কিছু দামী প্ল্যান করলো, সেটা যেন মশা মারতে কামান দাগা হয়ে গেলে।

একটু পরে রমলা বললো, 'জানি এইরকমই কিছু একটা করবে। চির-দিনের খামখেয়ালী।'

রমলাপতি মৃদু হেসে বললো, 'নইলে কি আর তোমার সখী হয়?'

নাঃ, কোথাও জায়গা হবে না। এখন খোলা রইলো দূর বিস্তীর্ণ পথ। খোলা রইলো সমস্ত বহির্জগৎ। খোলা রইলো আত্ম-ধ্বংসের দরজা। এই ধ্বংসের মূর্তিটাই চোখে পড়লে লোকের। চোখে পড়বে সমাজের। আর সংসারের। আর, আর কিছু দেখতে পাবে না কেউ। অবজ্ঞা আর ঔদাসীন্য, ঘৃণা আর অবহেলা, সন্দেহ আর সহানুভূতি হীনতার পাষাণ ভার দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে যারা একটা জীবনকে আত্ম-ধ্বংসের এই ভয়ঙ্কর খাদের ধারে নিয়ে এলো, যারা তাকে সেই খাদে ঝাঁপ দিতে দেখেও হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলো, তাদের নাম

রইলো মহিমার খাতায়। তারা সতর্ক, তারা সাবধানী, তাদের পা পিছলোয় না। যে মেয়েরা পথে নামলো, তাদের নেমে আসার ইতিহাসকে কে কবে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখতে গেছে? তারা নেমে গেছে, তলিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, এই তাদের পরিচয়।

❋ ❋ ❋

'আমি বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা!
তাম্বুল সাজিনু, দ্বীপ জ্বালাইনু
মন্দির হইল আলা!
আমি বঁধুর লাগিয়া—'

'চৌধুরী-ম্যান্‌সন'-এর সুউচ্চ ত্রিতলের একটি ফ্ল্যাটের একখানি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে সুকোমল সার্টিনের গদিপাতা শয্যায় গা ডুবিয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে রেশমী কুশনে ঠেশ দিয়ে ব'সে গুনগুন ক'রে পদাবলীর এই পদটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইছিলো বনলতা। বনলতার পরিধানে দুধের ফেনার মতো মসৃণ মোলায়েম রেশমের পাড়হীন শাড়ী, গায়ে একটা জমাট রক্ত-রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ। হাতে বিদ্যুৎ-ঝিলিক-হানা মোটা একজোড়া বালা, সিঁথিতে সরু আট্‌কানো ছোট্ট একটি টিক্‌লি আর কোথাও কোনো আভরণের বালাই নেই—না কানে, না গলায়। সাজপোষাকে একটা অদ্ভুতত্ব আনাই বনলতার সখ। নিত্যনতুন ফ্যাসান আবিষ্কার করছে সে, আর অম্লানবদনে যা খুশি তাই সাজে সেজে বেরোচ্ছে। দেহসজ্জাতে যা খুশি করুক, বনলতার গৃহ-সজ্জাটি কিন্তু নিখুঁত ভরাট। তিনখানা ঘর আর আর ব্যালকনি-সম্বলিত এই ফ্ল্যাটটিতে সীলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

পুরুষ বন্ধুর অভাব না থাকলেও বাস করে সে একাই। পোষ্যের মধ্যে একটা নেপালী দারোয়ান সর্বদা সিঁড়ির মুখে বসে থাকে, আর বাড়ীর ভিতরে চাকর দেবনারায়ণ সর্বদা চরকি ঘোরে। পান থেকে চুন খসলে, কি জানলার গায়ে একটু ধুলো জমলে, দেবনারায়ণের চাকরি টলমল করে। আরো একটি পোষ্য আছে বনলতার, সে তার সৌখিন আর সোহাগী ঝি মালতি। বনলতা বলে মালতি শুধুই ঝি। আর মালতি আড়ালে বলে বনলতা তার দূর সম্পর্কের বোন। কিন্তু সে যাক, আড়ালের কথা কথাই নয়। মালতির কাজ শুধু গৃহকর্ত্রীর ফাইফরমাস খাটা, আর তাঁর পরিত্যক্ত হরেক-রকম শাড়ী-ব্লাউজে বাহার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো! দেবনারায়ণ দু'চক্ষে দেখতে পারে না তাকে, নেপালী আর মালতি যুগপৎ দু'জনকেই সে নিদারুণ হিংসে করে।

সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরের চারদিক একবার অলস দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলো বনলতা। কি ভালোই লাগতো যদি এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প'ড়ে থাকা যেতো! কিন্তু ঘণ্টা ছেড়ে কিছু মিনিটও সইবে না এখুনি উঠে পড়তে হবে। আজ থিয়েটারের দিন। আগে শুধু মঞ্চে ছিলো, তবু কিছু অবসর ছিলো, গগন ঘোষ তাকে প্ররোচনা দিয়ে-দিয়ে পর্দার জগৎ লুফে নিতে চাইছে তাকে। ইত্যবসরেই খান তিন-চার বইয়ের জন্যে কণ্ট্রাক্ট করে ফেলতে হয়েছে। যশ, অর্থ, অনুরোধ, উপরোধ। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কোনোখানে দাঁড়াতে দিতে রাজী নয় ওরা। ছেড়ে দেবে একেবারে সেইদিন, যেদিন সেকেলে হয়ে যাবে বনলতা, পুরানো হয়ে যাবে, যাবে বুড়ো হয়ে। যখন জমি দখল করতে আসবে নতুনের দল। বনলতা জানে সেদিন পরিশ্রান্ত বনলতাকে পথের মাঝখানে ফেলে দিয়ে যাবে ওই—যশ, অর্থ আর অনুরোধ, উপরোধ। ফিরে তাকিয়ে দেখবে না আর!

অতএব যতো পারো লুটে নাও এইবেলা, যতো পারো অহঙ্কার ক'রে নাও এইবেলা। তবু আজ মোটেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না বনলতার। তবু উঠতেই হবে। স্টুডিওর কাজে যদিও বা শরীর ভালো নেই ব'লে কামাই চলে, থিয়েটারে মরে না যাওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। এখুনি উঠতে হবে, গিয়ে হাজির হতে হবে "রঙ্গনাট্যে"র সেই পচা পরিচিত গ্রীণরুমে। এই সৌখিন সাজ-সজ্জা ত্যাগ ক'রে মাথায় ঝুঁটি বেঁধে আর নাকে তিলক কেটে বৈষ্ণবী-সন্ন্যাসিনী সেজে দাঁড়াতে হবে হাজার দু'হাজার, দর্শকের সামনে! গাইতে হবে 'আমি বঁধূর লাগিয়া শেজ বিছানু—'

এর থেকে আর নিস্তার নেই 'বনলতার। ক্রীঃ-ক্রীং-ক্রীং। উঠি-উঠি করতেই ফোন এলো।

'আঃ!'—গান থামিয়ে মুকে বিশ্রী একটা ভঙ্গি ক'রে বনলতা আপন মনে উচ্চারণ করলো, 'ওই যে আবার আমার কোন বঁধুর টনক নড়লো!'

উঠলোও না, নড়লোও না। শুধু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বাক্যবাহী যন্ত্রটার দিকে।

ক্রীং-ক্রীং, ক্রীং-ক্রীং! টেলিফোন! ছুটে এলো মালতি, রিসিভারটা তুলে নিয়ে অতি চটপটের ভঙ্গিতে 'হ্যালো' 'হ্যালো' ক'রে কে ডাকছেন জেনে নিয়ে মুখে ফিরিয়ে কর্ত্রীকে বললো, 'গগন ঘোষ।'

'উঃ! মরেও না তো শয়তানটা।'

ব'লে উঠে এসে রিসিভারটা নিজের হাতে নিয়ে বনলতা মিহি আদুরে-গলায় সুরু করে—হ্যাঁ, আমি বনলতা বলছি—কি বলুন? এ্যাঁ। কি বললেন? মঞ্জরী? সেই নতুন মেয়েটা? বলেন কি? ···সর্বনাশ করেছে!

···সর্বনাশ করেছে ! ·· আমার এখানে ?···আমার এখানে কোথায় থাকবে ? ···অসম্ভব !···কি বলছেন ? মাত্র দু'-এক-বেলার জন্যে ? তারপর ?···কি বলছেন ? আপনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন ?···সেটা এখুনি ক'রে ফেলুন না ? আবার আমাকে মুস্কিলে ফেলা কেন ? মুস্কিল ছাড়া আর কি ? আমি তো এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ ! হ্যাঁ আজ থিয়েটার আছে। বাড়ীতে।··· বাড়ীতে আমার ঝি থাকে । ও-হ্যাঁ, চাকর দারোয়ান—।—বেশ, ব'লে যাচ্ছি । কিন্তু শুনুন, কিছু মনে করবেন না, ওই যা বললেন—দু'-একবেলা। বুঝতেই পারছেন কিরকম অস্বস্তি বোধ করছি।—ও, হাঃ-হাঃ-হাঃ। আপনারও আচ্ছা ঝামেলা। কে কোথায় কর্তা-গিন্নিতে ঝগড়া করে গৃহত্যাগ করবে, আর তার ম্যাও সামলাবেন আপনি ! হি-হি-হি, ও—হ্যাঁ—তা যা বলছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আনুন তাকে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিন্তু। নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হ্যাঁ,—আচ্ছা ছেড়ে দিলাম !'

রিসিভারটা ঠুকে বসিয়ে দেখে বনলতা ধপ্ ক'রে আবার বিছানায় ব'সে পড়ে ব'লে ওঠে, 'উঃ, কী ফ্যাসাদ !'

মালতি এতোক্ষণ চোখ ঠিক্‌রে হাঁ ক'রে বনলতার কথাগুলো, গিল-ছিলো, এখন হাঁ করেই প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার গো দিদি ?'

'আর বলিস্ কেন ? হতভাগা গগন ঘোষ অনাসৃষ্টি এক আবদার ক'রে বসেছে।'

'কী আবদার গো।'

'বলে কিনা এক নতুন ছুঁড়ি নাকি বাড়ীতে বরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তেজ ক'রে চলে এসেছে, তাকে আমার ফ্ল্যাটে ওঠাতে হবে।'

'ওমা, সে-কি কথা গো, দিদি ?'

'ওই কথা ? নে এখন কুলো-বরণডালা নিয়ে দোরে দাঁড়াগে যা, এলো ব'লে।'

মালতি অনেক রঙ্গ অনেক ঢং ক'রে নানা প্রশ্নে মঞ্জরীর খবর জেনে নিতে চেষ্টা করে, বনলতা যথাসম্ভব বিরক্ত চিত্তে উত্তর দেয় এবং যখন শেষ মন্তব্য করে 'থাম্ মালতি, আর জ্বালাস্‌নে' ঠিক সেই সময় দেব-নারায়ণ এসে দরজায় দাঁড়ায়। গগন বাবু এসেছেন একজনকে নিয়ে। বসার ঘরে বসানো হয়েছে তাঁদের।

কেশবেশ আর একটু পরিপাট্য সাধন ক'রে বনলতা ধীর মন্থর-গতিতে বসবার ঘরে গিয়ে দর্শন দেয়।

'এই যে নিয়ে এলাম এঁকে ! দু'একদিনের মধ্যেই যা'হোক একটা ব্যবস্থা করবো আমি। সেই দু'টো দিন তোমার এখানে—'

এখন বনলতার সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি। পরম অমায়িকভাবে স্তব্ধ মঞ্জরীর পিঠে একখানা হাত রেখে বনলতা উদার স্বরে বলে 'ঠিক আছে। ছোট বোন দিদির বাড়ী এসে দু'চারদিন থাকবে, তার আবার কথা কি! তবে ভাই দিদিটি তো তোমার চললো এখন দাসত্ব করতে। আমার লোকজন রইলো, ঝি মালতি আছে খুব চট্‌পটে, যা দরকার হবে ব'লে করিয়ে নিতে হবে। বুঝলে তো?'

গগন ঘোষ বিনয়ে গ'লে গিয়ে বললেন, 'সে আমি জানতাম। জানতাম বলেই এঁকে ভরসা দিতে পেরেছি। আচ্ছা মিসেস লাহিড়ী, আমি তাহ'লে আসি।'

ঘোষ চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বনলতা চঞ্চল স্বরে বলে, 'আমি চলি ভাই। কিছু মনে করো না—মালতি!'

বলাবাহুল্য মালতি দরজার ও-পিঠেই ছিলে। বনলতা ব্যস্তভাবে বলে, 'এই যে! শোনো নতুন দিদিমণিকে দেখা-শুনা করো। কি দরকার-টরকার জেনে নাও, বুঝলে? আমার মত ক'রে যত্ন করবে মনে রেখো! চলি ভাই! উঠে পড়ো, তুমিও নিজের বাড়ীর মতো—'

মুহু-মুহুঃ হর্ণের শব্দে ব্যস্ত বনলতা পায়ে-পরা শ্লিপারটা খুলে রেখে, প্রায় জুতো পরতে-পরতে নেমে যায়। আর আগের মতো স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে মঞ্জরী। ভদ্রতার যে প্রতিদান দেওয়া আবশ্যক, তাও তার মনে থাকে না। মালতির বার-বার প্রশ্নে মঞ্জরী একসময় ক্লান্তস্বরে বলে, 'আমার কিছু লাগবে না। উনি ফিরুন আগে।'

উনি অর্থে বনলতা। মালতি ভেবেছিলো খুব গায়ে প'ড়ে আলাপ করে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার রহস্যটা জেনে নেবে, সুবিধে হলো না। ঠোঁট উল্টে ব'লে চ'লে গেলো, 'তাহ'লে আর কি বলবো বলুন! দিদি এসে যদি আমায় গাল দেয়, তখন একটু দেখবেন।'

ও চলে যেতে তবে মঞ্জরী অবাক অভিভূত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো। দেখে আরও অবাক হয়ে গেলো। মঞ্জরী কলকাতায় এতো চেনা থাকতে এলো এখানে!

মঞ্জরী! প্রফেসার লাহিড়ীর স্ত্রী মঞ্জরী লাহিড়ী? সারা কলকাতা জুড়ে আত্মীয়গোষ্ঠী—শিক্ষিতা-সভ্য, মার্জিত-রুচি, ধনী-অভিজাত! সেই-সেই মঞ্জরী রাত্রিবাস করতে এলো এক থিয়েটারের অভিনেত্রীর বাড়ীতে? শুধু থাকা নয়, তার কৃপার দানে থাকা?

আগুন লেগে ঝল্‌সে যাওয়ার মতো জ্বালা করছে পিঠের সেই জায়গাটা যেখানে অভিনেত্রী বনলতার রং-মাখানো ছুঁচলো নখ্‌ওয়ালা হাতখানা

ঠেকেছিল। অনুকম্পার সেই দাহ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে। দাহ সবখানে! দেহে, মনে, প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুতে।

❁ ❁ ❁

সহকারী নলিনীবাবু মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'বেরিয়ে আসবে, তা জানতাম। শ্যাম-কুল—দুই কি আর একসঙ্গে রাখা যায়? এ লাইনে যে এসেছে তাকে আর 'সোয়ামী'র ঘর করতে হয় না! অনেক বেটিকেই তো দেখলাম! প্রথমে ভাব দেখায় যেন কুইন ভিক্টোরিয়া, তারপর মদ খেয়ে নাচে।'

প্রয়োজক-পরিচালক মুচকে হেসে বলেন, 'যাকগে ও ভালোই টানা-পোড়েনে কাজ হয় না।'

'ওর মধ্যে যে আপনি কি দেখলেন—'

'দেখেছি হে দেখেছি। রীতিমত পার্টস্ আছে মেয়েটার মধ্যে।'

অতঃপর পরবর্তী বই সম্বন্ধে আলোচনা হতে থাকে, এই মঞ্জরীকে যাতে আর কেউ ভাঙিয়ে নিতে যেতে না পারে, তার জন্যে চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরীর জল্পনা চলে।

মানুষের মন, আশ্চর্য এক বস্তু। ও যে কখন কোন্ পথে প্রবাহিত হয়! যে মানুষটা দু'দিন এসে থাকার প্রস্তাবে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকেছিলো, তাকেই যে বরাবরের মতো রেখে দিতে চাইবে, কিছুতেই ছাড়বে না, একথা কি বনলতা নিজেই তখন কল্পনা করতে পেরেছিলো?

আর মঞ্জরী? সেও অবাক আশ্চর্য হয়ে দেখছে কী অদ্ভুত বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সে! যাকে ঘৃণা করি, অশ্রদ্ধা করি, তার ভালো বাসার বন্ধনও কি এমন অচ্ছেদ্য?

প্রথম-প্রথম গগন ঘোষ দু'চারটে সস্তা ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই বনলতা নাক কুঁচকে বলেছে, 'পাগল হয়েছেন? ওখানে মানুষ থাকতে পারে? ওকে আস্তানা না ব'লে আস্তাবল বললেই ঠিক বলা হয়।'

সে ভদ্রলোক যদি ইসারায় মঞ্জরীর আর্থিক অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন, তো বনলতা কটাকট্ শুনিয়ে দিয়েছে, 'পয়সা কম, যার ক্যাপাসিটি বেচে লাখ-লাখ টাকা তুলবেন, তাকে তদুপযুক্ত দেবেন নাই বা কেন? দু'দিন বাদে দেখবেন ওর বাজার দর।'

ফোনের ওদিক থেকে ঘোষমশাই যদিও বিনীত স্বীকৃতি জানিয়েছেন 'আহা, সেকথা কি আমি মানছি না? আমার সামর্থ্য অনুযায়ী দেবো বৈকি! নিশ্চয় দেবো—'

সঙ্গে-সঙ্গে মুখরা বনলতা বলেছে, 'আপনাদের তো সব সময়ই বৈষ্ণব-বিনয়। সমুদ্রকে বলেন, গোষ্পদ। কিন্তু যাক্, আপনার সামর্থ্য হিসেব না

ক'রে, ওর সামর্থ্যই হিসেব করুন না? এরপর যখন মোটা টাকা দিয়ে বম্বে এসে কেড়ে নিয়ে যাবে, তখন আপনি যে হাত কামড়াবেন।'

গগন ঘোষ অঘাধ জলের মাছ ব'লে যে একেবারেই তাতবেন্ না তা হ'তে পারে না। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'বম্বেকে আটকাতে পারে এতো পয়সা এখানে কার আছে? কে দিচ্ছে? আমাদের ললাটলিপিই তো ওই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ক'রে তুলি আর চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। গাধার দিকে কৃতজ্ঞতার বালাই ব'লে তো কোথাও কিছু থাকে না?'

রিসিভারের ওপর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছে বনলতা, বলেছে, 'থাকবে কোথা থেকে? গাধা যে! ধোপার প্রতি গাধার কৃতজ্ঞতা দেখেছেন কোথাও?'

এইভাবেই মাসের পর মাস গড়িয়ে গেছে, মঞ্জরী রয়ে গেছে এখানে আর অদ্ভুত সুন্দর এক সখিত্ব গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে, মঞ্জরী আর বনলতা। কিন্তু কি ক'রে গড়লো?

মঞ্জরী তো প্রতিনিয়ত বনলতার নীতিকে অসমর্থন করে? ঘৃণা করে তার উচ্ছৃঙ্খলতাকে।...বনলতা মদ খেয়ে চুর হয়, বনলতা পুরুষ বন্ধুকে এনে রাত্রে আশ্রয় দেয়, বনলতা কিম্ভুতকিমাকার সাজ করে, যা যে-কোনো ভদ্র মনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত—বিশেষ ক'রে মেয়ে মন। তবু যখন পরদিন সকালে বনলতা হতশ্রী পোষাকে বর্ণলেশহীন মলিন মুখে কৌচে কাত হয়ে প'ড়ে করুণ দৃষ্টি তুলে বলে, 'তুই আমায় খুব ঘৃণা করিস্ মঞ্জু?'

তখন কেমন এক মমতায় বুকটা ভ'রে ওঠে মঞ্জরীর। রাত্রে নিশ্চিত ক'রে ভেবে রাখে রাত পোহালেই চলে যাবে এই কুৎসিত কদর্য পরিবেশ ছেড়ে, ঘৃণায় মুখ দেখলেই সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। মানবমনের চিরন্তন রহস্য! কথা বন্ধ করা হয় না, চলে যাওয়া হয় না, হয় তর্ক।

আজও চলছিলো সেই তর্ক--পর্ব।

চলে যাবে স্থির সংকল্প নিয়ে সকাল থকে কাঠ হয়ে ব'সেছিলো মঞ্জরী, চা পর্যন্ত খায়নি। মালতি গিয়ে বনলতাকে সে খবর জানাতেই, ও-ঘর থেকে এ-ঘরে এসে হাজির হলো বনলতা!

গায়ে একটা সরু ফিতে লাগানো সেমিজ মাত্র সার, যাতে বুক পিঠ সবটাই প্রায় অনাবৃত, তার উপর অতি সূক্ষ্ম একখানা দামী জর্জেট নিতান্ত অগোছালো ক'রে জড়ানো! পায়ে মখমলের চটি, সেটা ঘষতে ঘষতে লট্‌পট্ ক'রে এলো। সামনের কৌচে ব'সে প'ড়ে জড়িতস্বরে বললে, 'কি, আমার ওপর ঘেন্নায় জলগ্রহণ করবি না?'

কাঠ দেহ আরো কঠিন হয়ে উঠলো মঞ্জরীর, ব'সে থাকলো মুখ ফিরিয়ে।

বনলতা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে তেমনি জড়ানো স্বরে বলে, 'আমার ওপর রাগ ক'রে কি করবি মঞ্জু? আমি তো খারাপই! আমি মদ খাই, পুরুষ নিয়ে রাত কাটাই, এ কি তুই জানিস্ না? তবে?'

আরো শক্ত হয়ে ওঠে সম্মুখবর্তিনীর চোয়াল দু'টো, ভঙ্গি আরো অনমনীয়। তীব্রস্বরে ব'লে ওঠে, 'জানি! আর জেনে বুঝেও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এখানে প'ড়ে আছি ব'লে নিজের ওপর ঘেন্নায় গা ঘিনঘিন করছে। আমি চলে যাচ্ছি।'

সেকেণ্ড কয়েক মঞ্জরীর সেই ক্রোধারক্ত আর বিতৃষ্ণা-কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বনলতা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যা তবে। আর তোকে আট্‌কাবো না। হ্যাঁ, চলেই যা! আমার সংসর্গে থাকিস্‌নে। আমি খারাপ, খুব খারাপ! নর্দমার পোকার মতো খারাপ আমি।'

মঞ্জরী এই স্বীকারোক্তির সামনে বিচলিত হলো। বিচলিত হলেও ক্রুদ্ধ-স্বরেই বললো, 'নিজেকে এভাবে ভাবতে তোমার লজ্জা করে না?'

'লজ্জা! হায়-হায়! তুই যে হাসালি মঞ্জু! আমাদের আবার লজ্জা!'

রাগ চলে যায়, মঞ্জরী হতাশ হয়ে বলে, 'কিন্তু লতাদি! নিজেকে তুমি যতো খারাপ বলো, ততো খারাপ তো তুমি সত্যিই নও।'

'কি বললি? অ্যাঁ? ততো খারাপ নয়? হা-হা-হা! হাসিয়ে হাসিয়ে কি মারতে চাস্ আমায়? আমি যে কতো খারাপ, আমার যে কতো খারাপ, তোরা ভদ্রলোকের বৌ-রা ত ধারণা করতেই পারবি না। মঞ্জু! শুনলে শিউরে উঠবি।'

মঞ্জরী দৃঢ়স্বরে বলে, 'অন্য কারো কথা জানি না, তবে তোমার কথা বলতে পারি, সত্যি অতো খারাপ তুমি নও। ইচ্ছে ক'রে খারাপ সাজো। বেপরোয়া-কুশ্রীতা করাই যেন তোমার সখ! এমনি তোমাকে দেখলে ভাবা যায় না, বিশ্বাস হয় না যে তুমি—অথচ তোমার অভদ্রতা দেখে লজ্জায়-ঘেন্নায় আমারই মরতে ইচ্ছে করে।'

'আঁ, কি বললি? আমার লজ্জায় তোর মরতে ইচ্ছে করে?' বলেই সহসা নেশাগ্রস্ত বনলতা অদ্ভুত একটা কাণ্ড ক'রে বসে!

দু'হাতে বুকটা চেপে ধ'রে কৌচে গড়িয়ে শুয়ে প'ড়ে হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে। ছুটে আসে মালতি। ছুটে আসে দেবনারায়ণও। মালতি হাতের ইসারায় তাকে ভাগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'কি হলো গো নতুন দিদিমণি? দিদি হঠাৎ এমন করছে কেন?'

মঞ্জরী মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না!'

'ওমা! জানো না কি গো! সামনেই বসে রয়েছো—

এবার বনলতা কাঁদতে-কাঁদতেই ব'লে ওঠে, 'ওরে, এতো আহ্লাদ আমি যে সইতে পারছিনে, বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

'আহ্লাদ আবার কিসের? রাতে বুঝি মাত্রাটার জ্ঞান ছিলো না।'

বলতে-বলতে মালতি উচ্চস্বরে হাঁক পাড়ে, 'দেবা, এক গেলাস জল আন শীগগির।'

জল আনতেই খানিকটা জলের ঝাপ্‌টা বনলতার চোখে-মুখে দিয়ে তাকে টেনে তুলে বসিয়ে গেলাসটা মুখে ধ'রে বলে, 'নাও, খাও দিকি!'

বনলতা এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে ব'লে ওঠে, 'মঞ্জু রে, আবার যে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

'বাঁচতেই হবে তোমায়।' দৃঢ়স্বরে বললো মঞ্জরী।

'মালতি, তুই যা।' বনলতা জর্জেটের আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছতে-মুছতে বলে, 'ও ভেবেছে মদের ঝোঁক। না রে মঞ্জু, হঠাৎ আহ্লাদের ঝোঁক সামলাতে পারলাম না, তাই!'

'তুমি ইচ্ছে করলে এখনো ভালো হতে পারো লতাদি।'

বনলতা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'আজ উত্তর দেবো না, দু'বছর পরে এর উত্তর তুই নিজের কাছেই পাবি।'

মঞ্জরী শিউরে ওঠে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সেই শিহরণ!

'কি ভয় পেলি?' বনলতা একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বলে, 'আগে আমিও ওইরকম শিউরে উঠতাম।'

মঞ্জরী আরো দৃঢ়স্বরে বলে, 'ও আমি বিশ্বাস করি না। নিজের শক্তি থাকলে নিশ্চয়ই ভালো থাকা যায়। নিজে দুর্বল না হ'লে কার সাধ্য তাকে নষ্ট করে? অভিনয় একটা শিল্প, প্রোফেশন হিসেবে সেটা গ্রহণ করলেই উচ্ছন্নে যেতে হবে এর কোনো মানে আছে? আমি তো ভাবতেই পারি না, কেন—'

কথার মাঝখানে খিলখিল ক'রে উচ্ছৃঙ্খল হাসি হেসে ওঠে বনলতা। —'আমিও আগে ওইরকম অনেক কিছু ভাবতেই পারতাম না। ধর, এক বছর আগে তুই-ই কি ভাবতে পারতিস্, স্বামীর সংসার ছেড়ে, মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে একটা থিয়েটারের অভিনেত্রীর বাড়ী প'ড়ে থাকবি? ঘটনাচক্র, বুঝলি, সবই ঘটনাচক্র।'

না, নিজের দৃষ্টিতে নিজের স্বরূপ ধরা পড়ে না, তাই মানুষ অসতর্ক উক্তি ক'রে বসে, নির্বোধের মতো কথা বলে। শুধু যদি সহসা অপরের দৃষ্টি-দর্পণে আপনাকে দেখে ফেলে, তখন স্তব্ধ হয়ে যায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেমন আজ স্তব্ধ হয়ে গেলো মঞ্জরী।

প্রথমদিনের সেই প্রচণ্ড অন্তর্দাহ, দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের প্রলেপে কবে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো, অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো এই অদ্ভুত জীবনে, এটা এতোদিনে এমন স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়েনি।

❀ ❀ ❀

ঠিক সেই সময় ঠিক এমনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো অভিমন্যু।

ঘরে নয়, বারান্দায় নয়, পার্কের বেঞ্চে নয়, কলিকাতার কোথাও নয়। বসেছিলো হরিদ্বারের এক নির্জন সীমায়।

এখানে ব'সে গঙ্গা দর্শন হয় না। এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাহাড়ের সানুদেশে, খানিকটা উপড়ে গেলে বুঝি অবহেলিত একটা মন্দির আছে, সেখানে উঠবার একটা লুপ্তপ্রায় সিঁড়িও আছে, এটা তারই চত্বর।

যাত্রীরা এখানে কদাচিৎ আসে। দৈবাৎ কোনো উদারহৃদয় যাত্রী, যারা সর্বজীবে সমভাবের নীতি অনুসরণে স্নানান্তে পথমধ্যবর্তী বিগ্রহ নির্বিশেষে হাতের কমণ্ডলুর জলটুকু ছিটোতে-ছিটোতে পথ চলে, তারাই একবার ঊর্ধ্বপানে দৃষ্টি হেনে এই ভাঙাচোরা সিঁড়ি ক'টা অতিক্রম করে, এক গণ্ডুষ জল দিয়ে যায় এই মন্দির-বিগ্রহের তৃষ্ণার্ত গাত্রে। বাকী সময় নিস্তব্ধ-নির্জন।

নীচে খানিকটা দূরের হর-কী-প্যারী ঘাটে, কী কলকোলাহল! কী জনসমাবেশ? কে বলবে তারই এতো কাছাকাছি এ'রকম অদ্ভুত জনহীন একটা জায়গা আছে। ব'সে থাকতে-থাকতে বুঝি বিস্মৃত হয়ে যেতে হয়, কোথায় আছি! যেন পৃথিবী-ছড়ানো কোনো একটা অনৈসর্গিত স্তব্ধতা! অথচ মাত্র কয়েক মিনিটের পথ নেমে গেলেই শহর-জীবনের প্রচণ্ড প্রাচুর্য। টাঙ্গাওয়ালাদের চীৎকার অজস্র রিক্শা-গাড়ীর অবিরাম ঠুনঠুনি, অসংখ্য দোকানপাট—তার সামনে অগাধ ক্রেতা আর অকথ্য ভিখারীর ভীড় এবং অগণিত পুণ্যার্থীর অবিরাম স্তোত্রপাঠ শুনি!

সব মিলিয়ে একটা দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তি! তারই মাঝখানে রয়েছেন পূর্ণিমা। অভিমন্যু এসেছে এই নির্জন পর্বতগাত্রে। এই তীর্থ। এইজন্যই তীর্থমাহাত্ম্য! এই অপূর্ব আশ্রয়ের আশাতেই কর্মপিষ্ট ক্লান্ত, মানুষেরা মাঝে-মাঝে কর্মপাশ কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তির আশায় ছুটে আসে তীর্থের পথে। ছুটে আসে উৎসাহী আনন্দকর্মীরা, আসে উদাসীন বৈরাগীরা। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাও তো তীর্থে এসো।

নিজেকে খুঁজে পেতে চাও তো তীর্থে এসো!

কে জানে অভিমন্যু কেন এসেছে!

নিজেকে হারাতে, না নিজেকে খুঁজে পেতে?

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এসেছে পূর্ণিমার তীব্র প্ররোচনায়। লোক-লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পালিয়ে এসেছেন পূর্ণিমা।

ঘরের বৌ যার দিবা দ্বিপ্রহরে সর্বসমক্ষে কুলত্যাগ ক'রে চলে যায়, তার মুখ লুকোবার জায়গা আর কোথায় আছে—কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ ছাড়া? বলেছেন, এখান থেকে যাবেন কেদার-বদরীর পথে।

পূর্ণিমা ঘোরেন মন্দিরে-মন্দিরে, ঘাটে-ঘাটে, সাধুসন্তদের আশ্রমে। অভিমন্যু পালিয়ে বেড়ায় পরিত্যক্ত বিগ্রহের নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে।

এই হতভাগা বিগ্রহমূর্তির মধ্যেই কি লুকানো আছে তার সান্ত্বনা?

'মার্ভেলাস!'

দু'তিন দিন কারোর দেখা মেলেনি। আজ হঠাৎ একটি বাঙালী যুবকের আবির্ভাব ঘটলো, এক অভিনব পরিবেশ। কমণ্ডলু হাতে নয়, সিগারেটের টিন হাতে। পরনে ভিজে ধুতি নয়, পাটভাঙা সুট।

'মার্ভেলাস!'

অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত এই মন্তব্যটুকু ক'রে ফেলেই অভিমন্যুর প্রতি চোখ প'ড়ে যায় ছোকরার, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে একটু নমস্কার-গোছের ক'রে বলে, 'মাপ করবেন, দেখতে পাইনি। আপনার শান্তির বিঘ্ন ঘটালাম, দুঃখিত।'

অভিমন্যুও অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে সচকিত হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সেও হাত জোড় ক'রে বলে' 'কী আশ্চর্য! এ'রকম বলছেন কেন? আমি এই বেড়াতে-বেড়াতে একটু এসে পড়েছিলাম।'

'আমিও তাই। অবশ্য তার উপর আরও একটু বাড়তি স্বার্থ আছে, জায়গাটা দেখে ভারী ভালো লাগছে।'

ছোকরার মুখে-চোখে আনন্দ আর কৌতুকের উজ্জ্বলতা।

তার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটার প্রতি এবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় অভিমন্যুর। ওঃ, তাই এই পরিত্যক্ত ভূমিতে এঁর আবির্ভাব।

ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে নামাতে ছোকরা বলে, 'বেশ বসেছিলেন আপনি, আপনার ফিগারটিও চমৎকার! কথা ক'য়ে মাটি ক'রে ফেললাম। দিব্যি একখানা ছবি বাগিয়ে নিতাম, আর অ্যালবামে সেঁটে ক্যাপশন লাগাতাম, 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

'তার মানে?'—প্রায় বিদ্যুতাহতের মতো চমকে তীব্র প্রশ্ন করে অভিমন্যু 'আপনার একথার মানে?'

ছোকরা বোধকরি ঠিক এভাবে প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে, 'গভীর কোনো মানেপূর্ণ কথা আমি বলিনি, এমনি

আপনার বসবার ভাবটা বেশ বিরহী দেখাচ্ছিলো, তাই ব'লে ফেললাম। কোনো অপরাধ ক'রে ফেলে থাকি তো ক্ষমা করবেন।'

ছোক্‌রার সন্দেহ হয়, এ লোকটা বোধকরি সদ্য বিপত্নীক। এবার লজ্জার পালা অভিমন্যুর। ফিরতি ক্ষমাপ্রার্থনা সেও করে। এবং দু'চারটি বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমেই যেন বন্ধুত্ব বন্ধন ঘটে যায় ছোকরার সঙ্গে। অবিবাহিত তরুণ যুবক!

অভিমন্যুর চাইতে বোধকরি বেশ খানিকটা ছোট। নাম সুরেশ্বর।

পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য, তবে তার নিজস্ব ভাষায়, 'সেটা হচ্ছে গৌণ! বাপ-ঠাকুরদার চালিয়ে দেওয়া গাড়ী, তার উপর চেপে ব'সে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। প্রধান পেশা ফটো তোলা। বাপের পয়সা থাকলে কতো রকম বদখেয়ালীই তো আশ্রয় ক'রে, এ তো মন্দের ভালো। কি বলেন?'

দিনের পর মাস কাটে, মাসের পর বছর। মহাকালের অক্ষয়মালা হতে আর-একটি অক্ষ খ'সে পড়ে, বৃদ্ধা পৃথিবী আর একটু বৃদ্ধা হয়। মানুষের জীবনের জটিলতা আর একটু বাড়ে। সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে, নৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবনে জটিলতা শুধু বেড়েই চলেছে। বাড়ছে শিক্ষার উৎকর্ষ, বাড়ছে জীবনযাত্রার উপকরণ আর সঙ্গে বাড়ছে অসহায়তা!

কবে কোন্ যুগে মানুষ আজকের মতো অসহায় ছিলো? আজকের মানুষের ধরবার কোন খুঁটি নেই। বিজ্ঞান আর সভ্যতা তাকে ভীমবেগে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। কে জানে স্বর্গে—কি রসাতলে!

এই তর্ক চলে কেদার-বদরীর পথে অভিমন্যু আর সুরেশ্বরের মধ্যে।

শুধু মাকে নিয়ে তীর্থের পথে-পথে ঘুরতে অভিমন্যুর মধ্যে যে ভারাক্রান্ত জড়তা এসে গিয়েছিলো, তিলে-তিলে মনের যে মৃত্যু ঘটেছিলো, সুরেশ্বর তার হাত থেকে যেন অভিমন্যুকে বাঁচাতে এসেছে। জীবনকে আবার বুঝি দেখতে পায় অভিমন্যু। এই নীরস্ দীর্ঘ পথ সরস হয়ে উঠে দুই অসমবয়সী বন্ধুর তর্কে-গল্পে কৌতুক-হাস্যে।

অভিমন্যু বুঝি ভুলেই গেছে, সে কতো হতভাগ্য, সমাজে তার ঠাঁই কোথায়। ভুলে গেছে আবার তাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে, মুখ দেখাতে হবে পরিচিত সমাজে।

কর্মস্থলে? সেখান থেকে তো অব্যাহিত নিয়েই এসেছে সে।

সুরেশ্বর বলে—সে মানস-কৈলাস পর্যন্ত ধাওয়া করবে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে।

অদ্ভুত সখ। সখের জন্য কী কৃচ্ছ্রসাধন, কী বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

সুরেশ্বর হাসে আর বলে, 'বাড়ীতে কি কম গালাগাল খেয়েছি ? আসবার আগে মা তো সাতদিন কথা বলেনি, মুখ দেখেনি।'

'তবু তুমি—'

'তা আর কি করা যাবে বলুন ? কথাতেই আছে, 'এ রোষ রবে না চিরদিন।' সখ বড়ো দুর্দান্ত নেশা অভিমন্যুদা। ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে ব'সে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু করা যাবে কি ? আপনার মতো দেবতা-মানব আর ক'জন থাকে বলুন ?'

'হঠাৎ আমাকে আবার এ অপবাদ কেন ?'

'নয় কেন ? দেখেছি তো আপনাকে এতোদিন ধ'রে এপর্যন্ত আপনার মধ্যে মনুষ্যোচিত কোনো গুণ দেখতে পেলাম না। না সখ, না নেশা। পত্নী-বিয়োগ হয়েছে, মলিন বদনে জননীর পদাঙ্কনুসরণ ক'রে তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন! হুঁঃ, আমি হ'লে—সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি পত্নী সংগ্রহ ক'রে হনিমুনে বেরিয়ে পড়তাম। ভোজ খেতাম, সিগারেট খেতাম, শিকার করতাম, ফটো তুলতাম, তা-নয়—ধ্যেৎ!'

পত্নী-বিয়োগের সংবাদটা পূর্ণিমাদেবীর পরিকল্পিত! শুনে প্রথমটা অভিমন্যু শিউরে উঠেছিলো, তারপর নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে। অভিমন্যু মৃদু হেসে বলে, 'একটিই সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারলে না, আবার দ্বিতীয়!'

'মনের মতো পাচ্ছি না অভিমন্যুদা! এই আটাশ বছর ধ'রে পৃথিবীতে চরছি, আজ পর্যন্ত এমন মেয়ে চোখে পড়্‌লো না, যাকে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে হারাতে-হারাতে আর পেতে-পেতে আসছি।'

'তুমি ভারী ফাজিল।'

'ধ'রে ফেলেছেন দেখছি।' সুরেশ্বরের নির্মল উদাড় হাসির স্বরে নির্জন পার্বত্য পথ সচকিত হয়ে ওঠে।

অনেকটা পিছন থেকে পূর্ণিমা মালা জপতে-জপতে আর হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে আসতে-আসতে চেঁচান, 'তোরা কি আমায় ফেলে এগিয়ে যাবি নাকি ? অতো লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছিস্ কেন ?'

তারপর মনে-মনে, দাঁতে-দাঁত পিষে বলেন, 'বেশ ছিলাম দু'টি মায়ে-পোয়ে, এই শনি যে কোথা থেকে এসে জুটলো! কী কপাল আমার।'

ওদিকে অভিমন্যু মনে-মনে ভাবে, 'আঃ, মা যদি না থাকতেন। অনায়াসে আমিও যেতাম মানস-কৈলাসের পথে। মা এক বাধা!'

সুরেশ্বরের অন্য চিন্তা। প্রচুর ফিল্‌ম এনেছে বটে, কিন্তু তবু—কুলোবে তো ? আর কোথাও সংগ্রহ করতে পারা সম্ভব ? শুনেছে, বদরীনারায়ণের মন্দিরের কাছে নাকি দিব্যি দোকান-পাট, শহর-বাজার গজিয়ে উঠেছে

আজকাল। জিনিসটা মিলবে না সেখানে ?

'আচ্ছা অভিমন্যুদা, আপনি লেখক-টেখক নন তো ?'

'সে-কি ? কেন ?'

'এমনি জেনে নিলাম, তাহ'লে নির্ভয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে। লেখক-গুলো কী মিথ্যুক দেখছেন ?'

'অর্থাৎ ?'

'এই দেখুন, এই যে চলেছি মহাপ্রস্থানের পথে—তা একটাও এমন সাহসী বিদুষী সুন্দরী তরুণী আপনার চোখে পড়লো যে নভেলের নায়িকা হবার উপযুক্ত ? এক টুকরোও না! এমন কি অলৌকিক শক্তিধারী কোনো সাধু এসেও অকস্মাৎ দর্শন দিলো না। ওসব হয় না। সব বাজে বানানো কথা!'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা সাহিত্য তো বানানো কথারই বেসাতি।'

'ওটা ভুল। কাহিনীটা বানানো হোক্ ঠিক আছে। কিন্তু কী ঘটে, তা তোমার জানা নেই।'

'তার মানে, আপনার জানা আছে।'

'কেন, আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে নাকি ?'

'হ্যাঁ! আপনাকে আবিষ্কার না ক'রে ছাড়বো না ভাবছি। নিশ্চয়ই আপনি কোনো ঘটনাচক্রে প'ড়ে—'

পূর্ণিমাদেবী কাছে এসে পড়েছেন। শ্রমপাংশু মুখ! কাঁপা-কাঁপা বুক। রোষকষায়িত দৃষ্টি! বলেন, 'তুই আমার সঙ্গে এমন করবি জানলে আমি এখানে আসতাম না অভি! হাওয়ার মতন ছুটে এগোচ্ছিস, জ্ঞান নেই যে বুড়ি মা পেছনে প'ড়ে ? উঃ, কী কষ্টই না দিচ্ছো ভগবান!'

অভিমন্যু ম্লান অপ্রতিভ মুখে মা'কে ধরে। কিন্তু বেপরোয়া সুরেশ্বর দিব্যি হাস্যবদনে ব'লে ওঠে, তা মাসীমা, 'আপনি ডাণ্ডি চড়বেন না, কাণ্ডি চড়বেন না, এখন কষ্ট হচ্ছে বললে চলবে কেন ? আপনারাই তো বলেন, কষ্ট না করলে কেষ্টপ্রাপ্তি ঘটে না!'

'তুমি থামো তো বাছা!' বিরক্ত-বিরস মুখে আবার হাঁটা সুরু করেন পূর্ণিমা বিড়বিড় করতে-করতে। বৌ যদি ঘাড় থেকে নামলো তো কোথা থেকে এক বন্ধু এসে ঘাড়ে চাপলো। শনি-শনি! নেমে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি বাবা, কেদারে আবার মানুষে আসে!'

❋ ❋ ❋

আসে বৈকি! হাজার-হাজার বছর ধরে তো এসেই চলেছে মানুষ! দুর্গম পথের প্রতি দুরন্ত আকর্ষণই যে মানুষের মূল প্রকৃতি। হাজার-হাজার বছর ধ'রে কোটি-কোটি লোক আসছে-যাচ্ছে। যখন পথ ছিলো মারাত্মক ভয়ঙ্কর

সভ্যতার অবদান পৌঁছোয়নি এতো দূর অবধি, তখন ফেরার আশা না রেখেই আসতো, এখন সুগম পথ ধ'রে সহজে স্বচ্ছন্দে আসছে, ফিরে যাচ্ছে।

অভিমন্যুও ফিরলো একদিন। আর ফিরে ষ্টেশনে নেমেই দেখলো সারা কলকাতা যেন তার দিকে তীব্র ব্যঙ্গ দৃষ্টি হেনে নির্লজ্জ হাসি হাসছে।

এ-কী কুৎসিত! এ-কী জঘন্য! এ-কি শক্তিশেল! অভিমন্যু কেন ফিরে এলো।

মঞ্জরী লাহিড়ী। মঞ্জরী লাহিড়ী। সমস্ত কলকাতা শহর মঞ্জরী লাহিড়ী নামের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ব'সে আছে। শহরের সমস্ত পথে-পথে স্মিতাননা মঞ্জরী লাহিড়ী সহস্র পথিকের দিকে কটাক্ষ হেনে মোহন হাসি হাসছে। এই কিছুদিন আগেও যে মঞ্জরী ছিলো প্রফেসর অভিমন্যু লাহিড়ীর স্ত্রী!

বিরাট 'হেডিং' লাগিয়েছে হাওড়া ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের কাছে। মুটেকে পয়সা চুকিয়ে দিতে-দিতে কথাটা কানে এলো।···

'কী মনকাড়া হাসিটা হাসছে মাইরি, দেখেছিস্? শালা মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে একেবারে! তুই দেখে নিস্ মাইরি, এ ছুঁড়িই এবার 'শোভারাণী', 'শ্যামলী সেনের' অন্ন মারবে নির্ঘাত।'

একঝলক কটুগন্ধ বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলো ছোকরা দু'টো! কিন্তু হাতে রিভলভার থাকলেই কি ওদের পাঁজরায় গুলী করতে পারতো? লাঠি থাকলে কী বসিয়ে দিতে পারতো ওদের মাথায়?

পারতো না! অভিমন্যু যে ভদ্রলোক। যাদের ভয় কেলেঙ্কারীকে।

সমাজের পিছনদিকের অন্ধকার গলিতে যাদের ঘোরাফেরা, তারাও ওই কথাই বলে। স্টুডিওর সাজঘরে উপবিষ্ট-উন্মত্তদৃষ্টি-আরক্তমুখ মঞ্জরীকে এক হিতৈষী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, 'চেপে যান মিসেস লাহিড়ী, চেপে যান। ও নিয়ে আর হৈ-চৈ করবেন না! করতে গেলে লাভ কিছুই হবে না, শুধু লোক জানা-জানি আর আড়ালে হাসাহাসি। আপনি চেঁচামেচি করলে বড়োজোর ডিরেক্টর মজুমদার লোক-দেখানো একটু ধমক দেবে আনন্দ-কুমারকে। তাতে আপনার ইজ্জত কিছু বাড়বে না। এসব জায়গায় ওটুকু কেউ কর্তব্যই করে না। এ লাইনে এসেছেন যখন, ক্রমশই দেখতে পাবেন অনেক কিছুই!'

অতএব হৈ-চৈ করা চলবে না। তাতে শুধু কেলেঙ্কারী! এ লাইনে যখন এসেছো, তখন এখানের দস্তুরও শেখো! শেখো কিল খেয়ে কিলচুরি করতে। নইলে শুধু লোক হাসাহাসি। হাতের কাছে ছুরি থাকলে কি নিজের এই নিটোল মসৃণ গালের খানিকটা মাংস খুব্‌লে কেটে উড়িয়ে দিতো

মঞ্জরী? একডেলা আঙরা থাকলে চেপে ধরতো প্রচণ্ড জ্বালা-করা ওই জায়গাটায়? যাতে বিষে বিষক্ষয় হতে পারতো!

নাঃ! থাকলেও কিছুই করতে পারতো না মঞ্জরী। কারণ আর দশ মিনিট পরেই অন্য এক স্টুডিওতে যেতে হবে, আর এক ডিরেক্টরের কাছে, যাঁর একসঙ্গে চারখানা বইয়ের কনট্রাক্ট নিয়েছে মঞ্জরী।

কেলেঙ্কারী ক'রে সব কিছু পঙ্গু করবার সাহস তার নেই। সাহস তো সবদিকেই গেছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মেয়ের এই মহিমা দেখানো হাস্যকর ছাড়া আর কি? দেখাবেই বা কার কাছে? যারা ওটুকুকে ধর্তব্যই করে না তাদের কাছে? অতএব ছেড়ে দাও ওটুকু শুচিবাই। ছেড়ে দাও নিজেকে ছোটবেলার 'শ্লিপে' চড়ার খেলার মতো। ভাগ্যের এই মসৃণ আর ঢালু ফলকটার ডগায় ব'সে শুধু হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নামিয়ে দাও নিজেকে।

অবিশ্যি নামার হিসেবের সঙ্গে সঙ্গে ওঠারও একটা হিসেব থাকে বৈকি! জগতের সকল ক্ষেত্রেই যে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার! একদিক নামলেই অপর একদিক উঠবে! পাল্লার অপর দিক উঠছে! সর্বত্র উঠছে ছবি আর নাম, পত্রিকায়-পত্রিকায় উঠছে পরিচিতি আর জীবনী! তরুণ-তরুণীর অটোগ্রাফ খাতার পাতায় উঠছে স্বাক্ষর। জ্বরবিকার রোগীকে দেওয়া থার্মোমিটারের তপ্ত পারার মতো ব্যালেন্সের অঙ্ক উঠছে লাফিয়ে-লাফিয়ে। এতো ওঠার চাপেও একটু-আধটু নামার গ্লানিটা ফিকে মেরে যায় বৈকি!

* * *

এখন আর বনলতার ফ্ল্যাটে থাকা মানায় না, নিজেকে আর তার মধ্যে ধরানো যায় না, আলাদা একটা ফ্ল্যাট নিতে হয়েছে মঞ্জরীকে।

বনলতার ফ্ল্যাটের চাইতে দামী আর বড়ো!

মঞ্জরীর স্বরুচি আর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করছে তার ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা। টাকাই শক্তি, টাকাই সাহস, টাকাই উপায়, টাকাই অভিভাবক। বনলতার ঝি মালতি মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসে-আর ফিরে গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'আঙুর ফুলে কলাগাছ।'

বনলতাও আসে কখনো-কখনো, মাঝে-মাঝে। নিমন্ত্রণে ডাকে মঞ্জরী। ও মুখ বাঁকায় না, শুধু একটু-একটু হাসে। হাসে মঞ্জরীর তীব্র লালরঙে ছোপানো ওষ্ঠাধর দেখে, হাসে মঞ্জরীর রঙীন এনামেল-করা ছুঁচলো-আগা লম্বা-লম্বা নখ দেখে, হাসে মঞ্জরীর সোনার চিরুণী বসিয়ে জোড়াবেণীর করবী রচনা দেখে, হাসে মঞ্জরীর শালীনতাহীন আধুনিক পরণ-পরিচ্ছেদ দেখে। এসবে নাকি ভারী ঘৃণা ছিল মঞ্জরীর।

তবু বনলতা ওকে ভালবাসে। মাঝে-মাঝে উপদেশ দেয়, 'একসঙ্গে এতগুলো কন্ট্রাক্ট করিস্ কেন? তাড়াতাড়ি সস্তা হয়ে যাবি।'

মঞ্জরী মনে-মনে মুচকি হেসে ভাবে, 'আহা, দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল।' কিন্তু মুখে অমায়িক হাসি হেসে বলে, 'কি করবো লতাদি, দেশসুদ্ধু ডিরেক্টর যে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে, আমায় না নামাতে পারলে তারা ছবিই করা ছেড়ে দেবে! কী কাড়াকাড়ি, যদি ছাখো।'

বনলতা মৃদু হেসে বলে, 'দেখতে হবে না, কিছু-কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তবু এইজন্যেই বলি, তোর স্বাস্থ্যটা তো খুব মজবুত না, এতো খাটলে পাছে ভেঙে পড়ে, তাই বলছি।'

'ভেঙে পড়লে মরে যাবো—' মঞ্জরী উদাসস্বরে বলে, 'এ পৃথিবীতে তাতে কার কি এসে যাবে লতাদি?'

'ওরে সর্বনাশ!' বনলতা চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, 'বাংলা দেশের ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাইয়ের সর্বস্ব লোকসান! মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়বে সবাই। তুই যে কী বস্তু, তুই নিজেই এখনো টের পেয়েছিস কী?'

মঞ্জরী এ পরিহাসে হাসে। বলে, 'টের পাইয়ে ছাড়ছে! ছাখো না বম্বের এক অফার নিয়ে দেবেশ মল্লিক কী লাগাই লেগেছে আমার পিছনে! আমি এখনো মনস্থির করতে পারছি না।'

'বম্বে?' বনলতা হেসে বলে, 'বম্বে গিয়ে এমন কিছুই সুনাম হয় না।'

'সুনাম হয় না, সুদর্শনচক্র তো হয়?' মঞ্জরী সাটিনের কুশে, কনুই ঠেসিয়ে দেহ ভেঙে-ভেঙে হাসতে থাকে।

হ্যাঁ, এ রকম হাসি আজকাল হাসতে শিখেছে মঞ্জরী!

'আরো বেশী টাকার কী দরকার তোর?'

'টাকার কী দরকার? তুমি হাসালে লতাদি! এ প্রশ্ন তো তুমি নিজেকেও করতে পারো?'

বনলতা গম্ভীরভাবে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমার তফাৎ আছে মঞ্জু!' আমাকে মদ খেতে হয়, আমাকে প্রায়ই দু'চারটে জন্তু পুষতে হয়, আমাকে দেশের বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হয়।'

'দেশের বাড়ীতে টাকা!' প্রথম কৈফিয়ৎ দু'টো ঘৃণাভরে শুনেছিলো, শেষের কথাটার চমকে সোজা হয়ে বসে মঞ্জরী।

'তোমার দেশ আছে?'

'তা এ প্রশ্ন করতে পারিস্ বটে! আমাদের দেখলে ভুঁইফোঁড় বলেই মনে হয়। তাই না?'

'না-না, তা বলছি না। মানে, দেশের বাড়ীতে কেউ আছে?'

'আছে বৈকি।'

'কে আছে?'

'সবাই। মা-বাপ-ভাই-বোন।'

মঞ্জরী স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে বলে, 'তারা তোমার টাকা নেয়?'

'আগে নিতো না, নেবার কথা ভাবতেই পারতো না! আমিই লুকিয়ে দেশে গিয়ে ভাজের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা ক'রে হাতে-পায়ে ধ'রে রাজী করিয়ে—'

'কেন?' মঞ্জরী সহসা উদ্ধতভাবে সোজা হয়ে ব'সে বলে, 'কেন, এতো হাতে-পায়ে পড়া কেন?'

বনলতা ম্লান হাসি হেসে বলে, 'বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ভাই পাগল!'

'ওঃ! তার মানে, নিতান্ত নিরুপায় বলেই তাঁরা দয়া ক'রে তোমার টাকাটি নিয়ে কৃতার্থ করছেন তোমাকে, এই তো? নইলে বাঁ পায়ের কোড়ে আঙুলেও ছুঁতেন না অবশ্যই।'

'সে তো নিশ্চয়ই—' আরো বিষণ্ণ হাসি হাসে বনলতা।

'তবু তা'দের দুঃখে তোমার মায়া আসে?'

'আসে তো!'

'ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো?'

বনলতা হেসে ফেলে ওর উষ্মা দেখে। হেসে বলে, মিথ্যে নয়, 'বদনামটা সত্যি।'

'হুঁ! কিন্তু সব কলঙ্ক তাহ'লে টাকায় চাপা পড়ে?'

'তা কি আর পড়ে মঞ্জু? তা পড়ে না। কিন্তু অভাব জিনিসটা বড়ো সর্বনাশী! সকলের আগে পেট! তার পরে মর্যাদার প্রশ্ন।'

'হুঁ! কিন্তু হাত পেতে যারা তোমার টাকা নিয়ে পেট ভরাচ্ছে, এখনো তো তারা তোমাকে বাড়ীর উঠোনে ঢুকতে দেবে না?'

'ঢুকতে দেবে না!' সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা দেখা দিলো বনলতার রক্তমাখা ঠোঁটের কোণে। বললো 'তা দেবে, দেয়ও।'

'তুমি যাও নাকি সেখানে?' মঞ্জরীর চোখে অবিশ্বাসের বিস্ময়।

'মাঝে-মাঝে! প্রায় দৈবাৎই! যদি 'কোনদিন একটু বেশী অবসর থাকে—খুব দূরে তো নয়! বড়ো জোর মাইল তিরিশ।'

'তারা তোমার মুখ ছাখে? তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

বনলতা যেমনি মৃদু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, 'শুধু কথা বলে? কোথায় বসাবে, কি ক'রে মান রাখবে, তা ভেবেই দিশেহারা হয়ে যায়।'

'আশ্চর্য; টাকা এমনই জিনিস তাহ'লে?'

'না, ঠিক টাকাই নয় মঞ্জু! প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আসল জিনিস। ওরা গরীব ব'লে ভাবছো শুধু টাকার জন্যই—তা নয়! বড়োলোক হলেও করতো। যে কোন বিষয়েই হোক, খানিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারো, যারা একদিন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে তারাই কথা বলতে গেলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। আমার ছেলেবেলার সই, যে আমার প্রথম বয়সে আমার দুর্মতির সংকল্প শুনে বলেছিলো—আমি মরে গেলে হরিরলুট দেবে, সে আমার কাছে পাস নিয়ে বক্সে ব'সে থিয়েটার ছ্যাখে, তিনকুলের গুষ্টিকে ডেকে এনে দেখায়।'

'আর তুমি ধন্য হয়ে তার জোগান দাও।'

বনলতা ওর রাগ দেখে হেসে উঠে বলে, 'তা মানুষের কোনোখানে তো একটু দুর্বলতা থাকবেই।'

মিনিটখানেক গুম্ হয়ে থেকে মঞ্জরী ব'লে ওঠে, 'বম্বে আমাকে যেতেই হবে।'

'হঠাৎ সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলো না কি?'

'হ্যাঁ তাই! আমার যশ চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, আর টাকাও চাই। অনেক টাকা···অজস্র টাকা...'

বনলতা মুচকে হেসে বলে, 'কেন? ত্যাগ,ক'রে-আসা স্বামীকে কি টাকা দিয়ে কিনবি নাকি?'

'সেই চেষ্টাই করে দেখবো।'

❋ ❋ ❋

'কী লজ্জা! কী লজ্জা!' বড়ো-জা আর মেজ-জা একসঙ্গে মিলিত হয়ে লজ্জায় মরে গিয়ে বলে, 'শেষপর্যন্ত বম্বেতেও? এর পরে আর বাকী কি থাকবে? তবু এতদিন মনে করতাম, জেদ ক'রে একটা ছেলেমানুষী করে ফেলেছে, হয়তো পরে ভুল বুঝতে পারবে, আর যে আমাদের গ'লে যাওয়া দ্যাওর হয়তো বা ফের ঘরেই নেবে, সে আশা নির্মূল হলো।'

কথার স্বর শুনে বোঝা যায় না, কোন্‌টা কাম্য ছিলো এঁদের।

'উঃ, সাহস বটে!' ওরা যেন অবাক হয়ে-হয়েও কুলকিনারা পাচ্ছে না, 'থাকতো কেমন শান্ত-সভ্য মতন, কে জানতো ভেতরে এতো বড়ো বুকের পাটা!'

'তবু যাহোক দেশের মধ্যে ছিলো, এরপর আর! ছি-ছি! বিনা অভিভাবকে বম্বে চলে গেলে আর রইলো কি?'

'আছেই বা কি? মেজ-জা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ে, ঘরের বাইরে এক রাত কাটালেই জাত যায়, আর সে কিনা এই দু'টো

বছর কাটিয়ে দিলো! তাও কোন্ লাইনে? শুনতে পাই নাকি আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে লোকজন রেখে রামরাজত্ব করেছে, গাড়ীও কিনেছে নাকি! না কিনবেই বা কেন, ছ'হাতে রোজগার তো করছে!'

'আশ্চর্য! বিশ্বাস হতে চায় না যেন! সেই আমাদের ছোটবৌ।'

'অবিশ্বাসের আবার কি আছে?' মেজ-জা আর একবার মাথা ঝাঁকানি দেন, 'এই লাখে-লাখে কোটিতে-কোটিতে খারাপ মেয়েমানুষ, সকলেই কিছু আর খারাপ হয়ে আকাশ থেকে পড়েনি! তারাও মা-বাপের সন্তান ছিলো, ছিলো স্বামীর স্ত্রী, হয়তো ছেলেমেয়ের মা!'

'উঃ, আমাদের ঘরে এমন হবে কে কবে ভেবেছিলো! যে আমরা অসুবিধেয় প'ড়ে আলাদা হয়ে এসেছি, এতেই কত নিন্দে হয়েছে আমাদের, ওই ছোট ঠাকুরপোই তা নিয়ে যতো ঠাট্টা-তামাসা করেছে, আর এখন?'

'বেশী শাস্তি হয়েছে ভাসুরদের! উনি তো বলেন, ,চেনা পরিচিত লোকের সঙ্গে পথে বেরোতে হ'লে চোখ তুলে চাইতে পারিনে, মাথা হেঁট ক'রে পথ চলি।"

'দেখতে-দেখতে নামটাও ক'রে ফেললো বাবা! নামতে না নামতেই স্টার! হেন ছবি নেই যাতে নাই ওর নাম।'

'কী ছলা-কলা! কী বেহায়াপনা! দেখতে ব'সে মাথা হেঁট হয়ে যায়! ন'টার শো ভিন্ন যাই না, পাছে কেউ দেখে ফেলে।'

'তুই তো তবু যাস্, আমার ওপর তোর ভাসুরের কড়া নিষেধ।'

'আহা, সে নিষেধ কি আর আমার ওপর নেই? শুনি না। কৌতুহলের জ্বালায় মরি যে!'

'আচ্ছা, ছোট ঠাকুরপো দ্যাখে ব'লে মনে হয় তোর?'

ঈশ্বর জানেন। দ্যাখে কি আর? দেখতে কি পারে? যতোই হোক ওর বুকের জ্বালা আলাদা। নিজের বিয়ে-করা স্ত্রী অপর পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে প্রেমের পার্ট করছে, সহ্য করা কি সোজা?'

ছোট-নন্দাই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে হাসে আর ক্ষ্যাপায়, 'যাই বলো, তোমার ব্রাদারটি একটু ভুল ক'রে ফেললো। ওই গিন্নীটিকে অতো উড়তে না দিয়ে বাড়ীতে আট্‌কে রাখতে পারতো তো, ইহজীবনে তাকে আর খেটে খেতো না! দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে—তিনতলা বাড়ী, গাড়ী, লোকলস্কর, মান-মর্যাদা—'

'মান-মর্যাদা?'—তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ওঠে শ্রোত্রীর কণ্ঠ থেকে।

'আহা, তা-নয়ই বা কেন? মঞ্জরী লাহিড়ীকে নিয়ে আজ চারদিক থেকে কাড়াকাড়ি কতো! বম্বে থেকে সাধছে—'

ছোট ননদ উদাসগম্ভীর মন্তব্য করে, 'বলো যা প্রাণ চায়, বলে নাও! বলবার দিন পেয়েছো যখন!'

বড়ো ননদের কড়া ব্যবস্থা।

সেখানে অলিখিত শাসনে বড়ো থেকে ছোটটি পর্যন্ত মঞ্জরী সম্বন্ধে একেবারে নীরব। মঞ্জরীর নাম উচ্চারিত হয় না সে বাড়ীতে। সিনেমা দেখার মতো জবনের একটা শ্রেষ্ঠ আনন্দ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের।

* * *

সুনীতি হাজারীবাগ থেকে ফিরে এসেছে অনেকদিন। ননদের মাথার দিব্যি দেওয়া যত্নে অতিরিক্ত ঘি-দুধ আর আতপ চাল খেয়ে-খেয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক থপ্‌থপে মোটা হয়ে গেছে সে। স্থবির হয়ে গেছে অদ্ভুতভাবে। শুধু মঞ্জরী সম্বন্ধে কেন, পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধেই যেন তার আর কোনো চেতনা নেই। কিছুই যেন এসে যান না তার—মঞ্জরী থাকুক আর উচ্ছন্নে যাক্‌। বড়ো মেয়ে কমলা একদিন সসঙ্কোচে দুঃখ প্রকাশ করেছিলো—'তখন যদি আমরা ছোটমাসীকে এখানে রাখতাম মা, তাহ'লে হয়তো ছোট-মাসী এভাবে—'

সুনীতি ক্লান্তস্বরে বলেছিলো—'নিয়তিতে যাকে টানে, তাকে ধরে রাখবে কে কমলা?'

ছোট মেয়ে চঞ্চলা প্রথম দু'একদিন খবরের কাগজের খোলা পাতা ধ'রে সাগ্রহে দেখাতে এসেছিলো ছোটমাসীর নাম ও ছবি।

বোঝা যায় না মঞ্জরীর জন্যে, তার মধ্যে আর একতিলক সহানুভূতি অবশিষ্ট আছে কিনা। কে জানে, হয়তো নেই! যদি কষ্টে পড়তো মঞ্জরী। খেতে পেতো না. তাহ'লে হয়তো সুনীতি তার কলঙ্ক ক্ষমা করতো, সস্নেহে কাছে টেনে নিতো। কিন্তু মঞ্জরী যে কলঙ্কের মূল্য আহরণ ক'রে নিচ্ছে যশ-অর্থ-প্রতিষ্ঠা-স্বাচ্ছন্দ্য। আর কী প্রয়োজন আছে ওর দিকে চাইবার? ওর ভিতরের স্নেহ-কাঙালিনীকে ফিরে দেখবার গরজ কার হবে? সে কাঙালিনীকে বিশ্বাস করবে কে? যার টাকা আছে, তার আবার প্রয়োজনের কি আছে? না, তার জন্যে কারো হৃদয়ে মমতার দরজা খোলা থাকে না? এখন তার জন্যে যদি কিছু মজুত থাকে, সে ইচ্ছে ঘৃণা।

মঞ্জরী মুছে গেছে সুনীতির মন থেকে! খানিকটা মুছে নিয়েছিলো ওর দুঃসাহস, বাকীটা মুছে নিয়েছে ওর সাফল্য।

শুধু কিশোরী চঞ্চলা মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ব'সে-ব'সে ভাবে। লুকিয়ে চঞ্চলা একটা সংগ্রহশালা খুলেছে। কাগজে, পোষ্টারে, প্রোগ্রাম বইতে,

সিনেমা পত্রিকায় সেখানে যতো ছবি দেখতে পায় মঞ্জরীর, সব কেটে-কেটে জমা করে সেই গোপন ভাণ্ডারে। নানা-মূর্তি, নানা ভঙ্গি, নানা-রূপ! নিঃসঙ্গ কোনো দুপুরে সেইগুলো বার ক'রে বিছিয়ে বসে আর দেখে চঞ্চলা। দেখে আর ভাবে।

পত্রিকার মলাটে এই যে মুখ, যার মুখে দুরন্ত এক চপল হাসি, চোখে চটুল কটাক্ষ, গ্রীবায় অপূর্ব ভঙ্গি, যে মুখ দেখলে বুকের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে, সারা শরীরে ভয়-ভয় করে, এ-কি সত্যিই তাদের সেই ছোটমাসী? ছেলেবেলায় যে তাদের খেলার মধ্যে দলপতির অংশ গ্রহণ ক'রে হৈ-হৈ করেছে, যে পরম উদারতায় অক্লেশে নিজের ভাগের চকোলেট্‌-লজেঞ্জস্‌ আর নিজের গলায় পাথরের মালা, কাঁচপুঁতির মালা বোনঝিদের দান করেছে, এই সেদিনও যে তাদের সঙ্গে একত্রে খেয়েছে-শুয়েছে আর গল্প করেছে! এ-কী সত্যি সেই?

আবার এই যে কাগজের পৃষ্ঠায়? বিষাদপ্রতিমা বিধবা নারী!

যার চোখের তারায় আকাশের অসীম শূন্যতা, যার ঠোঁটে রেখায় অসহায় বেদনার গভীর ব্যঞ্জনা। এও কি তাদের ছোটমাসী?

কোন্‌টা সত্যি তবে? কোন্‌ রূপটা ওর যথার্থ রূপ?

ভাবতে-ভাবতে মনটা যেন ভারী হয়ে ওঠে চঞ্চলার—হঠাৎ চোখের কোণে-কোণে জমে ওঠে জলের রেখা। এক-একসময় ভারী ইচ্ছে হয় ছোট-মাসীকে একবার দেখতে! দেখবে—ছোটমাসী তাকে চিনতে পারে কিনা, তার সঙ্গে কথা বলে কি না।

কিন্তু কোথায় সে উপায়? আবার নাকি শোনা যাচ্ছে—কলকাতা থেকে চলে যাবে বোম্বাই। কে জানে সেই অজানা জনারণ্যে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে কিনা ছোটমাসী।

* * *

কোনো-কোনো রাত্রে, যে রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না মঞ্জরীর বিছানায় শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, সে রাত্রের চোখের তারায় আকাশের অসীম শূন্যতা, আর ঠোঁটের কোণায় অসহায় বেদনার গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে মঞ্জরী জানালার ধারে ব'সে-ব'সে ভাবে যে সমস্ত পৃথিবী থেকে সে বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,—কালের পরিচিত জগৎ থেকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—সেটা ভুল ক'রে ভাবে। তার পরিচিত জগতের প্রত্যেকের মনে সে বেঁচে আছে।

কিন্তু বেঁচে আছে 'জ্বালা' হয়ে! অপমানে জ্বালা হয়ে, অভিমানের জ্বালা হয়ে, বিস্ময়ের জ্বালা হয়ে, ঈর্ষার জ্বালা হয়ে।

দিনেরবেলায় মনের চেহারা আলাদা। দিনেরবেলায় কিছুই এসে যায় না মঞ্জরীর—কে তাকে মনে রাখলো আর কে না রাখলো। তখন শুধু এগিয়ে চলা, আরো এগিয়ে চলা। জয়ের পথে, যশের পথে, প্রতি মুহূর্তে পান করা চাই নতুন-নতুন উত্তেজনার কড়া মদ। নিজেকে ধ্বংস ক'রে, ছিন্নবিছিন্ন ক'রে খণ্ড-খণ্ড ক'রে বিকশিত করতে হবে!

এই তো চেয়েছিলা সে! ললিত-লাবণ্যে নিজেকে বিকশিত করতে। এই কি চেয়েছিলো মঞ্জরী?

চেয়েছিলো বইকি! বুঝে না—বুঝে হাত দিলেও আগুন কি তার স্বধর্ম ছাড়ে? অবোধ ব'লে কি ক্ষমা করে?

রঙিন কাঁচের গ্লাসের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে মঞ্জরী হাত বাড়িয়ে বিষের পাত্র নিয়ে চুমুক দিয়েছে। তা তাতে বিষের দাহ সুরু হবে না?

তারপর? তারপর তো মৃত্যু আছেই।

আজ ছুটি। আজ সুটিং নেই। অনেক কষ্টে আর অনেক অঙ্ক ক'ষে এই ছুটিটুকু বার করা।

বাড়ীতে আজ কিছু অতিথি সমাগমের আয়োজন করেছে মঞ্জরী।

হ্যাঁ। নিজের বাড়ীতে এ'রকম একটা পার্টি দেবার সাহস মঞ্জরীর হয়েছে। টাকা মানেই তো সাহস। নিমন্ত্রিতেরা এখনো কেউ এসে পৌঁছয় নি! ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে প্রসাধন পর্ব সারছিলো মঞ্জরী। নিজেকে কতো মনোহারিণী ক'রে তোলা যায়, এ বোধকরি তারই সাধনা। পরেছে সমুদ্রের ঢেউ-রঙ মিহি সিল্কের শাড়ী, মিহি অদ্ভুত রকমের মিহি, প্রায় জলের মতোই স্বচ্ছ, শুধু চোখ-জ্বলা ঝক-ঝকে চওড়া রূপোলী জরীর ভারী পাড়টা ভারসাম্য বজায় রেখে শাড়ীটাকে দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে রাখতে সাহায্য করছে।

মঞ্জরী কি আগে কখনো কল্পনা করতে পারতো, সাতপাটেও স্বচ্ছতা হারায় না এমন শাড়ী প'রে অক্লেশে ঘুরে বেড়াতে পারবে সে?

অথচ সহজেই পারছে এখন। এই সাগরনীল শাড়ীটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরেছে একটা সিঁদুর লাল ব্লাউজ, হাতে দু'টো মোটা-মোটা ঢলঢলে বালা, গলায় শুধু একটা চওড়া চিক্। আজ আর সোনার চিরুনী গাঁথা খোঁপা নয়। আজ সাদা সিল্কের চওড়া ফিতে দিয়ে শুধু একটু আলগা গোড়া বেঁধে রাখা এলো চুল, পায়ে জরীর চটি।

মাজা-ঘষা গালে আর একবার আলতো ক'রে একটু পাউডার বুলিয়ে নিলো, গাঢ় লালরঙে ছোপানো ঠোঁটে আর একটু টাট্‌কা লালের আভাস, চোখের কোলে-কোলে সুর্মার টানটা নিখুঁত আছে কিনা, দেখে আর একবার।

এবার মনোহারিণী নয়, মনোমোহিনী।

মঞ্জরীর গায়ের রং যে কোনদিনই ফর্সা ছিলো না, ছিলো শ্যামলা-শ্যামলা, সে আর এখন ধরবার উপায় নেই। প্রসাধন শেষ ক'রে বসবার ঘরে যাবার আগে মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠলো মঞ্জরীর। বোম্বাই তারকাদের কাছে কি রূপে সে হার মানবে? ইস্!

কিন্তু আশ্চর্য! মুখের মৃদু দাম্ভিক হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সহসা একটা ক্লান্তির ছায়া নামলো। স্খলিত পায়ে এঘরে এসে একটা সোফায় ব'সে পড়লো মঞ্জরী। আশ্চর্য!

তার পুরনো জগৎটা কি সত্যিই এ শহর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? নইলে কোনো সূত্রে এক মুহূর্তের জন্যও কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? সম্ভব-অসম্ভব কতো জায়গাতেই কতো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় মানুষের। শুধু মঞ্জরীর ভাগ্যই কি আলাদা বিধাতার তৈরি?

এতো তাড়াতাড়ি পয়সা হতে না হতে গাড়ী কেনবার দরকার কি ছিলো মঞ্জরীর? কেনা তো শুধু এতোটুকু অবসর মিললেই ড্রাইভারটাকে পথে-পথে ঘুরিয়ে মারার জন্যে!

অথচ যে পাড়ায় গেলে নিশ্চিন্ত কারো দেখা মিলবে, সেখানে যেতে সাহস হয় না। শুধু আশে-পাশে, এখানে-সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য।

মঞ্জরীর পুরনো পরিচিতের জগৎটা যেন এ শহর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মঞ্জরীই বা এতো বোকামী করে কেন?

কতোদিন অনেক রাত্রে গাড়ী বার করতে বলে অভিসারিকার রোমাঞ্চ নিয়ে প্রস্তুত হয়, নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করে—দ্বিধা সঙ্কোচ না রেখে বিশেষ একটা রাস্তায় যাবার নির্দেশ করবে। দেখবে আজও দোতলার সেই ঘরটায় অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে কি না, দেখবে জানলার সেই অনেক যত্নে তৈরী ছুঁচের-কাজ-করা পর্দাগুলো এখনো আছে কি না, দেখবে ঘুমের আগে একবার মিনিট দু'য়েকের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কি না একজন।

অনেক রাত্রে গাড়ী একখানা যদি কোনো একটা বাড়ীর আশেপাশে দু'চারবার ঘুরেই মরে, কে লক্ষ্য করতে যাচ্ছে।

সবকিছু ভেবে সাহস ক'রে গাড়ী বার করতে বলে, কিন্তু পথে বেরিয়েই কী এক সর্বনাশা ভয়ে সমস্ত মন শিথিল হয়ে আসে, বুক চিপ্-ঢিপ্ করে, ঠিক-ঠিকানা আর বলা হয় না। শুধু এলোমেলোভাবে একটু ঘুরে আসার নির্দেশ দিতে তবে বুকের পাথর নামে। নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে বুক ভ'রে বাতাস

কিছুতেই কোনদিন কোনো জানা রাস্তার নাম উচ্চারণ করতে পারে না মঞ্জরী ড্রাইভারের সামনে।

তবু প্রতিদিনই সকাল থেকে মনের এক নিভৃততম কোণে ক্ষীণ একটু আশার সুর বাজে। প্রতিদিনই মনে হয় 'আজ নিশ্চয়ই।'

বনলতার দাসী মালতি মনিবানীর পিছনে এসেও আগে প্রশ্ন করে, 'কি গো নতুনদিদিমণি, আপনার বাড়ীতে আজ আবার কিসের ঘটা?'

মঞ্জরী ললিতহাসি হেসে বলে, 'নিজেই নিজের ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি।'

বসলো ওরা। বনলতা বললো, 'ওখানে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

'কে নিচ্ছে?'

মঞ্জরী বম্বের একটা বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা কোম্পানীর নাম করলে।

'কতোদিনের জন্য?'

'আপাততঃ একবছর। তারপর—তারপর হয়তো আর কখনো এখানে ফিরবোই না!'

'বাংলাকে কাণা ক'রে জন্মের মতো চলে যাবার খেয়াল হলো।'

মঞ্জরীর সুর্মাটানা আঁখিপল্লব ঈষৎ কেঁপে ওঠে, উদাসভাবে বলে, 'এখানে আমাকে কে আর চায় লতাদি?'

বনলতা কিছু বলবার আগেই অদূরে দণ্ডায়মান মালতি কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, 'ওমা! কি কথা বলো গো নতুনদিদিমণি! আপনাকে তো এখন সবাই চাইছে।'

বনলতা ওর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'আচ্ছা, আপাততঃ তোমাকে কেউ চাইছে না। বাইরে গিয়ে বসতে পারো।'

অপমানের রাঙামুখ নিয়ে ঝনাৎ ক'রে বেরিয়ে যায় মালতি।

'আর কে-কে আসবে?'—বললো বনলতা।

'বেশী কেউ না। শ্যামল সেন, দেবেশ মল্লিক, রেবা দাস, নিশীথ রায় ও আনন্দকুমার—'

বনলতা বাধা দিয়ে বাঁকা কটাক্ষ হানলো, 'তাকেও?'

'বললাম।' মঞ্জরী উদাসভাবে বলে, 'যাবার বেলা বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।'

বনলতা হীরের আংটি ঝলসানো চাঁপারকলি আঙুলে কপালে-উড়ে-পড়া চুলগুলো আলতো ছোঁয়ায় সরিয়ে দিয়ে বলে, 'এ-তো সে যাত্রা নয়, এ যে একেবারে সর্বনাশের আকর্ষণে যাত্রা।'

'সর্বনাশের মাঝখানেই তো বাসা বেঁধেছি!'

'তবু এখানে তোমাকে রক্ষা করছে তোমার জন্মকালের বন্ধন, আজন্মের সংস্কার, সেখানে স্রোতের শ্যাওলা।'

আস্তে করে একটু হাসলো মঞ্জরী—'পদ্ম হয়ে ফুটতে যে না পারলো, শ্যাওলা হয়ে ভাসাই তো তার পরিণতি।'

বনলতা মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে বললো, 'তোর মনে আছে, আমায় একদিন বলেছিলি, 'ইচ্ছে করলেই তুমি ভালো হতে পারো লতাদি।' আছে মনে?'

হঠাৎ পেন্ট-পাউডার-রুজ সব-কিছু ছাপিয়ে জেগে ওঠে একটা পাংশু মলিনতা, ভারী করুণ দেখায় সে মুখ, কিন্তু সে সামান্যক্ষণের জন্যই! সেই পাংশু হয়ে যাওয়া মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ওঠে মঞ্জরী, বেখাপ্ পা-বেয়াড়া হাসি। হাসতে-হাসতে লাল হয়ে বলে, 'মনে আছে বৈকি, খুব আছে। সেই প্রশ্ন আবার তুমি বুঝি আমাকে করবে?'

'তাই ভাবছি।'

'কিন্তু তার উত্তর তো তুমি নিজেই সেদিন দিয়েছিলে লতাদি।'

'দিয়েছিলাম। তবু ভেবেছিলাম, তুই বুঝি তার ব্যতিক্রম হবি! তুই বুঝি আলাদা ধাতু দিয়ে তৈরী হবি।'

হাসি থামিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে গম্ভীর হয়ে বললো মঞ্জরী, 'সৃষ্টিকর্তার ভাঁড়ারে মাত্র দু'টোই ধাতু আছে লতাদি! তারতম্য যা কিছু নক্সায় আবার পালিশে। সব মেয়েমানুষ এক ধাতুতে তৈরী, সব পুরুষই এক ধাতুতে।

বনলতা কি বলতে যাচ্ছিলো, সিঁড়িতে শব্দ উঠলো। উদ্দাম পদক্ষেপ, তার সঙ্গে নারী ও পুরুষ-কণ্ঠের সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনি। এসে গেছে।

* * *

জীবনে যতো বিরাট পরিবর্তনই আসুক, তবু আস্তে-আস্তে নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে মানুষ। দৈনন্দিন কর্ম্মচক্রের ঘূর্ণিপাকে সে পরিবর্তন সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্থির থাকতে পারে না, খণ্ড-খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় অচেতন মনের খাঁজে-খাঁজে। তীব্র জ্বালা, অসহনীয় যন্ত্রণা, সবই ক্রমশঃ অনুভূতির জগৎ থেকে ধূসর হয়ে-হয়ে আসে। পোড়খাওয়া-মোচড়খাওয়া মানুষও আবার হাসে, গল্প করে, খায়, বেড়ায়। কিন্তু অভিমন্যু ক্রমশঃই স্থির হ'তে থাকে।

অবশ্য অস্থিরতার বাহ্যিক প্রকাশ কোনদিনই ছিলো না তার।

কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিলো, সেও পূর্ণিমার জ্বালাতনে।

অধ্যাপনার কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলো ছাত্রীমহলে অপদস্থ হবার ভয়ে।

কেদার-বদরী থেকে ঘুরে এসে একটা সংবাদপত্রের অফিসে কাজ জোগাড় ক'রে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জীবনটাকে।

নিঃসঙ্গ জননীকে সঙ্গ দিতে বোনেরা আজকাল ঘন-ঘন আসেন, তাদের সঙ্গে বাইরে থেকে অন্ততঃ স্বাভাবিকভাবেই গল্প করে অভিমন্যু, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের নিয়ে খুনসুটি আর খেলা—তাও করে বৈকি। শুধু একটু যেন স্তিমিত, একটু যেন নিস্প্রাণ। রাস্তার দেওয়ালের পোষ্টার, কাগজের অরুচিকর বিজ্ঞাপন, এসব আর যেমন-তেমন ক'রে চাবুক ম'রে না, চোখের উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। এমনি সময়ে একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা হলো, সে কথা পরে বলছি।

ফেরার সময় গাড়ীতে উঠে মালতি ভুরু কোঁচকালো। বললো, 'সবাই তো যে যার জায়গায় চলে গেলো দিদি, ওই আপনাদের নিশীথ রায়টা এখনো ব'সে রইলো। কেন বলো তো ?'

এ প্রশ্ন বনলতার মনেও তোলপাড় করছিলো। নিশীথ রায়ের মতলবটা যেন আজ ভালো নয়। আর মঞ্জরীও যেন দেখাতে চাইছে 'ছাখো আমার কত সাহস ?' কী ভাবছে ও ? আগুন নিয়ে খেলা করবে ? না-কি চরম সর্বনাশের আগুনে আহুতি দিতে চায় নিজেকে ?

নিশীথ রায়ের চোখে আজ সেই সর্বনাশের আগুন দেখতে পেয়েছে বনলতা। কিন্তু বনলতার করবার কি আছে ? ও তো মঞ্জরীর গার্জেন নয় যে, জোর ক'রে তার সর্বনাশের দরজা আটকে ধরবে ?

মঞ্জরী যে আর আগের মতো নেই, সে অবশ্য স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কেউ থাকে না। জড়োসড়ো মুখচোরা ছ'দিনে বেহায়া হয়ে ওঠে, বাচাল হয়ে ওঠে। কিন্তু মঞ্জরী কি একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলতে বাধবে না ওর ?

বনলতার এতোদিনের ধারণা কি তবে ভুল ?

গাড়ী চলতে থাকে। মালতি আর একবার নড়ে চড়ে ব'সে বলে, 'আমার কিন্তু আজ নতুনদিদিমণির জন্যে ভাবনা হচ্ছে। যতোই হোক, ভদ্দরঘরের বৌ, এ পর্যন্ত আর যাই করুক—'

'উচ্ছন্নে যাক্!' বনলতা চরম বিরক্তিকর স্বরে ব'লে ওঠে, 'জাহান্নামে যাক্। তুই চুপ করবি ?'

যাকে নিয়ে এতো ভাবনা মালতির, সত্যিই সে তখনো মঞ্জরীর বসবার ঘরে রেশমী কুশনে ঠেস দিয়ে ব'সে পরম আলস্যভরে ধূমকুণ্ডলীর সৃষ্টি করছিলো। উঠবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বনলতা যতক্ষণ ছিলো, দর্পিতা বিজয়িনীর রূপে হাসিতে আর কথায় সকলের মন হরণ করেছিলো মঞ্জরী। বনলতা চলে যেতেই হঠাৎ কেমন

'ফ্যাকাসে' মেরে গেলো, চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'সবাই চলে গেলো, আপনি এখনো ব'সে কেন?'

এ প্রশ্ন কোনো ভদ্রলোককে সহসা করা যায় না। আবার করলে হয়তো উত্তরটাই আতঙ্ক আর আশঙ্কাকে মুহূর্তে স্পষ্ট ক'রে তুলবে। ভয়কে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখতে যাবার সাহস কার আছে? ভয়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করাই মানুষের স্বধর্ম।

* * *

'প্লীজ্, এক মিনিট—'লীলায়িত ভঙ্গিটা বজায় রেখেই মঞ্জরী উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় হাতজোড় ক'রে বলে, 'আমার লোকজনদের খাওয়া হ'লো কিনা দেখে আসি—'

নিশীথ রায় ভঙ্গীর অসলতা ত্যাগ ক'রে উঠে ব'সে ব'লে, লোকজনদের? মানে, চাকর-বাকরদের?'

'হুঁ।'

'এই তুচ্ছ কাজটার জন্যে আপনি?'

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি একে তুচ্ছ ভাবি না মিষ্টার রায়।'

'ভালো-ভালো! সর্বজীবে সমভাব! আচ্ছা, আসুন আপনার মহৎ কর্তব্য সেরে, আমি অপেক্ষা করবো।'

অপেক্ষা! কিসের অপেক্ষা! ঘড়ির দিকে চোখটা গেল অজ্ঞাতসারে। বুকটা কেঁপে উঠে মঞ্জরীর। উজ্জ্বল আলোর নীচে মুখটা অসম্ভব পাণ্ডুর দেখায়! কপালে ঘাম ফুটে ওঠে।

কিন্তু বুক-কাঁপানো মারাত্মক ভয়ই বোধকরি সাহসের জন্মদাতা। ভয়ের মধ্যে থেকে সাহস সঞ্চয় ক'রে নেয় মঞ্জরী। কিসের ভয়? মঞ্জরী তো রাস্তায় প'ড়ে নেই? এটা তার নিজের বাড়ী, তার হুকুমের অপেক্ষায় অবহিত হয়ে আছে তিন-তিনটে চাকর-দাসী! কোমলগঠন মুখের নমনীয় রেখার তলায়-তলায় কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

'অপেক্ষা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?'

'প্রয়োজন?' নিশীথ রায় মুচকি হাসে, 'ভয়ানক প্রয়োজন।'

'ধূর্ত শিয়াল' কথাটা বরাবর শুনে এসেছে মঞ্জরী, কখনো চোখে দেখেনি! আজ এক মুহূর্তে যেন কথাটার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর কাছে! নিশীথ রায়ের ক্ষৌরমসৃণ সুগঠন মুখের মোলায়েম খোঁজে-খাঁজে সেই অর্থের ব্যাখ্যা।

আমি তো কোন প্রয়োজন দেখছি না।' গম্ভীর ভাবে বললো মঞ্জরী।

'প্রয়োজনটা আমার।' বলে আবার শৃগাল-হাসি হাসে নিশীথ রায়।

'আমি তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আপনার যদি বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে ব'লে নিন, এক মিনিট সময় দিচ্ছি।'

'বক্তব্য? আমার বক্তব্য তো এক মিনিট শেষ হবার নয় মঞ্জরীদেবী?' নিশীথ রায় আরামের আলস্য ভঙ্গি ক'রে ফের কুশনে গা ডুবিয়ে বলে, 'সারারাত সময় পেলে হয়তো কতকটা—

'সুধীর!' তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মতো চীৎকার ক'রে ওঠে মঞ্জরী।

'আহা-হা' অতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'—বলে নিশীথ রায় আবার সোজা হয়ে বসে।

সুধীর এসে দরজায় দাঁড়ালো। আধবুড়ো গোছের একটু গ্রাম্য প্যার্টার্নের লোকটা। বললে, মা, ডাকছেন?'

পরক্ষণেই ধূর্ত শিয়ালের মুখ থেকে আদেশবাণী উচ্চারিত হয়, 'হ্যাঁ' এক গ্লাস জল আনো তো।'

একজোড়া ঘোলাটে গ্রাম্য-চোখে দু'টো আগুনের ফিন্‌কি জ্ব'লে উঠে ফের নিভলো। নিঃশব্দে আদেশ পালন করতে দাঁড়ালো সে।

'জল নয়; শোনো, দাঁড়াও!' মঞ্জরীর স্বর হিংস্র স্বর! 'শোনো, বাবু যাচ্ছেন, একে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।'

সুধীরের মুখ দেখে মনে হলো সে যেন এইমাত্র ঈশ্বরের দৈববাণীতে বড়োভয় পেয়েছে। বললে, 'চলুন বাবু!'

সিগারেটের টিনটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিশীথ রায়। তার চোখেও হিংস্র জানোয়ারের উদ্যত আক্রমণের দৃষ্টি। কিন্তু কথার স্বর তার আশ্চর্য রকমের শান্ত আর আবো আশ্চর্য ঠোঁটের ভঙ্গিতে সকরুণ একটি বিষাদ। বলে—'দু' মিনিটের জন্যে তুমি একটু বাইরে যাও সুধীর, তোমার মায়ের সঙ্গে আমার দু' একটা কথা আছে।

বলাবাহুল্য, সুধীর গেলো না। মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বললো, 'না, আমার সঙ্গে আপনার কোনো কথা নেই।'

'কী মুস্কিল! সামান্য কারণে আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মঞ্জরীদেবী? আপনি তো বড়ো নার্ভাস? দু' একটা কথা অন্ততঃ বলতে দিন আমায়?'

লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যায় মঞ্জরী। আর থতমত খেয়ে যায় ওর ঠোঁটের গম্ভীর বিষণ্ণ ভঙ্গিটি দেখে! ভুলে যায় লোকটা একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। মনে হয়—দু'একটা কথা শুনলে আর এমন কি ক্ষতি! সত্যি, এমন আর কি অপরাধ করেছে, একটা অসতর্ক উক্তি উচ্চারণ ক'রে ফেলা ছাড়া?

'কি বলবেন বলুন।'

চোখের ইঙ্গিতে সুধীরকে বাইরে যাবার আদেশ দিয়ে আবার কৌচে ব'সে পড়ে মঞ্জরী। জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে চলে যায় সুধীর।

মাইনেটার যে অস্বাভাবিক স্ফীত সংখ্যার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তাকে। নইলে এসব জায়গায় কি সুধীরের মতো লোকের পোষায়? মেয়েমানুষের বাচালতা দেখলেই যার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে!

'বলুন কী আপনার বলবার আছে?'

'আমার বক্তব্য কী আপনি বুঝতে পারছেন না মঞ্জরীদেবী! আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি, এই আমার বক্তব্য।

মঞ্জরীকে ভাগ্যান্বষণে অনেক দূর যেতে হবে।

মঞ্জরীকে নিজের সমস্ত দায় বহন করতে হবে। মঞ্জরীর নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বিচলিত হয়ে উঠে পড়লে মঞ্জরীর চলবে না।

মনে-মনে এই রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মঞ্জরী শান্ত-সংযত স্বরে বলে, 'এটা স্টুডিও নয় নিশীথবাবু।'

'সারা পৃথিবীটাই তো স্টুডিও মঞ্জরীদেবী!'

'ওটা খুব নতুন কথা নয়। আশা করি আপনার বক্তব্য শেষ।'

'আপনি বড়ো নিষ্ঠুর মঞ্জরীদেবী' মুখের চেহারায় বিষাদ-বিষণ্ণতার অতি করুণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে নিশীথ রায় বলে, 'আপনি নিজের প্রতিও নিষ্ঠুরতা করছেন, অপরের প্রতিও—'

'কি করা যাবে বলুন, সকলের ভিতরে সমান দয়া থাকে না।'

'কিন্তু এ-যে আপনার আত্ম-পীড়ন মঞ্জরীদেবী—'

'বিচলিত হবো না' এ কথা ভাবা সহজ, কাজে করা বড়ো শক্ত।

বহু কষ্টে সংযত থেকে মঞ্জরী উত্তর দেয় 'আমার ব্যাপার আপনি একটু কম ভাবলেই আমি সুখী হবো নিশীথবাবু!'

'না ভেবে আমার উপাই নেই মঞ্জরীদেবী। প্রতিনিয়ত শুধু আপনার চিন্তাই যে আমাকে জখম ক'রে ফেলেছে। কেন আপনি অকারণে নিজেকে উপবাসী রেখে বঞ্চিত হচ্ছেন? সমাজ আপনাকে কি দিয়েছে? অকারণ অপমান আর অন্যায়-অবিচার এছাড়া আর কিছু? বলুন মঞ্জরীদেবী, কেউ আপনার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে? আপনার হিষ্ট্রী আমি সব জানি। আপনি তেজী মেয়ে, মিথ্যা অপবাদের লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন! কই, আপনার সমাজ কি অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে? তবে? সে সমাজের পরোয়া কেন করবেন আপনি? বলুন? জবাব দিন আমায়?'

ক্রুদ্ধ সর্পিনীকে যেন ঔষধিলতার ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে, ক্রমশঃই তেজ হারিয়ে ফেলেছে সর্পিনী। যে দৃঢ়তায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছিলো—'সুধীর, বাবু বাইরে যাবেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—সে দৃঢ়তা কোথাও যেন আর খুঁজে পাচ্ছে না মঞ্জরী। মুখের রং ক্রমশঃ সাদাটে হয়ে আসছে যেন, বুকের মধ্যে দুপ্-দাপ্ শব্দের মিছিল। মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ ক'রে শুধু বাজছে কয়েকটা শব্দ। শব্দ নয়,এতোটুকু বাক্যাংশ···

'সমাজ আপনাকে কী দিয়েছে? সমাজ আপনাকে কী দিয়েছে? অকারণ অপমান আর অন্যায়-অবিচার, এই তো?···এই তো? আপনার সমাজ কি অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলো? ··'

পাকা খেলোয়াড়েরা জানে খেলার কোথায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়, আর কোথায় ঔদাসীন্য দেখাতে হয়, তাই নিশীথ রায় আরো বিষণ্নমুখে আরো উদাস করুণ সুরে বলে, 'আপনি আমাকে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারেন মঞ্জরীদেবী, মাথা হেঁট করে চলে যাবো আমি। কিন্তু মনে রাখবেন, নিতান্ত খারাপ লোকেরাও কখনো-কখনো সত্যিকারের ভালবেসে ফেলতে পারে। তার সারা জীবনের ইতিহস দিয়ে বিচার করতে গেলে তাকে বড্ডো বেশী অবিচার করা হয়।'

ভয় বরং ভালো তাতে চীৎকার করা যায়, চাকর-দারোয়ান ডাকা যায়। বিপন্নতা আরো ভয়ঙ্কর। এখানে মানুষ আরো অসহায়।

অসহায় বিপন্নমুখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী। সাপুড়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে মন্ত্রাহত বিপন্ন মুখের দিকে তাকায় নিশীথ রায়। আবার বলতে সুরু করে, 'জানি আপনি পবিত্র, আপনি বলিষ্ঠচিত্ত, আমি দুর্বল। কারণ আমি রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই আমার দুর্বলতাকে আমি আমি দেবচরিত্র নই, কিন্তু ভালোবাসা যে কী বস্তু, সেও যে এর আগে এমন ক'রে অনুভব করিনি?

মঞ্জরী চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় শুকনো মুখে বলে, 'আমি আপনার কি উপকার করতে পারি বলুন?'

'উপকার!' নিশীথ রায় সেই বিষ-বিধুর হাসি হেসে বলে, 'না মঞ্জরীদেবী, এর উত্তর আপনার সামনে দেবার সাহস আমার নেই। আমি বিদায় হচ্ছি। আপনাকে অন্যায় খানিকটা বিরক্তি করলাম, যদি পারেন তো মার্জনা করবেন। আপনি অনেক দূর চলে যাচ্ছেন, তবু হয়তো—কর্মক্ষেত্রে আমাদের আবার কখনো দেখা হবে, কিন্তু অতিথির সমাদর যে আর কোনদিন পাবো না, তা-জানি। আচ্ছা নমস্কার!'

মঞ্জরী বিমূঢ়ভাবে দুই হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলে, 'কিন্তু আমি তো আপনাকে আসতে বারণ করিনি।'

'করেননি, সে আপনার মহত্ব, কিন্তু আমি তো জানি সে অধিকার আমি হারিয়ে গেলাম। তবু বিদায় নেবার সময় ব'লে যাচ্ছি মঞ্জরীদেবী নিজেকে একবার প্রশ্ন ক'রে দেখবেন, কেন এই কৃচ্ছ্রসাধন? কি কেউ বিশ্বাস করবে? কিসের মূল্য? আপনার এই কৃচ্ছ্রসাধন কি কেউ বিশ্বাস করবে? মাথা খুঁড়ে ফেললেও বিশ্বাস করবে?'

ধীরে-ধীরে নেমে যায় নিশীথ রায়। নেমে গিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে শিস্ দিয়ে ওঠে। কৌচের পিঠটা ধ'রে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জরী। আর ঘরের সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যেন নিশীথ রায়ের শেষ কথাটা ধাক্কা দিয়ে ফেরে।

'কেউ কি বিশ্বাস করবে! মাথা খুঁড়ে ফেললেও বিশ্বাস করবে?...

কিন্তু কেবলমাত্র অপরের বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকতে পারা ছাড়া পবিত্রতার কোনো মূল্য নেই?

সমাজ-শাসন ছাড়া আর কোথাও কোনো শাসন নেই।

* * *

"দ্বারকা যাবেন অভিমন্যুদা?' হুড়মুড়িয়ে এসে বিনা ভূমিকায় হুড়মুড়িয়েই প্রশ্ন করে উঠলো সুরেশ্বর। বললে, 'যাবেন তো চলুন!'

অভিমন্যু তো অবাকের-অবাক! বললে, 'তুমি হঠাৎ কোথা থেকে হে? মানসকৈলাস থেকে ফিরলে কবে? আমার বাড়ী চিনলে কি ক'রে? আবার এখুনি দ্বারকা যাবে, মানে কি?'

'থামুন-থামুন? একে একে।...হঠাৎ কোথা থেকে? আপাততঃ অধমের ব্যারাকপুরের বাসভবন থেকে! ..মানসকৈলাস থেকে ফিরলাম কবে? প্রায় মাস পাঁচ-ছয়। কালস্রোতের জলস্রোতের মতোই অহরহ অভিমন্যুদা! ...আপনার বাড়ী চিনলাম কি ক'রে? ঠিকানার জোরে। যদিও আপনার ভৃত্য মহাপ্রভু আমাকে প্রায় ভাগাচ্ছিলো!'

'ভাগাচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ-গো! বলে কিনা বাবুর শরীর ভাল নয়, মেলা পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না।'

'হুঁ, খুব সর্দার হয়েছে দেখছি।'

'তারপর? যাচ্ছেন তো?'

'যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি?'

'বাঃ বললাম যে? দ্বারকা-পুণা-নাসিক-বম্বে—'

'দু'দিন বুঝি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারো না? ভিতরে কি আছে? ঘূর্ণমান চক্র?'

'বোধহয়। সত্যি অভিমন্যুদা, ছ'মাস কোথাও না বেরোলেই যেন মনে হয়, বাতে সারা শরীর ধরে যাচ্ছে।'

'সমুদ্র-পাড়ির ব্যাপার বুঝি মিটিয়ে ফেলেছো? অবশ্য সমুদ্রপাড়ি, অথবা আকাশ-পাড়ি—'

'নাঃ, সে আর বেশীদূর এগোলো কই? মাত্র জাপান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম। মাতৃভূমিতেই এক জায়গায় দু'চারবার হচ্ছে।'

'পাগল নাম্বার ওয়ান।'

'তা যা বলেন। তারপর—মাসীমার খবর কি?'

'ভালোই আছেন!'

'কোথায়? দোতালায়। চলুন না দ্বারকার নাম শুনিয়ে আসি।'

'রক্ষে দাও সুরেশ্বর, মাকে আর উৎসাহিত করো না।'

'না করলে আপনাকে তো টেনে বার করা যাবে?'

'আমার কথা পরে বিবেচ্য।'

বিবেচনা মধ্যে আমি নেই, একেবারে পাকা কথা চাই। সত্যি অভিমন্যুদা, গতবার থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি, পরবর্তী অভিযানে আপনাকে পাকড়াবোই।'

অভিমন্যু সকৌতুকে বলে, 'কেন বলো তো?'

'ওই তো কে বলে? কি যেন কথা আছে না, যার সঙ্গে যার মজে না। তার আর কি। তাহ'লে কথা পাকা তো?'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'কবে যাবে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানলাম না, পাকা কথা আদায় করতে চাও?'

'আহা, সে সব ঠিকই জানতে পারবেন। যাবার আগের দিন পর্যন্ত রোজ একবার ক'রে এসে হানা দেবো। কই, মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করি চলুন?'

'চলো। কিন্তু এসব যাওয়ার কথা কিছু তুলো না, দোহাই তোমার। যদি সত্যিই আবার কোথাও বেরোই, একাই বেরোবো।'

'আর মাসীমা? তিনি কোথায় থাকবেন?'

'তাঁর থাকার অভাব কিছু নেই হে। এই অধম জীবটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা অকৃতী সন্তান। আরো দুই বিজ্ঞ বিচক্ষণ পুত্র আছেন তাঁর, তাঁদের সুরম্য অট্টালিকা, সুদৃশ্য মোটর, ইত্যাদি-ইত্যাদি। কন্যা আছেন সর্বসাকুল্যে চারটি—'

'তাই নাকি?' সুরেশ্বর সকৌতুকে বলে, 'এসব তো কই কোনোদিন বলেননি? আমি তো জানি আপনিই সবেধন নীলমণি।'

সহসা চুপ ক'রে যায় অভিমন্যু। সে তো জানে পূর্ণিমাদেবী কেন পরিচয়-

পরিচিতির দিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর ওর চুপ ক'রে যাওয়ার প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে বলে, 'আপনি বড়ো বেশী রিজার্ভ অভিমন্যুদা। নিজের সম্পর্কে আপনি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে রাজী নন।'

অভিমন্যু ফ্যাকাশে-হাসি হেসে বলে 'বুদ্ধিমানদের লক্ষণই তাই।'

'ওর ফাঁকে নিজের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলেন ?'

ব'লে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে সুরেশ্বর।

আশ্চর্য এই ছেলেটা! আর আশ্চর্য তার ক্ষমতা। অভিমন্যুর সমস্ত ওজর-আপত্তি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে সত্যি একদিন তাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো দ্বারকার পথে। পূর্ণিমাদেবী অভিমানে দ্বিরুক্তি করেননি, নিজের জিনিসত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন মেজছেলের কাছে। কিন্তু অভিমন্যুর যেন এতেও কোনো আক্ষেপ নেই।

সুরেশ্বরের ওপর হাড়ে চটে গেলেও এই প্রথম যেন স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করলেন পূর্ণিমাদেবী, ছেলের এবং তার মাঝখানে বধূরূপী ব্যবধান-প্রাচীরটি দূরে স'রে গিয়ে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান যেন আরো বেড়েই গেছে। লক্ষ যোজনব্যাপী এ ব্যবধান কোনদিনই আর নিকট হবে না। এই প্রথম সন্দেহ ক'রে শিউরে উঠলেন তিনি। অভিমন্যু হয়তো বা তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়ের হাহাকার নিয়ে এর জন্য মা'কেই অনেকাংশে দায়ী করছে। নিশ্চয়ই করছে!

পূর্ণিমা যদি পুত্রবধূকে অমন ক্ষমাহীন-কঠোর বিচারকের দৃষ্টিতে না দেখতেন, হয়তো পুত্রবধূও এমনভাবে যেত না। অভিমন্যুও এমন নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো না। আর পূর্ণিমাকেও বিড়ালছানা নাড়ানাড়ির মতো নিত্যি এখানে একবার, ওখানে একবার আসন গাড়তে হতো না।

সেকালে যে নিয়ম ছিলো—'শেষ বয়সে তীর্থবাস' ভালো নিয়ম ছিলো। তাতে শেষ বয়সে নিজেকে এমন অবান্তর মনে হতো না।

'ঘূর্ণমান চক্র।'

কথাটা ঠিকই বলেছে অভিমন্যু! আপন প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির সুরেশ্বর অভিমন্যুকে এতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে চায় যে, হাঁপিয়ে ওঠে অভিমন্যু। একবেলা চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকতে দেবে না।

মন নিয়ে বিলাস। এ ওর অসহ্য।

'বেরোতে মন লাগছে না—ও আবার একটা পুরুষোচিত কথা হলো নাকি অভিমন্যুদা? মনকে লাগান? মন আপনার ইচ্ছাধীন, না আপনি মনের ইচ্ছাধীন?'

'তোমার মতো এমন একটি পালকের বল-এর মতো হাল্‌কা মনের অধিকারী হ'লে হয়তো ব্যাপারটা তাই হতো।'

'ইচ্ছে করলেই মনকে পালকের বল করা যায় অভিমন্যুদা, না করলেই বাইশ মণ বোঝা। মানুষ চিরদিন বাঁচবার জন্যে পৃথিবীতে আসে না। যার দিন ফুরোবে, সেই চলে যাবে। সেই মৃত্যুটাকে অহরহ আর একজনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয়?'

মৃত্যু? কার সে মৃত্যু? মঞ্জরীর নাকি?

কথাটা সুরেশ্বরই আর-একবার কবে যেন উচ্চারণ করেছিলো না?

কিন্তু অভিমন্যুর তাতে চম্‌কাবার কি আছে?

তার জীবন থেকে তো মঞ্জরীর মৃত্যুই হয়েছে।

তবু কথাটা এতো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে শুনলে চম্‌কানি আছে!

তবু মনে করলেও ভিতরে কী অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হতে থাকে।

ভিতরে? মাথার ভিতরে? না মনের?

'মন' বস্তুটা মস্তিষ্কেরই না কোন্‌খানে যেন অবস্থান করে?

মঞ্জরীর ছবিতে শহরের দেয়ালগুলো ভর্তি। তাকাবো না ভাবলেও না তাকিয়ে উপায় নেই। কিন্তু কিছুতেই কেন তাকে 'মঞ্জরী' ব'লে মনে হয় না।

সত্যিকারের মঞ্জরী, রক্তমাংসের দেহধারী সেই মানুষটা কেমন দেখতে আছে এখনও? তাকেও দেখলে মঞ্জরী ব'লে চেনা যাবে না?

'কী অভিমন্যুদা রেগে গেলেন নাকি? আপনি কি সেন্টিমেন্টাল, আশ্চর্য! চলুন-চলুন, মন্দির দর্শন ক'রে আসা যাক্‌। ভারতের লোকের পুণ্যি না ক'রে উপায় নেই, দেখেছেন? যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যেখানে স্থাপত্যশিল্প, যেখানে ইতিহাসের প্রাচীন-নিদর্শন, সেখানেই সর্বস্ব জুড়ে এক বিগ্রহ স্থাপনা করে আছে।'

'তা-ছাড়া আর কি হবে? দেবতাকেন্দ্রিক দেশ!'

'আমার কিন্তু কি মনে হয় জানেন অভিমন্যুদা? ভক্তি-ফক্তি কিছু নয়, এও একরকম কূটনীতি। দেবতার নাম ক'রে ধনসম্পদ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা! জনসাধারণ সহজে লুটেপুটে নেবে না, উত্তরাধিকারীরা উড়িয়ে দিতে পারবে না, এই সব আর কি!'

'সব জিনিষেরই একশো রকম ব্যাখ্যা করা যায় সুরেশ্বর! মানুষের ব্রেন যে সবসময় কাজ করছে, ওটা তারই নিদর্শন।'

সুরেশ্বর চকিত হয়ে বলে, 'কোন্‌টা?'

'এই ব্যাখ্যাগুলো!'

'ও! কিন্তু যাই বলুন অভিমন্যুদা, আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি ব্রেনকে এবং মনকে একদম সীল ক'রে দিয়েছেন, কোনোরকমে তা নাড়াচাড়া করতে রাজী নয়'-স্বভাবগত পদ্ধতিতেই হেসে ওঠে সুরেশ্বর!

* * *

বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্যের চোখ ধাঁধানো সমাবেশ। বিছানার ওপর শাড়ীর পাহাড়, কৌচের উপর ব্লাউজের বৃন্দাবন, এখানে-সেখানে আরো কত কি! ঘরের মেঝেয় তিন-চারটে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সুটকেস হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে। আলমারি থেকে বার ক'রে রাখা এই জিনিসগুলো ওই সুটকেস ক'টার মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে।

নবনিযুক্ত দাসী প্রমদা সাহায্য করবার আশায় এবং কর্ত্রীর নির্দেশের আশায় অনেকক্ষণ এ-ঘরে অপেক্ষা করছিলো, একটু আগে মঞ্জরী তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'এখন পালা, পরে ডাকবো।'

ঢাকাই বেনারসী, সিল্ক জর্জেট, ক্রেপ্, শিফন্-জরি-রেশমের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য! শাড়ীগুলো একত্রে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে মঞ্জরী। পাগলের মতো এ-কী করছে সে? এতো শাড়ী, এত ব্লাউজ, প্রয়োজনীয় প্রসাধনের আর বিলাসের এতো উপকরণ কোন্ ফাঁকে জমে উঠেছে।

জোয়ারের জলের প্রচণ্ড টান যেমন আকর্ষিত করে তীরবর্তী খড়-কুটো, পাতা-লতা, পোড়া-বাঁশ, ভাঙা মালসার স্তূপীকৃত জঞ্জাল। তাকিয়ে দেখে না কি সংগ্রহ করছি, আর কি না করছি! তেমনিই করেই কি দোকানের স্তূপীকৃত জঞ্জালগুলো এসে জমা হয়েছে মঞ্জরীর ঘরে?

অপ্রত্যাশিত অগাধ উপার্জনের নতুন জোয়ারে ভাসতে-ভাসতে কাণ্ডজ্ঞান কী হারিয়ে ফেলেছিলো মঞ্জরী? মঞ্জরী কি এতো লোভী?

তুচ্ছ বস্তুর প্রতি এমন দুর্দান্ত লোভ কোথায় লুকিয়েছিলো মঞ্জরীর মধ্যে। এত লোভই কি তাহ'লে মঞ্জরীকে কেন্দ্রচ্যুত করেছে?

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা নিজেকে নিজে এই প্রশ্ন করে।

'কোন্ সুটকেসে কোন্‌গুলো রাখবো দিদিমণি, ব'লে দিন—'

প্রমদার এই বারংবার একঘেঁয়ে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে তাকে আপাততঃ দূর ক'রে দিয়ে চাই ক'রে ঢালা শাড়ীগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো মঞ্জরী।

আর চোখবোঁজা চোখের সামনে ভাসছিলো অনেকদিন আগের একটা ছবি। অভিমন্যু আর মঞ্জরী কয়েকদিনের জন্যে রাঁচী বেড়াতে গিয়েছিলো। মাত্র কয়েকদিনের জন্যে বলে অভিমন্যু বলেছিলো, 'দু'জনের একটা সুটকেসই

যথেষ্ট।' মঞ্জরী একটা সুটকেসের মধ্যে দু'জনের জামা-কাপড় ঠেসে-ঠেসে ভরতে গিয়ে হেসে ফেলে বলেছিলো, 'কি অসাধ্য সাধন করালে তুমি আমাকে দিয়ে। উঃ! একেই বলে জলের মধ্যে হাতী পোষা। অথচ আমার শাড়ী-টাড়ী তো কিছুই নিতে পারলাম না। এরপর যেখানে যাবে—মনে রেখো, কেবলমাত্র আমার একলার জন্যেই দশটা সুটকেস নেবো।'

অভিমন্যু হেসে বলেছিলো, 'তার মধ্যে ভরবে কি? ঘুঁটে কয়লা?'

'তার মানে?'

'তা—গরীব লেকচারের স্ত্রী, দশটা সুটকেস ভরানোর উপযুক্ত ওর থেকে দামী মাল আর পাবে কোথায়?'

'পাবো কোথায়? ইস্!' মঞ্জরী ভ্রূভঙ্গী ক'রে বলেছিলো—'তোমরাই ভিখারী ভোলানাথের জাত, আমরা চিরঅন্নপূর্ণা, চিরলক্ষ্মী! বুঝলে মশাই?'

'বুঝলাম—' ব'লে অভিমন্যু হাত দিয়ে মঞ্জরীর কপালের ঘাম মুছে দিয়েছিলো। সেই ঘামের সঙ্গে-সঙ্গে কি অভিমন্যু মঞ্জরীর কপালের সৌভাগ্যের লেখাটাও মুছে দিয়েছিলো?

তারপর অভিমন্যুর সঙ্গে আর কোথাও যাওয়া হয়নি মঞ্জরীর, দশটা সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে। চোখের জল এতো অবাধ্য কেন?

* * *

'মা, একটা ছেলে আর দু'টো মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

চাকরটার ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো মঞ্জরী। একটা ছেলে আর দু'টো মেয়ে। কে তারা?

উঠে ব'সে মঞ্জরী বলে, 'কত বড়ো ছেলে-মেয়ে?'

'এই—ইস্কুলের-টিস্কুলের ছেলে-মেয়ে হবে।'

মঞ্জরী অবাক হয়ে বলে, 'কই, ডাক্ তো দেখি।'

সাংবাদিকের "সাক্ষাৎকার" সূত্রে কেউ-কেউ আসছে মাঝে-মাঝে বটে, কিন্তু এ'রকম 'ছেলে-মেয়ে' গোছের তো নয় তারা। মঞ্জরী উঠে চেয়ারে এসে বসে। আর পরক্ষণেই দু'জনকে বাইরে বসিয়ে রেখে একজনকে মাত্র নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে চাকরটা। যাকে নিয়ে এসেছে, সে দরজার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে, মঞ্জরী তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুধু বলতে পারে, 'চঞ্চলা?'

ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে থেমে যায়।

সে অধিকার কি মঞ্জরীর আর আছে?

'আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি ছোটমাসী!'

চঞ্চলাই এবার মঞ্জরীর বাধা ভেঙ্গে দেয়, কাছে এসে জড়িয়ে ধরে।

'তুই! কি ক'রে তুই আমার বাড়ী খুঁজে বার করলি রে চঞ্চলা? দুষ্টু মেয়ে, সোনা মেয়ে!'

চঞ্চলার এবার চমক ভাঙলো। অব্যাহত হয়ে বললে, 'আমি, বার করিনি, আমাদের স্কুলের একটা মেয়ের দাদা—' ঢোঁক গিলে চঞ্চলা বলে, 'মেয়েটা বললো—ওর দাদা তোমার কাছে আসবে অটোগ্রাফ্ নিতে, তাই আমি—'

'কেন এলি? দিদি জানতে পারলে নিশ্চয় তোর উপর খুব রাগ করবেন!' বিষণ্ণ স্বরে বলে ওঠে মঞ্জরী।

চঞ্চলা কুণ্ঠিত হয়ে বলে, 'রাগ আবার কি করবেন। মা'র আর ওসব কিছু নেই ছোটমাসী, কি রকম যেন হয়ে গেছেন।'

'কি-রকম যেন হয়ে গেছেন?' মঞ্জরীর কণ্ঠে আর্তনাদের সুর।

'কি-রকম যেন! আগের মত আর নেই। বাড়ীতে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না ছোটমাসী।'

মঞ্জরী পুরানো অভ্যাসের পরিহাসের সুরে বলতে যাচ্ছিলো, 'বাড়ীতে ভালো লাগছে না? তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী যা?'

কিন্তু কি ভেবে বললো না। শুধু বললো, 'কিন্তু তারা কোথায় তাহ'লে? তোর বন্ধু আর তোর দাদা?'

'নীচের ঘরে।'

'ওমা সে-কি, ডাক্ তাদের?'

'ডাকছি! আমার কথাটা আগে ব'লে নিই—'

'কি কথা রে? বল! চুপ ক'রে আছিস কেন?'

সহসা মুখ তুলে চঞ্চলা ব'লে ওঠে, 'ছোটমাসী তোমার কাছে আমায় থাকতে দেবে?'

'কী সর্বনাশ!, শিউরে উঠে মঞ্জরী বলে, 'অমন কথা মুখে আনিসনে। আমার কাছে আবার মানুষ থাকে!'

'কেন থাকবে না। কি দোষ করেছো তুমি? ওদের কথা আমার আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কাদের কথা?'

'এই—ইয়ে—সবাইয়ের কথা। সবাই বলে, 'তুমি নাকি অন্যরকম হয়ে গেছো ছোটমাসী। কই আমি তো-তা দেখছি না। ঠিক সেই রকমই তো আছো—' কথাটা ব'লে এতক্ষণে ঘরের সম্পূর্ণ চেহারাটা তাকিয়ে দেখে চঞ্চলা!

এত জিনিসপত্র, এই ঘর-বাড়ী সব ছোটমাসীর! সব নিজের রোজগারের! বিশ্বাস হয় না যেন! কিন্তু মঞ্জরী অন্যরকম কোথায়?

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'কে বললে সেইরকম আছি? বদলে গেছি, একেবারে বদলে গেছি আমি।'

'মোটেই না!' চঞ্চলা জোর দিয়ে ব'লে, 'ঠিক তো সেইরকমই রয়েছো? আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাওনা ছোটমাসী!'

হায় অবোধ মেয়ে! বুকটা টন্‌টনিয়ে ওঠে মঞ্জরীর, তবু হেসে বলে, "আমি তো সিনেমা ক'রে বেড়াই, আমার কাছে থেকে কি করবি?'

'আমিও সিনেমা করবো।'

'সর্বনাশ! অমন কথা মুখে আনিস্‌নে চঞ্চলা, স্বপ্নেও মনে আনিসনে! দুর্গা-দুর্গা!'

'বাঃ, নিজে তো বেশ—কতো নাম, কতো সুখ্যাতি, কতো টাকা!'

মঞ্জরী হাসির আবরণ মুখে পরিয়ে বলে, 'কত দুঃখ, কতো জ্বালা—'

'দুঃখ! দুঃখ আবার কি? শুধু আপনার লোকেরা তোমার নিন্দে করে, এইতো?'

'তা সেটাই কি কম দুঃখ রে?'

'ছাই! আপনার লোকেরা তো সবটাতেই নিন্দে করে। ও বলে—' বলেই থেমে যায় চঞ্চলা।

'কে-কি বলে?' মঞ্জরীর স্বর বিস্ময়াভিভূত।

'মানে, ওই যে ছেলেটা আমার সঙ্গে এসেছে। আমার বন্ধুর দাদা তো? ও বলে যে, "পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই, যাতে আত্মীয়েরা নিন্দে না করে! দেশের সেবা করলেও করবে, পরোপকার করলেও করবে, দাতা হ'লেও করবে, সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেও করবে। ও নিন্দেয় কান দিলে চলে না।" ও বলে যে, ও নাকি কারুর নিন্দেয় কান না দিয়ে—সিনেমা এ্যাক্‌ট্রেসকে বিয়ে করবে!'

ওর বর্ণনায় চম্‌কিত হয়ে মঞ্জরী বলে, 'ছেলেটা বেশ মহৎ, না-রে?'

চঞ্চলা মহোৎসাহে উত্তর দেয়, 'খু-ব! অন্যরা যাকে ঘৃণা করে, ও তাকেই ভক্তি করে—'

চঞ্চলার এই উৎসাহের মধ্যে থেকে তার সিনেমা করবার উৎসাহের কিছু সূত্র আবিষ্কার ক'রে ফেলে ঈষৎ বিমনা হয়ে পড়ে মঞ্জরী! সন্দেহ নেই—একটি ইয়ার ছোকরার পাল্লায় পড়েছে মেয়েটা! কিন্তু মঞ্জরী কি করবে? নিবৃত্ত করবার কোনো উপায় কি তার হাতে আছে? তবু বললে, 'সত্যি বুঝি? অদ্ভুত ছেলে তো? তা ডাক্‌ তাকে, দেখি।'

চঞ্চলা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'ডাকছি।'

'ডাকছিস্? বোস্-দাঁড়া, একটা কথা বলছিলাম—'

'কি কথা?' থমকে দাঁড়ালো চঞ্চলা।

কি কথা? সত্যিই তো কি কথা। যে কথা পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো উদ্বেগ হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে, সে কথা বলবার ক্ষমতা কই? দেহের সমস্ত শক্তি মুখের দরজায় জড়ো ক'রে এনেও নিতান্ত সহজ ভঙ্গিতে বলা যায় না, 'হ্যাঁরে, তোর ছোট-মেসোর খবর-টবর কি? আসে-টাসে তোদের বাড়ীতে? বা তোরা যাস্ কী তার বাড়ী?'

কিছুতেই বলা গেলো না। কিন্তু আশ্চর্য! চঞ্চলাও তো কোনো ছলেই সেই লোকটার প্রসঙ্গে এলো না!

চঞ্চলা একটু অপেক্ষা ক'রে বলে, 'কই, বললে না?'

'হ্যাঁ—এই যে! বলছিলাম কি আমি তো আর ক'দিন পরে বম্বে চলে যাচ্ছি চঞ্চলা, তুই আমার কাছে থাকবিই বা কি ক'রে?'

যাহোক্ একটা কথা ব'লে পার পাওয়া। চঞ্চলা কিন্তু উৎসাহের দীপ্তি মুখে মাখিয়ে ব'লে ওঠে, 'সে-তো আমি জানিই! 'চিত্রজগৎ'-পত্রিকায় তো তোমরা কে-কখন-কোথায় যাচ্ছো—ছেড়ে, কি দিয়ে ভাত খাও, তা পর্যন্ত থাকে। সেইজন্যেই তো বলছি, তোমার সঙ্গে আমিও চলে যাবো। কেউ চট্ ক'রে ধ'রে আনতে পারবে না!'

মঞ্জরীর হাহাকার-করা শূন্য হৃদয় সহসা দুরন্ত এক লোভে তৃষিত হয়ে ওঠে। তা যদি সম্ভব হতো! এতোটুকু একটু স্নেহের ধনকে যদি কাছে রাখতে পারা যেতো!

যায়! রাখা যায়! বিবেককে চুপ করিয়ে রাখতে পারলেই রাখা যায়! চলে যাক্ না মঞ্জরী ওকে নিয়ে! সুনীতির কি ক্ষতি হবে?

সুনীতির একটু অবহেলায় মঞ্জরীর জীবনে কতো-বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে, সে হিসেব কি কোনদিন করেছে সুনীতি?

'মঞ্জরী' ব'লে একটা অবোধ যে এক প্রবল ঝড়ের ধাক্কায় ছিট্‌কে তার কাছে আশ্রয় নিতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলো, ফিরে এসে সে যে দুঃখে-অভিমানে নিরুপায় হয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো, সে কথা ভেবে সুনীতি কোনদিন কি অনুতাপ করেছিলো?

না, করেনি। করলে অনায়াসেই একটা চিঠি লিখে খোঁজ নিতে পারতো সুনীতি, কোনো দুর্বল মুহূর্তে টেলিফোনের রিসিভারটা একবার তুলতো। মঞ্জরী লুকিয়ে পালিয়ে নেই যে, তার খোঁজ মিলবে না।

সুনীতি মঞ্জরীর খোঁজ নেবার চেষ্টা করেনি, শুধু আর পাঁচজনের সঙ্গে

গলা মিলিয়ে 'ছি-ছি' করেছে! তাছাড়া আর কি?

তবে মঞ্জরীই বা তাকে দয়া করবে কেন? কেন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা মেনে নেবে না? মনকে কঠিন করে নিয়ে মঞ্জরী বলে, 'আচ্ছা আমাকে দু'-একটা দিন ভাবতে দে। তুইও ঠিক ক'রে ভেবে নে। যদি সত্যিই আমার কাছে চলে আসতে চাস্, তাহ'লে বুধবার সন্ধ্যায়—হ্যাঁ, বুধবার সন্ধ্যায় ফের এখানে আসবি!'

'ঠিক আসবো, দেখো! একেবারে জিনিস-টিনিস নিয়ে—'

'জিনিস-টিনিস তোকে কিছু আনতে হবে না রে—দেখছিস্ না এই কতো জিনিস? এসব তোকে দিয়ে দেবো সব।'

'আহা!'—বলে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে চঞ্চলা।

'কিন্তু ভাবছি—সত্যিই আসতে পারবি তো? দিদি জানলে—'

কেউই জানতে পারবে না। ওই যে ছেলেটা, ও বলেছে আমাকে সিনেমা একট্রেস হবার জন্য ও সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

উত্তরোত্তরে চমকিত মঞ্জরী বিবেককে সান্ত্বনা দেয়, মঞ্জরী প্রতিহিংসা সাধন না করলেও কি এই বোকা মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারবে? নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে-থেকে আরো 'কি রকম যেন' হয়ে যেতে থাকবে, আর কর্তাহীন বাড়ীতে অসহায় দু'টো তরুণী মেয়ে জীবনকে এলোমেলো ক'রে ফেলবে। বললো, 'হ্যাঁরে তোর মেজদির খবর কি?'

'মেজদি? মেজদি তো শুধু মা'র কাছে ব'সে থাকে গম্ভীর হ'য়ে আর কাঁদে। আমারই প্রাণ তাতে হাঁপিয়ে ওঠে।'

'হুঁ! আচ্ছা! যা, ওদের ডেকে আন্‌গে!'

রোগা-সিড়িঙ্গে, হাফ্‌সার্ট আর পায়জামা-পরা একটা ছেলে পিছন-পিছন, তদনুরূপই ফ্রক-পরা একটা মেয়ে। অটোগ্রাফের খাতা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

ছেলেটা যেন গড়িয়ে-পড়া বিনয়ের অবতার, মেয়েটা' কুণ্ঠিত ভীত লজ্জা-বনতা। দেখে হাসিও পেলো, অবাকও লাগলো মঞ্জরীর। এ দীনহীন ভঙ্গি আর নিতান্ত নাবালক বয়সের মধ্যে এতো দুঃসাহস এলো কোথা থেকে? এতোটুকু ছেলেটা দু'দুটো মেয়েকে ঘাড়ে ক'রে লুকিয়ে এসে হানা দিয়েছে, একজন নামকরা অভিনেত্রীর বাড়ীতে!

আশ্চর্য! ছেলেটাকে দেখলে অবশ্য হাসিই পাচ্ছে, চঞ্চলার হাবা-গোবা মেয়েদের ক্ষতি করতে এরাই পারে।

শুধু স্বাক্ষর নয়, বাণীও চাই। যথারীতি বাণী বিতরণ ক'রে মঞ্জরী ওদের পরিতুষ্ট ক'রে খাওয়ায়। 'হিম আঁধার' খুলে খাওয়ায় ঠাণ্ডা ফল আর ঠাণ্ডা

মালাই। মাসীগৌরবে গৌরবান্বিত চঞ্চলা আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুলক-কম্পিত চিত্তে সবান্ধবে বিদায় নেয়।

মঞ্জরী মিনিট-কয়েক চিন্তা-হারানো স্তব্ধ মন নিয়ে চুপ করে ব'সে থেকে সহসা উঠে প'ড়ে বিছানায় রাশ-করা শাড়িগুলো নিয়ে সহোৎসাহে গোছাতে বসে একটা স্যুটকেস টেনে নিয়ে। চঞ্চলাকে নিয়ে পালিয়েই যাবে সে! কেন যাবে না? তার মুখের দিকে কে-কবে চেয়েছে যে, সে অপরের মুখের দিকে তাকাবে? বেশ করবে মঞ্জরী, সমাজ আর সংসারের অনিষ্ট ক'রে। সমাজ যদি তার জন্যে মঞ্জুর ক'রে রেখে থাকে শুধু ঘৃণার বিষ, মঞ্জরীই বা অমৃত পাবে কোথায়? সেই বিষের পুঁজি নিয়ে সমাজকে ছোবলই হানবে!

কঠিন-কঠিন সংকল্পমন্ত্র কখন অবসরে নিস্তেজ হয়ে যায়। কোন্ কোন্ শাড়ীগুলো চঞ্চলাকে মানাবে, কোন্-কোন্ অলঙ্কারগুলো চঞ্চলাকে দিয়ে দেবে, কতোটুকু ছোট ক'রে নিলে মঞ্জরীর ব্লাউজগুলো চঞ্চলার গায়ে ফিট্ করবে, এই সবই ভাবতে সুরু করে মঞ্জরী।

অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক দ্বিধা! অনেক বিচার-বিবেচনা-বিতর্ক। প্রচণ্ড লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত। নিজেকে নিয়ে ধ্বংসের পথে এগোতেও বোধকরি এতো লড়াই করতে হয়নি মঞ্জরীকে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য! এসব শব্দ নিয়ে এত বেশী বিশ্লেষণ করার অবকাশও ছিলো না তখন। সে ছিলো আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে আগুনে ঝাঁপ!

এ অন্য! এ যেন ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যা!

তবু একদিন লড়াইয়ের জয়-পরাজয় ঘোষিত হলো। বম্বেগামী একখানি ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় চঞ্চলাকে দেখে গেলো মঞ্জরীর পাশে।

চঞ্চলার মুখ শুকনো, গালে শুকিয়ে-যাওয়া চোখের জলের দাগ আর চোখে উৎসাহের দীপ্তি।

তবে মঞ্জরীর? মঞ্জরীর কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মঞ্জরী যে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী! যারা তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তারা স্টেশনে মঞ্জরীর খোঁজ নিতে আসছে।

না, চঞ্চলার সম্পর্কে কারো কোনো বিস্ময় নেই।

অনেকেই অমন ছোটখাটো একটি আত্মীয়া-টাত্মীয়া সঙ্গে আসে।

ট্রেন ছোটে, পিছনে-পিছনে একটা ভয় ছুটে আসে তাড়া ক'রে। মেয়ে-চুরির শাস্তি কি?

কিন্তু ভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু ভরসা উঁকি মারে কেন?

অভিযোগ করবে কে? সুনীতি তো? তাকে তা'লে দেখতে পাওয়া যাবে? কে-জানে যাবে কি না, কে-জানে কি নিয়ম!

✻ ✻ ✻

বোম্বাই শহর। তারই একান্তে তার চিত্রজগৎ। একেই বলে চিত্রজগৎই! কিন্তু এতোদিন তবে কোথায় ছিলো মঞ্জরী? সেও তো চিত্রজগৎই! কিন্তু না, সে এর তুলনায় নাবালক শিশুমাত্র।

এ-কী দুরন্ত দীপ্তি, এ-কী চোখ ঝলসানো আগুনের-আলো, এ-কী শ্বাসরোধকারী কর্মব্যস্ততা, এ-কী দম আট্‌কানো রুচিহীনতা!

এ কোথায় এসে পড়লো মঞ্জরী! কোথায় নিয়ে এলো চঞ্চলাকে!

মনে পড়লো বনলতার নিষেধ, মনে পড়লো নিশীথ রায়ের বিষণ্ণ ব্যঙ্গোক্তি! 'আজ আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন মঞ্জরীদেবী, কিন্তু বম্বে আপনাকে ফিরিয়ে দেবে না।' কী প্রচণ্ড ভবিষ্যৎবাণী!

জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দীর্ঘ দু'টো বছর যে বাঁধকে রক্ষা ক'রে এসেছে মঞ্জরী, দু'দিনে সে বাঁধ ভেঙে যেতে বসেছে যে!

এ-কী দুরন্ত আকর্ষণ! স্নান করতে এসে হাঙরের মুখে পা পড়েছে! কার আর তবে সাধ্য আছে যে, রক্ষা করবে তাকে?

যে বস্তু নাকি সোনার কৌটায় রক্ষিত সাত রাজার ধন এক মাণিক, সেই বস্তু নিয়ে এখানে হেন ছিনিমিনি খেলা! মদের গ্লাসে চুমুক দিতে না চাওয়াটা এখানে 'পিসিমার গোবর জল'-এর মতোই হাস্যকর-শুচিবাই। দৈহিক পবিত্রতার নামে এখানে অদ্ভুত রকমের উদার!

রাত্তিরের কি আর দিশ-দিশা থাকে?

প্রত্যেকদিনই বাড়ী ফিরে দেখে চঞ্চলা ঘুমিয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত মেয়ে-চুরির অভিযোগে কোনো ওয়ারেন্টই এলো না মঞ্জরীর নামে! সুনীতি কেমন যেন হয়ে গেছে! একটা মেয়ে হা'রিয়ে গেলেও তার কিছু যায় আসে না?

বাড়ীতে রাতের খাওয়া! সে-তো প্রায় ভুলতেই বসেছে মঞ্জরী! ক্লান্ত-নেশাচ্ছন্ন দেহটাকে টেনে এনে কোনোরকমে বিছানায় এনে ফেলা!

আশ্চর্য, ঘুম আসে না। শোবার আগে মনে হয়, বালিশে মাথা রাখার আগেই ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু সে-কি হয়! মাথার মধ্যে লক্ষ্য করতালির বাজনা বাজে, সমস্ত স্নায়ু-শিরা দপ্‌-দপ্‌ করতে থাকে, রক্তের কণায়-কণায় উদ্দাম নাচ। ঘুম আসে সেই শেষ রাত্রে। সে ঘুম ভাঙে অনেক বেলায়। ঘুম ভাঙে যখন, চঞ্চলা তখন স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে ম্লানমুখে হয়তো একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।

প্রথম-প্রথম মঞ্জরী চেষ্টা করেছিলো মেয়েটাকে একটু সাহচর্য দেবার, কিন্তু সে চেষ্টা হাস্যকর চেষ্টায় পরিণত হয়েছিলো। - সময় কোথায়? মোটা টাকা

দাদন দিয়ে যে সুন্দরী অভিনেত্রীটিকে কলকাতা থেকে এতোদূরে টেনে আনা হয়েছে, তাকে কে সময় দেবে তুচ্ছ একটা বালিকাকে সাহচর্য দেবার? তার সাহচর্য কতো মূল্যবান, সে-কথা বোঝবার কি ক্ষমতা আছে পরিচালকদের? মঞ্জরী লাহিড়ীকে এখানের সমাজ পালকের বলের মতো কাড়াকাড়ি-লোফালুফি খেলতে চাইছে।

পরিচালক নন্দপ্রকাশজী নিজের ফ্ল্যাটের পাশেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিরাভিভাবক বাঙালী অভিনেত্রীকে। বিদেশে ওঁরাই মা-বাপ যে!

মাঝে-মাঝে নিজের গাড়িতেও তুলে নিয়ে আসেন তিনি মঞ্জরীদেবীকে। আনেন মানে, আনতে হয়। যেমন আজ হলো। নেশায় বেহুঁশ-বেএক্তার মানুষটাকে একটু নজরে রাখতে হয় বৈকি।

এখানে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রী-পুত্র আছে, তারা এটাকে ভালো চক্ষে দেখে না, তবু ভদ্রলোক দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। প্রায় ধ'রে-ধ'রেই সিঁড়িতে তুলে মঞ্জরী'ক তার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নন্দপ্রকাজী প্রশ্ন করেন, 'যাইতে পারবেন? অসুবিধে হবে না তো?'

'নো! নো! থ্যাঙ্কস্!'—জড়িতকণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে টলতে-টলতে ঘরে ঢুকে সোফায় ব'সে পড়ে মঞ্জরী। মৃদু নীল আলো জ্বলছে ঘরে, দেয়ালের কাছে সরু খা:টর বিছানায় চঞ্চলা ঘুমোচ্ছে, যেন বন্দিনী রাজকন্যা। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হু-হু ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে মঞ্জরী, যেমন ক'রে তাকে দেখে একদিন বনলতা কেঁদেছিলো।

চম্‌কে জেগে ওঠে চঞ্চলা, খাট থেকে নেমে এসে মঞ্জরীকে 'ছোটমাসী-ছোটমাসী' ব'লেই ধরতে গিয়েই ছিট্‌কে পাঁচ-হাত দুরে স'রে যায়। পূর্ব পরিচিত না থাকলেও সহজজাত বোধশক্তিতে বুঝতে দেরী হয় না তার, ছোট-মাসীর সর্বাঙ্গে কিসের গন্ধ!

ওকে স'রে যেতে দেখে আরো ডুক্‌রে ওঠে মঞ্জরী, 'চলে যা! চলে যা! আরো অনেক দূরে স'রে চলে যা। আমি মদ খেয়েছি, আমি মাতাল! বুঝলি? বুঝতে পারলি? আমি তোর মাসী, প্রফেসর অভিমন্যু লাহিড়ীর স্ত্রী মঞ্জরী লাহিড়ী, আমি মাতাল হয়ে এসেছি, খারাপ হয়ে এসেছি!'

জড়িতকণ্ঠ আরো জড়িয়ে আসে, সোফার ওপর মুখ ঘষতে থাকে মঞ্জরী। কাঠের মত দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিলো চঞ্চলা, মাঝ-রাত্তিরের সদ্য-ঘুম ভাঙা চেতনা নিয়ে, এ দৃশ্যে সেও হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা মারে! এই ক'দিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার কিছু আলাপ হয়ে গেছে, ভাষার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও।

মাঝরাতে রীতিমত একটি নাটক জমে ওঠে।

নন্দপ্রকাশজী আসেন, তাঁর স্ত্রী আসেন, ছেলেমেয়েরা দরজার কাছে ভীড় করে, চাকর-বাকরেরা উঁকি দেয়।

পরদিন শুকনো-শুকনো-মুখ রুক্ষচুল মঞ্জরী এসে নন্দপ্রকাশজীকে ধরে, 'আমায় কয়েকটা দিন ছুটি দিন জী।'

ছুটির নামে আঁৎকে উঠেই ভদ্রলোক কি ভেবে চুপ ক'রে যান। এক মিনিট ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা। ক'দিন? চার-দিন?'

'এক সপ্তাহ হয় না?'

'এক সপ্তাহ, সাত দিন? এতো লাগবে?'

'শরীরটা বড়ো খারাপ হয়েছে জী।'

'আচ্ছা, ওই হবে। সুটিং প্রোগ্রামটা চেঞ্জ কোরতে হোবে।'

❁ ❁ ❁

চঞ্চলার জীবনে উৎসব এলো। মঞ্জরী সারাদিন ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে-দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকাল-বিকাল-সন্ধ্যে। ম্লান-বিষণ্ণ-ভয়গ্রস্ত প্রাণীটাকে আদরে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। উপহারের প্রাচুর্যে ডুবিয়ে রাখতে চায় সব কিছু!

সন্ধ্যায় সমুদ্রতীর। আলোকজ্জ্বল মেরিণ ড্রাইভ।

ঝলমলে-ঝকঝকে। খ'সে পড়া এক টুক্‌রো পরীরাজ্য!

অভিভূত চঞ্চলা দিশে পায় না কোন্‌দিকে তাকাবে। দূরে ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। ওদের ও-সব গা-সওয়া।

সে-রাত্রের ভয়টা জোর ক'রে ভুলেছে চঞ্চলা, জোর করেই সহজ হতে চেষ্টা করছে, তবু তার সমস্ত অন্তরাত্মা তৃষিত হয়ে পথে-পার্কে-দোকানে-পশারে মানুষের ভীড়ের দিকে তাকায়। এতো লোক, এতো অজস্র লোক, কলকাতার কোনো লোক থাকে না এখানে? যাকে চঞ্চলা চিনতে পারে, যার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে?

কলকাতায় গিয়ে মা'র পায়ে প'ড়ে কেঁদে-কেটে সব ঠিক ক'রে নেবে। উঃ, কে জানতো ছোটমাসী এমন অদ্ভুত-ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। অবিশ্যি এই ক'টা দিনে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ছোটমাসী। আগের মতো লাগছে, তবু প্রাণের মধ্যে স্বস্তি নেই চঞ্চলার। তাই পথে বেরিয়ে ও খালি জনারণ্যের মুখের পানে তাকায়।

কিন্তু কী কঠিন যন্ত্রের মতো মুখগুলো লোকগুলো এখানকার। অনবরত সবাই যেন ছুটছে। সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে তাও ব্যস্ততা, তাও

তাড়াতাড়ি-হুড়োহুড়ি।

আসছে-যাচ্ছে, দু'মিনিট বসবে, উঠে চলে যাচ্ছে। আজ শুধু অনেকক্ষণ থেকে ওরা নিজেরা চুপচাপ ব'সে থাকতে-থাকতে দেখেছে খানিকটা তফাতে দু'জন লোক ব'সে তাদেরই মতো চুপ ক'রে পিছন ফিরে। পাঞ্জাবী-পরা ওই পিঠটা কেন অনবরত এমন ক'রে টানছে চঞ্চলাকে? কেন মনে হচ্ছে ওই ভঙ্গিটা যেন বহু পরিচিত?

লোকদু'টো উঠে কি এইদিকে আসবে?

ছোটমাসী ওদিকে মোটে তাকাচ্ছে না যে!

'তুই মোটে কথা বলছিস্ না কেন রে চঞ্চলা?'

চম্‌কে উত্তর দেয় চঞ্চলা, 'বলছি তো।'

'কোথায়? শুধু তো হাঁ ক'রে আকাশপানে চেয়ে আছিস্।'

'ছোটমাসী!'

'কি-রে?'

'ওই লোকটাকে দেখেছো?'

'কোন লোকটাকে?' বলেই চকিত দৃষ্টিপাত করে মঞ্জরী, এদিক-ওদিক।'

'ওই যে!'

পলকপাত মাত্র। বিদ্যুৎ-শিহরণের মতো একটা শিহরণ ওঠে তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে। পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিসের আসায় চঞ্চলা তাতে তাকে ডেকে দেখাতে চায়?

স্বপ্নলোকের কোন্ এক ব্যক্তির সঙ্গে ভঙ্গির সামান্যতম একটু সাদৃশ্য আছে ব'লে? আলো-আঁধারি সমুদ্র-বেলায় পিছু ফিরে ব'সে থাকা একটা লোকের শুধু পিঠের একটু ভঙ্গি। বাঙালী অবশ্যই।

ধুতি-পাঞ্জাবী তো এখানে চোখেই পড়ে না। কিন্তু তাই বলে—?

চঞ্চলা পাগল হতে পারে, মঞ্জরী তো পাগল নয়।

'আমি একটু ওদিকে যাবো ছোটমাসী?'

'কেন? না-না! ওদিকে গিয়ে কি হবে?'

'কিছু না! শুধু দেখবো লোকটা বাঙালী কি না!'

'হলোই বা বাঙালী, তাতে কি লাভ?'

'হলোই বা বাঙালী, তাতে কি লাভ?'

'এমনি! যাই না ছোটমাসী?'

'যদি পুলিসের লোক হয়?'

'কেন? চঞ্চলা ভয়ে-ভয়ে বলে, 'পুলিসের লোক কেন?'

'তোকে ধরতে, আমাকে ধরতে! তুই ঘর ভেঙে পালিয়ে এসেছিস্, আমি

নাবালিকা বালিকাকে ভুলিয়ে পথে বার করেছি—এর দোষে যদি জেল হয়।'

'বাঃ, আমি বলবো, আমি নিজে ইচ্ছে করে এসেছি।'

'তোর কথার কোন মূল্য নেই। খবর পেলেই তোকে বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যাবে, আর আমাকে জেলে নিয়ে যাবে।'

'ও ছোটমাসী, ওরা উঠে যাচ্ছে—'

আর অনুমতির অপেক্ষা না করেই চঞ্চলা হঠাৎ তীরবেগে দৌড়ে যায়, আর সমুদ্রের ধারের উতলা বাতাসকে টুক্‌রো-টুকরো ক'রে তার আনন্দের আর্তনাদ তীক্ষ্ণস্বরে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে 'ছোট মেসোমশাই!'

'চঞ্চলা!'

'মেসোমশাই!'

'তুমি এখানে? কবে এসেছো? বড়দি এসেছেন?'

অনেকদিন ধ'রে কলকাতার বাইরে আছে অভিমন্যু, চঞ্চলার নিরুদ্দেশের বার্তা তাঁর জানা নেই।

হঠাৎ আনন্দে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো চঞ্চলা, এ প্রশ্নে থতমত খেয়ে ধাতস্থ হয়ে বলে, 'না, মা আসেনি। আপনি কবে এসেছেন?'

অভিমন্যুর পার্শ্ববর্তী লোকটাকে অবশ্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই আলাপ চলে।

'আমি? এখানে অবশ্য দু'দিন মাত্র, কলকাতা ছেড়েছি অনেকদিন। তারপর, বাড়ীর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা এখানে একলা ঘুরছো যে? এসেছো কার সঙ্গে?'

চঞ্চলা কি যে উত্তর দিলো বোঝা গেলো না।

অভিমন্যু এ ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝতে পারে না।

সুরেশ্বরের উপস্থিতিতেই ওর এই আরষ্টতার কারণ ব'লে মনে করে।

'উঠছো কোথায়?'

'কি-জানি। এখানের রাস্তার নাম বুঝতে পারি না।'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা-ঠিক! কমলাদের সঙ্গে এসেছো বুঝি না-কি তোমার সেই মোটা পিসিটির সঙ্গে?'

'না, ওদের কারোর সঙ্গে নয়।'

'তবে?' অভিমন্যুর কণ্ঠে বিস্ময়।

'কার সঙ্গে?'—নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না ব'লেই এই প্রশ্ন ক'রে বসে অভিমন্যু।

চঞ্চলা সাহস সঞ্চয় ক'রে ঝাঁ ক'রে ব'লে ফ্যালে, ছোটমাসীর সঙ্গে। ওই

যে ওখানে ব'সে আছে ছোটমাসী—ও-কি, কোথায় গেলো?'

আবার পাগলের মতো উল্টোমুখে দৌড়ায় চঞ্চলা।

সুরেশ্বর অবাক হয়ে বলে-'ব্যাপার কি অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু সামনের অনেকখানি শূন্যের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে, 'বোধকরি ভাগ্যচক্র।'

'মেসোমশাই!' ফিরে এলো চঞ্চলা, শুকনো-গলায় বললো, কোথাও ওদের দেখতে পাচ্ছি না, ট্যাক্সিটাকেও না।'

'ট্যাক্সি? কোথায় ছিলো সেটা?'

'ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো।'

মনের সমস্ত শক্তি সংযত ক'য়ে কণ্ঠস্বরকে শান্ত রেখে অভিমন্যু বলে, 'তোমায় ফেলে পালিয়ে গেলেন তিনি?'

এই শান্ত ব্যাঙ্গোক্তিতে হঠাৎ একঝলক জল এসে পড়ে চঞ্চলার চোখে, ঘাড় হেঁট ক'রে থাকে বেচারী। অভিমন্যু ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না, মঞ্জরীর কাছে চঞ্চলা কি ক'রে এলো? তাও কলকাতা ছেড়ে এতো দূরে। সুনীতি কি হঠাৎ এতো প্রগতিশীলা হয়ে উঠেছেন? না-কি গোড়া থেকেই অভিমন্যুর অজ্ঞাতে মঞ্জরীর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন বজায় রেখেছিলেন সুনীতি? না বিদেশে আসতে—সঙ্গিনী হিসেবে দিদির একটি মেয়েকে চেয়ে এনেছে মঞ্জরী?

তাই সম্ভব। তাছাড়া আর কি! মঞ্জরী সম্বন্ধে সব ভাবনা ছেড়ে দিলেও, দুঃস্বপ্নেও এমন অদ্ভুত কথা ভাবতে পারে না অভিমন্যু, দিদির মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছে মঞ্জরী।

'কোথায় থাকো তোমরা এখানে? মানে, ঠিকানাটা কি?'

যতোই অদ্ভুত অবস্থায় পড়ুক অভিমন্যু, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে দেহের রক্ত যতোই দাপাদাপি করুক, তবু এই মেয়েটাকে এই রাতের বেলা একা এখানে ফেলে রেখে চলে যাবার কথা কল্পনা করতে পারে না। অথচ মঞ্জরী এমন কাজ করলো কি ব'লে? এমন কথাও ভাবছে না, এ-ছাড়া আর কি করতে পারতো মঞ্জরী!'

চঞ্চলা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'জানি না?'

'ঠিকানা জানো না? কতোদিন এসেছো?'

'অনেক দিন, দু'তিন মাস।'

'ঠিকানা জানো না কেন?'

'কি'রকম শক্ত-শক্ত কথা, ভুলে যাই।'

'বাড়ীতে চিঠি লেখো না?'

উথ্‌লে ওঠে চাপা উৎস, ডুকরে ওঠে চঞ্চলা, 'না।'

সেকেণ্ড-কয়েক চুপ ক'রে থেকে অভিমন্যু গম্ভীরভাবে বলে, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে টালিয়ে আসোনি তো?

আর উত্তর নেই। ফোঁপানির দুর্দমনীয়তাই তার উত্তর।

'কেন এলে?'

বোকা মেয়ের ভয়ের চোটে এবার একটা মিছে কথা ব'লে বসে।

বলে, 'ছোটমাসীর জন্যে মন কেমন করছিলো, দেখতে গিয়েছিলাম—তা ছোটমাসী বললো যে, বম্বে যাবি?'

'বললো আর তুমি চলে এলে? বড়দি—মানে তোমার মা রাজী হলেন?'

আর কথা কয়ানো যায় না চঞ্চলাকে। অনেক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেও না। সুরেশ্বর এতোক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর তীক্ষ্ণকর্ণ হয়ে এদের কথা শুনে এবার নীচু সুরে আবার বলে, 'ব্যাপারটা কি অভিমন্যুদা?'

'সবটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না, যতোটুকু হচ্ছে, বলতে সময় লাগবে।'

এটা উত্তর-এড়ানো কথা, বুঝতে পারবে সুরেশ্বর। কিন্তু না বুঝে থাকাও তো শক্ত। একটা শব্দ যে তার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সুরেশ্বর, চঞ্চলার উৎফুল্ল ডাক—'ছোট মেসোমশাই!' তার পরই শুনেছে 'ছোটমাসী ওখানে—'

কী এই রহস্য! কে এই ছোটমাসী?

পতিপরিত্যক্তা? স্বামীত্যাগিনী? অভিমন্যুর কি একাধিক বিবাহ!

অভিমন্যুর জীবনে যে একটা রহস্য লুকানো আছে, এ সন্দেহ বারবারই মনে এসেছে সুরেশ্বরের, আজ যেন তার হদিস মেলবার সুযোগ এসেছে। সুরেশ্বরকে নিরুত্তর দেখে অভিমন্যু আবার বলে, 'ব্যাপারটা তোমায় ধীরে-সুস্থে বোঝাবো সুরেশ্বর, এখনই এই বালিকাটিকে তো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'তা এ-তো শুনছি, ঠিকানাই জানে না।'

'সেই তো মুস্কিল। এখান থেকে কতোটা দূর চঞ্চলা?'

চঞ্চলা ম্রিয়মানভাবে বলে, 'অনেক দূর।'

'গাড়ী ক'রে নিয়ে গেলে রাস্তা চিনিয়ে দিতে পারবে?'

'পারবো না' এমন আত্মঅবমাননাকর কথাটা বলতে বোধকরি লজ্জা হয় চঞ্চলার, তাই ঘাড় নীচু ক'রে ব'লে 'পারবো।'

শুধু মেসোমশাই নয়, সঙ্গে আর একটি তরুণ যুবক। তাই ষোলোবছরের কুমারী হৃদয়ে এই লজ্জার বেদনা বড়ো কঠিন হয়ে বাজছে। কেন সে বাড়ীর

ঠিকানাটা মুখস্থ ক'রে রাখেনি। কেন সে এমন বোকার মতো কেঁদে ফেললো!

'সুরেশ্বর, এ কাজটির ভার তোমাকেই দিচ্ছি ভাই!'

'সে-কী? আপনি?'

'আমি হোটেলে ফিরছি! তুমি ট্যাক্সি নিয়ে ওর ডিরেক্শান মতো—'

চঞ্চলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভিমন্যুর একটা হাত চেপে ধরে। সেই চেপে ধরার মধ্যে রয়েছে একটি নিতান্তই কাতর মিনতি!

অভিমন্যু ঈষৎ বিচলিতভাবে ওর মাথায় একটু মৃদু আদরের চাপড় দিয়ে বলে, 'ভয় কি চঞ্চলা, উনি তোমার দাদার মতো। আর দ্যাখো না, এক্খুনি এক মিনিটে এমন ভাব ক'রে ফেলবে—'

'আপনার না যাওয়ার কারণটাই বা কি অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'কারণ কিছুই নেই, এমনিই শরীরটা ভালো ঠেকছে না, মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে। চলো না তোমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি—ট্যাক্সি নিতে তো হাঁটতে হবে অনেকটা…'

সুরেশ্বর এবার সরাসরি চঞ্চলাকেই প্রশ্ন করে, 'যাঁর সঙ্গে এসেছিলে, উনি তোমার কে হন?'

'মাসীমা।'—অস্ফুট উচ্চারণে কথাটা জানায় চঞ্চলা।

'তা উনি এভাবে চলে গেলেন যে?'

বলাবাহুল্য, চঞ্চলা নিরুত্তর।

'তুমি যদি বাড়ী চিনিয়ে দিতে না পারো, কি হবে?'

চঞ্চলা আর বোকা ব'নে থাকতে চায় না, সহসা মুখ তুলে বেশ স্পষ্টস্বরে ব'লে ব'লে বসে, 'ওঁর ঠিকানা জোগাড় করা শক্ত হবে না, ওঁকে সকলেই চেনে!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! উনি অভিনেত্রী মঞ্জরীদেবী! ডিরেক্টর নন্দপ্রকাশজীর বাড়ীতে থাকেন।'

চম্‌কে ওঠে সুরেশ্বর, চম্‌কে ওঠে অভিমন্যুও! অভিমন্যু চমকায় স্পষ্ট ক'রে মঞ্জরীর নামটা শুনে, সুরেশ্বর চমকায় অনেক কিছু কারণে।

এরপর সহসা তিনজনেই নীরব। নীরবে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে এসে, আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা ট্যাক্সি মেলে। সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'উঠে আসুন অভিমন্যুদা, মিছিমিছি এ বেচারাকে ভয় খাইয়ে কোনো লাভ নেই।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত। রাত হয়ে গেছে, এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি

যুবকের সঙ্গে চঞ্চলাকে একগাড়ীতে তুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা অসমিচীন। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে অভিমন্যু। গাড়ী চলতে থাকে, সুরেশ্বর মিনিটে-মিনিটে চঞ্চলাকে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকে। চঞ্চলা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে কিছুই বলতে পারে না এবং ড্রাইভারটা উত্যক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত উদ্ধত প্রশ্ন করে, কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছে কি-না!

ডিরেক্টর নন্দপ্রকাশজীকে চঞ্চলা যতোই সমীহ করুক, দেখা গেলো—বম্বের পথচারী নাগরিকগণ তেমন করে না। যে-যার নিজের ধান্ধায় ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটছে, প্রশ্ন করলে কেউ কানই করে না, কান করলেও যথেচ্ছ একটা উত্তর দিয়ে কেটে পড়ে। এমন বিপাকেও মানুষে পড়ে।

শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে সুরেশ্বর বলে, 'আজ আর হবে না অভিমন্যুদা, কাল সকালে স্টুডিওয় ফোন্ ক'রে যা হয় হবে। একে আমাদের ওখানেই নিয়ে যাওয়া যাক্, ক্ষিদে-টিদেও তো পেয়ে গেছে বেচারার।'

চঞ্চলা সবেগে ব'লে ওঠে, 'ক্ষিদে পায়নি।'

'আহা, তোমার না পাক্, আমাদের তো পেয়েছে। খিদেয় মাথা ঘুরছে আমার।'

এতো বড়ো লোকটার—এ হেন ছেলেমানুষী কথায় চঞ্চলা হঠাৎ হেসে ফ্যালে, অভিমন্যু এক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তবে চলো তাই। আর তো কোনো উপায়ও দেখছি না।'

হোটেল অভিমুখে চলতে-চলতে অভিমন্যুর এই কথাই মনে হতে থাকে, তার সঙ্গে মঞ্জরীর সম্পর্ক যেন শুধু বিপদে ফেলারই সম্পর্ক। অভিমন্যুর ভাগ্যবিধাতা কি অদ্ভুত কৌতুকপ্রিয়!

ভাবতে-ভাবতে খেইহারা চিন্তা কোথায় ছড়িয়ে পড়ে।

মঞ্জরী কি এখনো তাকে মনের মধ্যে স্বীকার করে? নাহ'লে অমন ভুতে তাড়া খাওয়ার মতো—দিশেহারা হয়ে পালালো কেন?

মঞ্জরীর না-কি আজকাল নানা দুর্নাম, সে না-কি বড্ডো বেহায়া, বড্ডো বাচাল, আর বড্ডো না-কি অর্থলিপ্সু! এ মঞ্জরী, কোন্ মঞ্জরী?

অন্ধকারে অভিমন্যুর ছায়া দেখে যে ছুটে পালালো, সে?

* * *

ভুতাহতের মতো যে পালিয়ে এসেছিলো' সে-যে কেমন ক'রে ট্যাক্সি থেকে থেকে নেবে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে এসে ব'সে পড়লো, নিজেই জানে না সে। অনেকক্ষণ লাগলো উত্তাল বক্ষস্পন্দন স্থির হতে। কিন্তু তারপর?

তারপর সুরু হলো পাগলের মতো ছটফটানি।

এ-কী ক'রে বসলো সে? চঞ্চলাকে একা ফেলে পালিয়ে এলো!

এ-কী বোকামি! এ-কী দুর্বলতা! কেন সে এমন দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে বসলো? কেন নিতান্ত অবহেলায় অভিমন্যুকে গ্রাহ্য না ক'রে চঞ্চলাকে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়ীতে এসে উঠলো না?

অভিমন্যু যেমন পরম অবহেলায় মঞ্জরীর জীবনটাকে ধূলোয় ছড়িয়ে দিয়েছে, মঞ্জরী কেন তেমনি করে অভিমন্যুর সামনে গাড়ীর চাকার ধূলো উড়িয়ে দিয়ে চলে এলো না?

নিজেকে নিজে মারতে ইচ্ছা করে মঞ্জরীর। আবার অভিমন্যুর সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত দর্শন-লাভের সুযোগটুকু নিতান্ত নির্বোধের মতো হারিয়ে ফেলে সমস্ত প্রাণ যতো হায়-হায় করতে থাকে, ততো ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে চঞ্চলার জন্যে!

এ-কী দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ ক'রে বসলো সে?

তবু সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত গ্লানি রক্তের কোষে-কোষে রক্তধারায় উন্মাদ নর্তকের সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরালে বাজতে থাকে অতি মধুর, অতি কোমল একটি প্রত্যাশার সুর। এই রাত্রিবেলা চঞ্চলাকে সমুদ্রতীরে বালুবেলায় একা ফেলে রেখে চলে যাওয়া কি অভিমন্যুর পক্ষে সম্ভব হবে? তাকে তার জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে না নিয়ে পারবে অভিমন্যু?

চঞ্চলা এমন বোকা যে, বাড়ির ঠিকানাটা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও নেই তার, এ-কথা মঞ্জরী ভাবতে পারে না। রাত্রি যতো বাড়তে থাকে, ততোই ভয়ে ভাবনায় রক্ত হিম হয়ে আসতে থাকে তার।

এ সবটাই ভুল নয় তো?

চঞ্চলাই দেখছিলো, বুদ্ধিহীন-কাণ্ডজ্ঞানহীন চঞ্চলা। মঞ্জরী নিজে তেমন স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলো কি? সে-কি সত্যিই অভিনন্যু?

দেখছিলো বৈকি। হোক্ এক মুহূর্তের জন্য, তবু দেখেছিলো নির্ভুল স্পষ্ট —চঞ্চলার আহ্বানে হঠাৎ যখন মুখ ফিরিয়েছিলো অভিমন্যু।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষের নিশ্চিত বিশ্বাসের মুল কখন শিথিল হয়ে আসে, নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে মঞ্জরী। আপন হৃদয়তত্ত্ব কোন্ ফাঁকে বিস্মৃত হয়ে যায়, শুধু উত্তরোত্তর একটা ভয়ঙ্কর ভয় দাঁতালো জন্তুর মতো ক্রমশঃ গ্রাস ক'রে ফেলে তাকে।

এতক্ষণ আশার যে ক্ষীণ সুরটি সমস্ত দুর্ভাবনার তলায়-তলায় বেজে চলেছিলো, সে সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে, অথচ কোনো দিশে পাচ্ছে না। আবার যাবে ট্যাক্সি নিয়ে সেই পরিত্যক্ত জায়গাটায়? হয়তো দেখতে সমস্ত ভ্রমণ-

বিলাসীরাই যে যার আপন-আপন জায়গায় ফিরে গেছে, চঞ্চলা সেই নির্জন সমুদ্রসৈকতে একা ব'সে কাঁদছে। কিন্তু কতো রাত এখন ?

সাড়ে বারোটা না ? মঞ্জরী যাবে এখন ? একা ? আর পৃথিবীটা কি শুকদেবের আশ্রম ? সেখানে দুপুর রাতে লোকচক্ষুহীন নির্জনতায় ষোলো বৎসরের এক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে একা ব'সে কাঁদবার অবকাশ পায় ?

ক্রমশঃ মনের সমস্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে মঞ্জরী। ওর মনে হতে থাকে, চঞ্চলাকে ও বাঘের খাঁচায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে। এসেছে কেবলমাত্র একটা মূঢ় ভয়ে। অভিমন্যুকে দেখেনি মঞ্জরী। না—না, অসম্ভব। অভিমন্যু সেখানে আসতেই পারে না। চঞ্চলার দৃষ্টিভ্রম না মঞ্জরীর দৃষ্টিভ্রম।

তবে তখন কি করবে মঞ্জরী ? চঞ্চলাকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকবে ? একান্তভাবে মঞ্জরীকে নির্ভর ক'রে যে বুদ্ধিহীন মেয়েটা সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, মঞ্জরীর বুদ্ধিহীনতাও যার জন্য ষোলো আনা দায়ী—সেই চঞ্চলাকে হয়তো বন্যপশুতে—

শিউরে চীৎকার ক'রে উঠতে গিয়ে থেমে যায় মঞ্জরী। ভাবে উঠে গিয়ে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বিবৃত ক'রে পরামর্শ চায়, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারে না। কি বিবৃতি দেবে ? ভুলক্রমে চঞ্চলাকে ফেলে এসেছে মঞ্জরী ? তারপর নিজের ভয়ে তাকে আনবার চেষ্টা করেনি ? এর বেশী কি বলবার আছে মঞ্জরীর ?

শেষ পর্যন্ত হয়তো অজ্ঞানই হয়ে পড়তো মঞ্জরী, হয়তো পাগলের মতো ছুটোছুটিই করতো, কিন্তু সহসা চম্‌কে উঠলো নন্দপ্রকাশজীর গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে। গম্ভীর গলায় তিনি 'মঞ্জী বহিন'কে ডাক দিচ্ছেন।

ধড়মড় ক'রে উঠে দরজার কাছে এতে দাঁড়ালো মঞ্জরী, একটা অজানিত ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে। নন্দ-গৃহিণী খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালো, চঞ্চলা তার যে আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছে, তাঁরা নন্দপ্রকাশজীর নম্বরে ফোন্ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়ায় রাত হয়ে গেছে ব'লে ও আজ সেখানেই রয়ে গেলো, কাল সকালে আসবে। রাত বহুত হয়েছে, এতো রাতে চাকর-বাকরকে দিয়ে খবর দেওয়াটা অসভ্যতা, বিবেচনায় বাধ্য হয়ে তাঁকেই আসতে হলো।

সংবাদটুকু এবং মন্তব্যটুকু নিবেদন ক'রে মহীয়সী ভঙ্গিমায় চলে গেলেন তিনি, আর মঞ্জরী শুধু অস্ফুটে একবার 'ভগবান' বলে দরজার কাছ থেকে স'রে এসে দু'হাতে বুকটা চেপে ব'সে পড়লো।

বুকের মধ্যে এ-কী দুরন্ত যন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা কি আনন্দের ? কিসের আনন্দ, যা যন্ত্রণার মতো মোচর দিয়ে নিজের আবির্ভাব জানায় ?

চঞ্চলার নিরাপত্তার সংবাদের আনন্দ? না 'ভগবান আছেন' এই এই চিন্তার আনন্দ? বা অভিমন্যু ফোন্ ক'রে 'মঞ্জরী দেবী'র কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন এই আনন্দ?

অভিমন্যু তো খবর না দিয়ে মঞ্জরীকে জব্দ ক'রে নৃশংস আনন্দ উপভোগ করতে পারতো ঃ অভিমন্যু তো চঞ্চলাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুনীতিকে দিয়ে মঞ্জরীর নামে মেয়েচুরির মামলা তুলতে পারতো? অভিমন্যু তো চঞ্চলাকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেক কিছু অনিষ্ট করতে পারতো মঞ্জরীর।

কিন্তু না। অভিমন্যু তা করেনি। সে মঞ্জরীর একান্ত প্রিয় প্রাণীটিকে সযত্নে সমাদরে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেছে মঞ্জরী আবার দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ব'লে তাকে খবর পাঠিয়েছে!

বারে-বারে অভিমন্যুই কি শুধু জিতে যাবে তাহ'লে?

মঞ্জরীর কি বারে-বারেই পরাজয় ঘটবে?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই অভিমন্যুই বলে, চঞ্চলা, ইতিমধ্যে তো তোমার সুরে-শ্বরদার সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে ফেলেছো দেখছি, আর তাহ'লে ওর সঙ্গে বাড়ী যেতেও আপত্তি হবে না?'

চঞ্চলা সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হাসি হাসে। বাস্তবিকই গতরাত্রে আহারের টেবিলে এবং আজ এই সকালের মধ্যে সুরেশ্বরকে যেন তার অভিমন্যুর চাইতেও অধিক পরিচিত আত্মীয় ব'লে মনে হচ্ছে। সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'আমাদের কিছুতেই আপত্তি নেই, ওটা এখন আপনারই ব্যাপার।'

'যাক, সেটা তো তাহ'লে জেনেই নিয়েছো দেখছি।'

অভিমন্যু চেয়ার থেকে উঠে ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ্বরও পিছু-পিছু উঠে আসে। তেমনি গম্ভীরভাবে বলে 'অভিমন্যুদা মাঝে-মাঝে মনে হতো আপনি দেবতুল্য ব্যক্তি, সে ভুল ভাঙলো।'

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'ভুল ধারণা যত ভাঙে, ততোই মঙ্গল।'

'এখন দেখছি আপনি একটি পাষণ্ড!'

'জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া আরও মঙ্গল।'

'ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। ছি—ছি! চঞ্চলার কাছে শুনে আমি আমি অবাক হয়ে গেছি। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আপনি দিব্যি 'মরা' ব'লে চালিয়ে আসছিলেন?

অভিমন্যু মুখের হাসি প্রায় তেমনি বজায় রেখে বলে, 'অনেক সময় মৃত্যুরই নানারকম রূপ থাকে সুরেশ্বর!'

'হুঁ! তিনি আপনার কাছে মৃত বলতে চান তো? কিন্তু কেন?'

'চঞ্চলা যখন তোমার কাছে তার মনের দরজা খুলেছে, তখন সব খবরই দিয়েছে আশা করছি!'

সুরেশ্বরও এবার হেসে ফেলে বলে, 'তা অবশ্য দিয়েছে। ওর বান্ধবীর দাদা সিনেমা এ্যাকট্রেস ছাড়া বিয়ে করবে না বলেই বেচারা তার মাসীমার অঞ্চলপ্রান্ত ধ'রে সিনেমা এ্যাকট্রেসের কারখানায় এসে হাজির হয়েছে, তা ও জানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কথা তো-তা নয়। বৌদিকে আপনার ত্যাগ করার কোনো মানে হয় না! সিনেমা করা, জলসায় গান করা বা বেতারে বক্তৃতা করা, এগুলো তো এ-যুগে এক পর্যায়ের জিনিস, এর জন্যে আপনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন? ছিঃ! আপনি যে এতো গোঁড়া, এতো সেকেলে, তা ভাবাই যায় না।'

'ছাখো সুরেশ্বর'—অভিমন্যু ম্লান গম্ভীরভাবে বলে, 'সমস্ত কর্মদেহের মধ্যেই সূক্ষ্ম একটি কারণ-রূপ আত্মা থাকে, বুঝলে? যেটা আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখা যায় না কিন্তু চঞ্চলার ব্যাপারটা শুনে তাজ্জব লাগছে যে? ওটা আবার কি?'

'ওটা?' সুরেশ্বর মুচ্‌কে হাসে, 'ওটা বোধকরি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন! আপনাদের মতো লোকের জন্যে।'

'সে চীজ্‌টি কোথায়?'

'সে কলকাতায়। তাতে কি? সে-সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন শুধু মাসীমার খোসামোদ ক'রে-টরে এ্যাকট্রেস হতে পারলেই,...কিন্তু শুনছি মাসীর তেমন গা নেই। সে যাক, আমি কিন্তু ঠিক বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসবো—'

অভিমন্যু ব্যাল্‌কনির ওপর থেকে জনাকীর্ণ পথের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, 'পাগলামী করো না সুরেশ্বর!'

সুরেশ্বর এ দৃঢ়তায় টলে না, ততোধিক দৃঢ়স্বরে বলে, 'পাগলামী আপনিই ক'রে চলেছেন অভিমন্যুদা! পৃথিবীকে আজও আপনি পুরনো চশমায় দেখছেন। পৃথিবী বদলাচ্ছে, সমাজ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে জীবনের রীতি-নীতি সংস্কার। পুরনো খুঁটি আগ্‌লে ব'সে থাকাটা পাগলামী ছাড়া আর কি? আপনি বারণ করলেও আমি ভয় খাবো না, আমি ঠিক গিয়ে আলাপ ক'রে আসবো।'

আকর্ষণটা চঞ্চলার জন্য নয় তো ?'

সুরেশ্বরও দমবার ছেলে নয়, সেও সমান তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'অসম্ভব কি ? সত্যি বলতে, আমি তো শুধু ওর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ শুনে মুগ্ধ-চমৎকৃত হয়ে গেছি। যে মেয়ে প্রেমাষ্পদের উপযুক্ত হবার সাধনায় এতোবড় মূল্য দিতে প্রস্তুত, সে মেয়ে দুর্লভ মেয়ে নয়। হয়তো এটা ওর হাস্যকর ছেলেমানুষী, হয়তো প্রেমাষ্পদটি একটি হনুমান-বিশেষ, কিন্তু ওর নিষ্ঠারমূল্যও কম নয়।'

'সুসংবাদ!' ব'লে ঘরে ফিরেই অভিমন্যু বলে, 'চঞ্চলা, চলো তাহ'লে ?'

'আপনি যাবেন ?' উৎফুল্ল আনন্দে বলে চঞ্চলা।

'তাই ভাবছি। সুরেশ্বর যাচ্ছো তো ?'

সুরেশ্বর অভিমন্যুর এই সাহস মতি পরিবর্তনের আশ্চর্য হলেও সেটা প্রকাশ করে না, উদাসভাবে বলে, 'সবাই মিলে যাবার দরকার কি ?'

'বাঃ, বাড়ীটা চেনাও তো দরকার ?'

'কি জন্যে ?'

'বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে!'

'নাঃ!'

'কেন, হঠাৎ সংকল্পের পরিবর্তন যে ?'

'সে-তো সকলেরই হচ্ছে।'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা সত্যি, ওটা হঠাৎই হলো। কি জানো সুরেশ্বর, রাতের অন্ধকারে মানুষ কেমন দুর্বল হয়ে যায়। সকালের আলোয় একটু সাহস অনুভব করছি। মনে হচ্ছে—এই লুকোচুরি, এই পালিয়ে বেড়ানো, এটা যেন হাস্যকর ছেলেমানুষী।'

সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে কাছে এসে বলে, 'আমিও তাই বলছি অভিমন্যুদা! দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশঃই সহজ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। হয়তো একবার দেখা হলেই দেখবেন সব সহজ হয়ে গেছে। জীবন জিনিসটা কি এতোই সস্তা অভিমন্যুদা, যে ইচ্ছেমত অপচয় করা চলে ?'

শেষ পর্যন্ত তিনজনেই। পথে গাড়ী দাঁড় করিয়ে অভিমন্যু চঞ্চলাকে খুশীমত বাছতে দিয়ে দামী শাড়ী কিনে দিলো একটা। সুরেশ্বর বিনা দ্বিধায় কিনে বসলো একগাদা চকোলেট, ট্রফি, চুলের রিবন আর পাউডার কেস্। নেপথ্যে অভিমন্যু বলে, 'কি-হে ভায়া, শেষ অবধি প্রেমেই প'ড়ে যাচ্ছো না-তো ? আমার সন্দেহ হচ্ছে যে ?'

'কিন্তু সেই হতভাগ্য হনুমান-বিশেষের উপায় ?'

'কদলীফলের অভাব নেই দেশে'—স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসে সুরেশ্বর।

মঞ্জরীর বাড়ীর দরজায় এসেই কিন্তু দুই বন্ধুরই সাহস অবলুপ্ত।

গাড়ীতে ব'সে থেকেই এরা চঞ্চলাকে নামিয়ে দেয়।

দুই হাতে উপহারের বোঝা বুকের কাছে জড়ো ক'রে ধ'রে রেখে চঞ্চলা বিষণ্ণভাবে অথচ সাগ্রহে বলে, 'নামবেন না আপনারা ?'

'নাঃ, কাজ আছে আজ।'

গাড়ী চলে যাবার পরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে চঞ্চলা। ওর হঠাৎ মনে হয়, ও যেন একটা দিন স্বর্গে কাটিয়ে, ফের মাটিতে পৃথিবীর-বুকচাপা অন্ধকারে নেমে এলো। একদিনের মনের রং এমনি বদলে যায় ? কলকাতার বান্ধবীর দাদা রসাতলে যাক্, সদ্যদেখা দেব-দূতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে চঞ্চলা। আর দুঃসাহসী মেয়েটা এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার ক'রে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে সুরেশ্বরদের হোটেলের নম্বর সংগ্রহ ক'রে ফোন্ করতে বসে। সুবিধে পেলেই বসে! সুরু হয় কথার খেলা। কারুকার্যহীন সহজ কথা, তবু আগ্রহটা সহজ নয়। কাটে কয়েকটা দিন।

❁ ❁ ❁

'ছোটমাসী!'

মঞ্জরী জানালার কাছে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে ব'সে কি-যে ভাবছিলো কে জানে, চঞ্চলাকে বললে, 'কি-রে ?'

চঞ্চলার আগের চঞ্চল মূর্তি এখানে এসে পর্যন্তই নেই, আবার সেদিনের ঘটনার পর থেকে আরো যেন স্থির নীরব হয়ে গেছে।

সুরেশ্বরদা ফোন্ ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন, 'এখানে আসবেন ?'

মঞ্জরী অবশ্য চঞ্চলার মুখে সেদিনের ঘটনা সবই শুনেছে, চঞ্চলার সদ্যপ্রাপ্ত 'দাদা'র গুণবর্ণনাও শুনেছে' উপহার সামগ্রী দেখেও তারিফ করেছে, তবু বলতে পারেনি, 'সে-কি রে ভদ্রলোককে একদিন আসতে বললি না কেন ?' কি ক'রে বলবে ? তাঁর সঙ্গে যে আর-একটা অদ্ভুত অনাসৃষ্টি জড়িত। সেখানে সাধারণ ভদ্রতার প্রশ্ন অবান্তর। তাই আজ আশ্চর্য হয়ে বলে, 'ফোন্ ক'রে জানতে চাইছেন মানে ?'

'বলছেন, এলে তুমি রাগ করবে কি-না ?'

'রাগ ? রাগ করবো কি-না ?'

'তবে ব'লে দিইগে—' বলেই ঈষৎ থতমত খেয়ে চঞ্চলা বলে, 'সুরেশ্বরদা

বলছিলেন এক জায়গায় বেড়াতে যাবেন, তাই—ইয়ে—আমাকে নিয়ে যাবেন—'

মঞ্জরী গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'বেড়াতে নিয়ে যাবেন? কোথায়?'

'তা জানি না!'

'আচ্ছা, ওকে আসতে তো বল্। কথা ব'লে বুঝে দেখি।'

চঞ্চলা ছুটে যায়। মঞ্জরী ওর দিকে তাকিয়ে একটু কৌতুহলের হাসি-হাসে। সে কৌতুকে ব্যথা মিশানো। ছেলেমানুষ! মন এখনো দানা বাঁধেনি! যাকে দেখে, তাকেই ভালো লাগে! জানে না পৃথিবী কি জায়গা! কিন্তু কে এই সুরেশ্বর, অভিমন্যুর এমন প্রিয়বন্ধু হয়ে উঠেছে? অভিমন্যুর যে-জীবনে মঞ্জরী ছিলো, সেখানে এ নামের বাষ্প তো শোনেনি। খানিকটা প'রে চঞ্চলা এলো, খুশীতে টলমল মুখ, আবেগ ছলছল চোখ। বললে, 'বললেন, এখুনি আসছেন।'

মঞ্জরী প্রশ্ন করতে পারলো না, 'একাই আসছেন তো?' মুখে আসছিলো। প্রশ্নটা তবুও না। ও জায়গাটা যেন একটা স্তূপীকৃত অন্ধকারের বোঝা। লজ্জার অন্ধকার, বেদনার অন্ধকার, অপমানের অন্ধকার। ওখানে হাত দিতে সাহস হয় না। থাক্ ওই ডেলা পাকানো অন্ধকারখানা··· হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গেলেই হয়তো দাঁত খিচিয়ে কামড় দিতে আসবে মঞ্জরীকে।

উদ্যত প্রশ্ন থামিয়ে মঞ্জরী বরং মৃদুহাস্যে বলে, 'একবেলার আলাপেই তার সেই সুরেশ্বরদার সঙ্গে দারুণ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।

চঞ্চলার মুখটা শুধু লাল হয়ে ওঠে। বলতে ভুলে যায়, কী বিপদের সময় উপকার করেছিলো ওরা! সেদিন চঞ্চলার খুশীর আতিশয্যে মঞ্জরীর বিসদৃশ ব্যবহারের এটুত্ব আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার গুরুত্ব যেন হাল্কা হয়ে গিয়েছিলো।

ও চলে যায়। আর মঞ্জরী শাণিতবুদ্ধি তীক্ষ্ণধার দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে—এ শুধু সুরেশ্বরের চঞ্চলার প্রতি আকর্ষণ মাত্র, না এ আর কারোর ছল? কে জানে এর সবটাই পরিকল্পিত কি-না!

নইলে এতো দেশ থাকতে অভিমন্যুর কি দরকার পড়েছিলো এদেশে আসতে? আবার সান্ধ্যভ্রমণের জায়গা নির্বাচনেও সেই সন্দেহের অবকাশ! এ-কি শুধুই দৈবের ঘটনা?

কিন্তু তাই যদি হয়—যদি অপরিকল্পিতই হয়, কেন?

সুনীতির চর হয়ে যদি চঞ্চলাকে উদ্ধার করতে এসে থাকে অভিমন্যু, তবে তাকে হাতে পেয়ে আবার ফিরিয়ে দিলো কেন?

রাগের শিরা ছু'টো দপ্-দপ্ ক'রে ওঠে, মুখের গড়ন কঠিন হয়ে আসে। তাহ'লে কি বনলতার জীবনের অভিজ্ঞতাই মঞ্জরীর কাজে লাগতে সুরু করেছে এইবার ?

যে ধারণায় প'ড়ে মঞ্জরী কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছে, সর্বনাশের কবলে প'ড়ে নিজেকে ধ্বংস করেছে, মঞ্জরীর সেই ধারণাটাই সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ? অর্থই সব ? অর্থই আবরণ ? অর্থের আবরণেই সমস্ত কলঙ্ক চাপা পড়ে যায় ? আর বনলতার অর্জিত সেই সত্য ?

"জীবনে কোনোখানে কোথাও খানিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেই অনেক কলঙ্ক সত্বেও লোকে তোমায় সম্ভ্রম করতে সুরু করবে।"

সেও এবার প্রমাণিত হবে নাকি ?

সহায়সম্বলহীনা মঞ্জরীকে অভিমন্যু অপমান করতে পেরেছিলো, পেরেছিলো অগ্রাহ্য করতে, আজ পারছে না। আজ যশ-অর্থ আর প্রতিষ্ঠায় সিংহাসনরূঢ়া মঞ্জরীকে সে বুঝি নতুন ক'রে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে চায়। তাই এই ছল, এই দূত প্রেরণ। দূতের পিছনে নিজেও আছে নিশ্চয়ই। সন্দেহ নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

মনে পড়লো, বনলতার সেই তীক্ষ্ণ শ্লেষ, "অনেক টাকা নিয়ে কি করবি ? ত্যাগ ক'রে আসা স্বামীকে ফের টাকা দিয়ে কিনবি নাকি ?"

চেষ্টা ক'রে কিনতে হচ্ছে না, নিজেই সেই পতঙ্গ আপনাকে বিকিয়ে দিতে এসেছে। কিন্তু মঞ্জরীর তো নিজেকে বিকিয়ে দেবার বাসনা নেই, সে উপায়ও নেই। অতএব মঞ্জরীকে শক্ত হতে হবে।

অভিমন্যু যদি আসে মুগ্ধমন্ত্রে তোসামোদ করতে, মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে মঞ্জরীকে। অভিমন্যু যদি আসে মঞ্জরীর টাকার উপর লুব্ধদৃষ্টি হানতে, তাহ'লে মঞ্জরী ছু'হাতে সে-টাকা ছড়িয়ে দেবে তার মুখের উপর সে হবে উচিত উত্তর।

ভাবতে-ভাবতে এক জায়গায় থমকে যায়, অভিমন্যু কি তেমন ? ভাবতে গিয়ে আর-একটা মনস্তত্ব কাজ করে! নিজের মধ্যে যখন জমে ওঠে অপরাধের বোঝা তখন সে বোঝা হালকা করতে প্রাণপণে অপরের পাল্লায় অপরাধের বোঝা, চাপিয়ে চলে। হয়তো সে বোঝা আপন বিকৃতদৃষ্টির বিকারে গড়া কল্পিত অপরাধের। এ নইলে মানুষ বাঁচতোই বা কি ক'রে ? অপরাধভারে ভারাক্রান্ত সেই মনকে নিয়ে সংসার চলতোই বা কি ক'রে ?

তাই যে দোষ করেনি অভিমন্যু, যে-দোষ করা তার পক্ষে সম্ভব কি-না ঠিক নেই, মনে-মনে অভিমন্যুর সেই দোষের উচিত শাস্তি তৈরী করতে থাকে মঞ্জরী। অভিমন্যু 'তেমন' নয়, তাই বা বলা যায় কিসে ? চিরদিন তো সে

আরামপ্রিয়, আয়াসী, আত্মমর্যাদাবোধহীন। নইলে দাদারা যখন নতুন প্রাসাদ তৈরী ক'রে শহরের বুকে জাঁকিয়ে বসলো, অভিমন্যু কি-না তখন তাঁদের প্রাসাদস্বরূপ বাবার আমলের ভাঙা বাড়ীখানা নিয়ে কৃতার্থ হয়ে প'ড়ে থাকলো? পূর্ণিমাদেবী অন্য ছেলেদের দেওয়া হাত খরচের টাকা অভিমন্যুর সংসারে খরচ করেছেন, অভিমন্যু অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে সে ব্যবস্থা। তবে?

ভাবতে-ভাবত ক্রমশঃই মনে হতে থাকে—অভিমন্যু এক নম্বরের নীচ, স্বার্থপর আর লোভী। আরাম-আয়েসই ওর জীবনের কাম্য। তাই কোন-দিনই কৃতিত্বের শিখর চূড়ায় উঠবার তাগিদে জীবন যুদ্ধে নামলো না। শিস্ দিয়ে গান গেয়ে জীবন কাটাতে পারাই তার চরম লক্ষ্য। অতএব এখন সে অনায়াসেই মঞ্জরীর স্তাবক হতে পারে!'

এই চিন্তার দুরন্ত তাড়নায় দেহের রক্ত যখন পা থেকে মাথা অবধি ছুটোছুটি করছে, তখন এলো সুরেশ্বর। নিখুঁত পোষাকে ভূষিত দীর্ঘদেহী সুকান্ত যুবা। এসেই হাত জোড় ক'রে সহাস্যে ব'লে ওঠে, 'আগে থেকে অভয় নিয়ে এসেছি, আর রাগ করতে পারবেন না।'

মঞ্জরী প্রতি নমস্কার ক'রে গম্ভীরভাবে বলে, 'খামোকা রাগই বা করতে যাবো কেন?'

'কেন নয়? আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়ে দিতে এলাম। তবে ভয় নেই বেশীক্ষণ জ্বালাতন করবো না, অনুমতি চাইতে এসেছি, চঞ্চলাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবার।'

মঞ্জরী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'প্রার্থনাটা কার?'

'কার আবার? আমারই। অপরের বেনামীতে কোনো কাজ করা আমার ধাতে নেই।'

মঞ্জরী আরো তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'আমি অভিনেত্রী, আমার রীতি-নীতি নয় আলাদা, কিন্তু আপনি তো বাঙালীর ছেলে, এ আবেদনটা সঙ্গত কি-না বলুন!'

মনে করেছিলো, এ অপমানে জোঁকের মুখে নুন পড়বে। এ অপমানে মুখ কালো ক'রে ফিরে যাবে অভিমন্যুর সোহাগের বন্ধু। কিন্তু মঞ্জরীকে অবাক ক'রে দিয়ে লোকটা কি-না হেসে উঠলো! হাসির শব্দে চমকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরী, দেখে লজ্জায় মরে গেল। কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি সরল হাসি!

এ হাসি যেন কোন স্বর্গের জিনিস! এ হাসি যে হাসতে পারে, তার মধ্যে বোধকরি মালিন্যের লেশও থাকতে পারে না।

সেই হাসি হেসে সুরেশ্বর ব'লে উঠলো, 'বলেছেন ঠিকই, সঙ্গত নয়। কিন্তু এ কেসটা আলাদা। চঞ্চলাকে আমি বিয়ে করবো, কাজেই আমার সঙ্গে একে—

'চমৎকার!' মঞ্জরী তিক্ত বিদ্রূপের হাসি হেসে ব'লে ওঠে, 'চমৎকার কালনেমীর লঙ্কাভাগের নমুনা!'

'ঠাট্টা ক'রে আমায় কাবু করতে পারবেন না।' আর একবার হাসে সুরেশ্বর—'এ সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি। পাত্র হিসেবে আমি নেহাত খারাপ নই, একসময় লেখাপড়া কিছু করেছি, আবার অনেক পয়সা আছে, জাতে ব্রাহ্মণ, চেহারাও দেখছেন—নিতান্তই নিন্দের নয়, তাছাড়া—আপনার ওই বোনঝিটিই বা কি এতো রূপসী?'

মঞ্জরী ওর কথার ধরনে রাগতে ভুলে যায়। প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে কে?'

'আপনারাই। এই যে স্বয়ং ক'নের মা'র হুকুমনামা জোগাড় ক'রে ফেলেছি, এখন ক'নের মাসীর হুকুম পেলেই হয়।'

'মায়ের হুকুমনামা?'—অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জরী—

'হ্যাঁ, এই-যে দেখুন না, ইতিমধ্যে অভিমন্যুদাকে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে পত্রাঘাত করিয়ে এই উত্তরটি আদায় করতে সমর্থ হয়েছি।'

আশ্চর্য এই ছেলেটা! মঞ্জরীর সঙ্গে যেন এইমাত্র পরিচয় হয়নি ওর, যেন যুগ-যুগান্তরের আলাপ। পকেট থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে মঞ্জরীর দিকে এগিয়ে দেয় সে। সুনীতির হাতের লেখা! অভিমন্যুকে সম্বোধন ক'রে। বুকটা থরথর ক'রে ওঠে, তবু হাত এগোয় না। তবু কঠিন থাকতে হয়।

'অপরের চিঠি পড়ার অভ্যাস আমার নেই।'

'আহা 'অভ্যাস আছে' এ অপবাদ আপনাকে দিচ্ছে কে? ধরুন আমার অনুরোধ। নিন, প'ড়ে দেখুন।'

অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে লোভ, দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে কৌতূহল বাসনার আবেগে থরথর কম্পন! মরুভূমির যাত্রীর কাছে পাত্রভরা জল এনেছে সুরেশ্বর! কতদিন দিদির হাতের লেখা দেখেনি মঞ্জরী, কতদিন দেখতে পায়নি অভিমন্যুর নাম। মন্ত্রাহতের মতো হাত বাড়িয়ে নিলো, স্বপ্নাহতের মতো চোখ বুলোলো। ছোট্ট চিঠি।

সুনীতি লিখেছেন, 'ভাই অভিমন্যু তোমার চিঠিতে সব অবগত হলাম। চঞ্চলার সংবাদ আমি কানা-ঘুষায় শুনেছিলাম, কিন্তু বিচলিত হইনি। কারণ, আমি এখন আর কোনো কিছুই নিজের কর্তব্য ব'লে চিন্তা করি না। জানি,

গুরুদেবের ইচ্ছা ছাড়া পথ নেই। তুমি যে পাত্রকে সুপাত্র বলেছো, তার সম্বন্ধে আমার আর বলবার কিছু নেই। পথভ্রষ্ট অবোধ মেয়েটাকে তিনি যদি দয়া ক'রে তার পায়ে স্থানে দেন, সেও গুরুদেবের কৃপা বলেই জানবো। আশীর্বাদ নিও। ইতি—

তোমাদের বড়দি

না, মঞ্জরীর নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই! গুরুকৃপালাভে ধন্য ব্যক্তিদের পক্ষে মমতাশূন্য হওয়া নিন্দনীয় নয়। হয়তো বা প্রশংসানীয়ই!

চিঠিখানা মালিকের হাতে ফেরত দিয়ে মঞ্জরী কেমন যেন ক্লান্তস্বরে বলে, 'আকস্মিক এ খেয়ালটা কখন হলো আপনার?'

'কোন্‌টা? এই বিয়েটা? খেয়াল নয়, খেয়াল নয়, সংকল্প। যেদিন ওকে দেখলাম সেইদিনই!'

'আশ্চর্য! ওর কি বিয়ের বয়েস রয়েছে?'

'হয়েছে কিনা, সে উত্তর তো আপনি নিজে সর্বপ্রথম দিয়েছেন?'

বলেই সুরেশ্বর হেসে ওঠে। মঞ্জরীর মনে প'ড়ে যায়, সর্বপ্রমেই সে চঞ্চলাকে সুরেশ্বরের অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলেছিলো।

'আমার কাছে আপনার প্রস্তাবটা ঝড়ের মতোই আকস্মিক। যাক্ ক'নের প্রকৃত অভিভাবকের সম্মতি যখন পেয়েই গেছেন, তখন আমার আর কি বলবার আছে?'

'উহুঁ? ও ভাষা নয়, আপনার প্রসন্ন সম্মতি চাই।'

মঞ্জরী সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠলো', আর সেইজন্যই রূঢ় হয়ে উঠলো। বললো, 'আপনার সম্বন্ধে আমার এমন বেশী জ্ঞান নেই, যাতে ওটা দেওয়া যায়। বরং যে-কোনো একটা মেয়েকে একবার দেখেই তার প্রেমে পড়ার অভ্যাসকে আমি ডিস্‌কোয়ালিফিকেশানই মনে করি।'

'সর্বনাশ! এটা আমার অভ্যেস ব'লে মনে করেছেন না-কি? তা নয়, তা নয়! শুনুন—এ যাবৎ মনের মতন মেয়ে একটিও পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ ওকে দেখেই মনে হলো, এই সেই মেয়ে! একেই বিয়ে ক'রে ফেলা যাক। আমার মতে, বিয়ে করতে সেই মেয়েই ঠিক, যার মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম, আর আবেগের ভাগ বেশী। যে মেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ধারালো ছুরি দিয়ে রাতদিন শুধু লেনদেনের চুলচেরা হিসেব করতে থাকে, যার কাছে টাকা হৃদয়ের চাইতে দামী, সে মেয়ে আমার নমস্য, তাকে বিয়ে করার কথা আমি ভাবতেও পারি না!'

'বয়েসে চঞ্চলা আপনার অর্ধেক।'

'কী মুস্কিল! আমার ঠিকুজি-কোষ্টী আপনি দেখলেন কখন্?'

রেগে গেলো মঞ্জরী, কিছুতেই সুরেশ্বরকে রাগাতে না পেরে ক্রুদ্ধস্বর গোপন ক'রে অবহেলাভরে বললো, 'কতো বয়স আপনার ?'

'সাতাশ।'

মঞ্জরী মনে-মনে হিসেব করলো সাতাশ—চঞ্চলার ষোলো, এমন বেশী তফাৎ নয়। তখন কৌতুক বোধ করলো। বললো, 'দেখে তো মনে হয় না কে জানে, বয়েস চুরি করছেন কিনা।'

'রামোঃ! ওটা মেয়েদের একচেটে।'

'সব মেয়ের নয়।'

'সেটা ব্যতিক্রম। সত্যবাদী মহিলাদের আবার আরো কষ্ট। আমি একটি চল্লিশ বছরের মহিলাকে বয়সের হিসেব দিতে বলতে শুনেছি—উনচল্লিশ বছর সাড়ে দশমাস।'

মঞ্জরী হেসে ফেললো! পরিবেশ সৃষ্টি করবার সুরেশ্বরের ক্ষমতা অদ্ভুত। মঞ্জরী ভুলেই গেলো ও কে, কেন এসেছে! তর্কের সুরে বললো, 'আপনি বড্ডো বাজে কথা বলেন, এটা নিশ্চয় বানানো!'

'বিশ্বাস না করেন নাচার। এ-রকম অনেক 'সত্য গল্প' আমার স্টকে আছে। আর একদিন এসে হবে, আজ যদি অনুমতি করেন চঞ্চলাকে নিয়ে যাবার—'

সুরেশ্বরের হাতে সুনীতির লেখা ছাড়পত্র। মঞ্জরী বাধা দিতে যাবে কোন্ ধৃষ্টতায়? তাছাড়া—হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলো—অভিমন্যুর প্রেরিত চর ভেবে সুরেশ্বরের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাবটা ছিলো, সেটা কখন্ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চঞ্চলাকে ঝোঁকের মাথায় এনে ফেলে পর্যন্ত মনে শান্তি ছিলো না একতিল, ভেবে পাচ্ছিলো না ওকে নিয়ে অবশেষে কি করবে। চঞ্চলার প্রার্থিত অভিনেত্রী জীবনের পথে এগিয়ে দেবার কথা তো ভাবতেই পারে না মঞ্জরী। তবে এই ভালো। এই হোক্! এটা যদি সবটাই অভিমন্যুর পরিকল্পিত ব্যাপার হয়, তাও হোক্। অভিমন্যুই জিতে যাক্। তবু সেখানে অভিমন্যু আছে, সেখানে নিশ্চিন্ততার শান্তি আছে! চঞ্চলার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে মঞ্জরী নিজেকে নিয়ে যা খুশি করবে। রসাতলেই যখন যেতে বসেছে, তখন নিরঙ্কুশ গতিতেই যাবে! তারপর?

বনলতার মতো প্রচুর টাকা নিয়ে পুরনো পরিবেশের আশে-পাশে গিয়ে দু'হাতে হরির লুঠ দেবে সেই টাকা। দেখবে, তার পুরনো আত্মীয়-বন্ধুরা তাকে কোথায় বসতে দেবে ভেবে দিশেহারা হয় কি না!

লজ্জা আর আনন্দের আবীর-ছড়ানো মুখ নিয়ে আর নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে নিয়ে চঞ্চলা চলে গেলো সুরেশ্বরের সঙ্গে। কেমন যেন দিশেহারার

মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মঞ্জরী। সামান্য ক'টা দিনের মধ্যে কতো অভাবিত ঘটনাই ঘটে গেলো! অভিমন্যুর দেখা পাওয়া গেলো, চঞ্চলা পথে হারিয়ে গেলো, আবার সেই হারানোর সূত্র ধ'রে চঞ্চলার জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এক নতুন অধ্যায় যোজনা-অচেনা এক ব্যক্তি যেন চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল চঞ্চলাকে—মঞ্জরী প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেলো! এ কী অঘটন! কিন্তু আরো কত অভাবিত ঘটনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সে কথা কি মঞ্জরী ভাবতে পারছে?

সত্যিকার মানুষের সত্যিকার জীবনকাহিনী যে রংচড়া উপন্যাসের চাইতেও চড়ারঙের হতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করে ক'জন? উপন্যাসের কাহিনীতে অভাবনীয়ের সমাবেশ দেখলেই মুচ্‌কি হেসে বলে—'কষ্টকল্পনা', বলে—'যথেষ্ট ঘটনা বিন্যাস।'

চঞ্চলা ফিরে এলো খুশীতে টলমল হয়ে!

'বেড়াতে যাওয়া-টাওয়া নয় ছোটমাসী, মার্কেটিং করতে যাওয়া হয়েছিলো! তত্ত্বর জিনিসগুলো যাতে আমার পছন্দসই হয়—'

ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলে লজ্জায় চুপ ক'রে গেল চঞ্চলা।

'ওর বুঝি কেউ কোথাও নেই?' মঞ্জরীর কণ্ঠে কুটিল হিংসা।

চঞ্চলা অবশ্য এতো করতে পারে না, তেমনি লজ্জা মাখানো স্বরে বলে 'থাকবে না কেন? তাদের তো খবর দেওয়া হয়েছে? তারা নাকি আমাদের নিতে আসবে। কলকাতায়—মানে, ব্যারাকপুরে ওদের বাড়ীতেই বিয়ে হবে। তারা নাকি বলে—ও বিয়ে করলেই তারা কৃতার্থ হবে, বামুনের মেয়ে হোক চাই না হোক না হোক! আমি তো তবু—'

'তুই তো বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে—' বিষ হিংসার তিক্তস্বর মঞ্জরীর কণ্ঠে, 'এ জানতে পেলে তারা কি ঘরে নেবে?'

ভয়ে আশঙ্কায় পাংশু হয়ে গেলো চঞ্চলার খুশী টলমলে মুখটা, তেমনি ভয়ে-ভয়েই বললো, 'আমি তো শুধু তোমার সঙ্গে চলে এসেছি—'

মঞ্জরী এতো নীচ হয়ে যাচ্ছে কেন?

চঞ্চলার—তার নিতান্ত স্নেহপাত্রী বেচারী চঞ্চলার—খুশী টলমলে মুখ দেখে ওর বুকের ভিতর এমন জ্বালা ধরছে কেন? সেই জ্বালার জ্বালাতেই না ওকে আবার বলতে হচ্ছে, 'তাতে কি? আমি তো ভালো মাসী নই। আমি তো খারাপ! মদ খাই, সিনেমা করি—আমার সঙ্গে চলে আসা মানেই খারাপ হয়ে যাওয়া—নষ্ট হয়ে যাওয়া—'

চঞ্চলা এবার মুখ তুলে সবেগে বলে, 'কথ্‌খনো নয়! ও বলে, মানুষ কথ্‌খনো নষ্ট হয় না। তোমাকে ও কিন্তু ঘেন্না করে না, বলে—'

'থাক, আমাকে কি বলে তা শোনবার আমার দরকার নেই—' ব'লে ঘলে পাশের ঘরে চলে গেল মঞ্জরী। আর চলে গিয়েই ওর নিজের কাছে নিজের মনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছি-ছি, চঞ্চলাকে কি সে ঈর্ষা করছে ? চঞ্চলার জীবন সার্থক-সুন্দর হয়ে উঠছে, এতে সে খুশী হতে পারছে না। এত নীচ হয়ে গেলো মঞ্জরী ? এ-কী হলো!

অনেকক্ষণ চুপি-চুপি কান্নায় পর মঞ্জরী আবার সোজা হয়ে বসলো। চুল চেরা বিশ্লেষণ আপন মনকে যাচাই ক'রে দেখে-দেখে শান্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলো—হিংসে নয়, হিংসে নয়, এ 'মন কেমন'-এর শূন্যতা। চঞ্চলা কেবলমাত্র তার একটি স্নেহপাত্রীই নয়, চঞ্চলা যে মঞ্জরীর ফেলে আসা জীবনের—সেই পবিত্র সুন্দর সত্যিকার জীবনের—এককণা চিহ্ন, আজকের এই মূল-উৎপাটিত গ্লানিকর জীবনের মাঝখানে এক টুকরো মাটির শিকড়। সেই শিকড়টুকুও ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওরা, তাই এই হাহাকার! বিরহের আশঙ্কা তো প্রিয়পাত্রকেই আঘাত হানতে চায়।

মনে পড়লো চঞ্চলার পাংশু হয়ে যাওয়া মুখখানি, বুকটা টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। উঠে গিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললো, 'উঃ, কী মাথাটাই ধরেছে। কই রে চঞ্চলা, কি মার্কেটিং করলি শুনি ?

✻ ✻ ✻

মঞ্জরী এখানে একটি কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এসেছে, আর কারো তার উপর হাত বাড়াবার উপায় নেই, তাই কলকাতার জীবনের চাইতে এখানে অবসর বেশী, কিন্তু সে অবসর পঙ্কিল হয়ে ওঠে অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অনুরাগ-প্রাবল্যে!

ঝড়ে-ওড়া দিনগুলোর মাঝখানে একদিন হঠাৎ খবরটা ধাক্কা দিলো। চঞ্চলাকে আজ নিয়ে যাবে ওরা। সুরেশ্বরের বাড়ীর সরকার এসেছে না-কি, আর এসেছে এক বুড়ো ঝি। খবরটা সুরেশ্বরই আনলো। আরো দু'তিন দিন এসেছিলো সুরেশ্বর, দেখা হয়নি মঞ্জরীর সঙ্গে, আজ আবার এলো সকালবেলা বললে, 'অপেনার সঙ্গে আরো অনেক আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো, কিছুতেই সুবিধে হলো না, আপনি দুর্লভব্যক্তি। কিন্তু মনে করবেন না, এইখানেই ইতি! আমার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তবে এ-যাত্রায় আপনার কাছে আমার ভূমিকা দুবৃর্ত্তের। কন্যাহরণের পালায় ভিলেন।'

মঞ্জরী হাসলো। সমাদর ক'রে বসালোও। বললো, 'জীবনে দুবৃর্ত্তের ভূমিকাই অধিকাংশের ভাগ্যেই একবার জোটে।'

'সেটাই জীবনের পরীক্ষা।'

'তা হবে। বসুন, চা দিতে বলি। ওঃ না—খাবেন না তো আমার বাড়ীতে ?'

সুরেশ্বর গম্ভীরমুখের ভূমিকা না ক'রে বললো, 'শুধু চা হ'লে খাবো না, তার সঙ্গে উত্তম ফলারের আয়োজন থাকলে খেতে পারি। অবশ্য শুধু উত্তম ফলারের আয়োজন থাকলে খেতে পারি। অবশ্য শুধু উত্তম। উত্তম-মধ্যম নয়—'বলেই সে-কী হাসি।'

চোখ জুড়িয়ে যায় মঞ্জরীর, আবার আনন্দে চোখে জলও এসে যায় বুঝি—কী চমৎকার ছেলে! কি নির্মল হাসি! ছোট্ট চঞ্চলা, বোকা চঞ্চলা—সুখী হোক্, সুখী হোক্। ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলো অতিথি সৎকারের চেষ্টায়। চঞ্চলা লজ্জায় পাশের ঘরে ব'সে আছে।

খেতে-খেতে সুরেশ্বর বললো, 'এখানের মেয়াদ আর ক'দিনের ?'

'চিরদিনের হতে পারে—'মঞ্জরী উত্তর দেয়।

'অসম্ভব! বাংলার মেয়ে বাংলা ছেড়ে এখানে প'ড়ে থাকবেন কি দুঃখে ?'

'আমার কাছে বাংলা-বিহার-বোম্বাই-মধ্যপ্রদেশ সবই সমান পৃথিবীব যে-কোনো এক কোণে ঠাঁই পেলেই হলো। কিন্তু আমার কথা থাক্, আপনার কথাই শুনি। ব্যারাকপুরে বাড়ী আপনাদের ?'

হ্যাঁ! ওইখানেই বীরভদ্রে এক বাড়ী গেড়ে রেখেছেন বাবা, খোলা-মেলা ব'লে। কিন্তু যার জন্যে সকালবেলাই এলাম সেটা তো বলা হলো না! আমাদের বাড়ী থেকে পিসিমা সরকারমশাইকে আর পুরনো ঝিকে পাঠিয়েছেন ভাবী বধূকে নিয়ে যেতে। আমার মতিগতি তো তাঁরা জানেন, হঠাৎ বিয়ের সংকল্প ক'রে ফেলেছি—এতেই ভীষণ খুশী, আবার পাছে মত বদলাই, তাই এত তাড়াহুড়ো।'

'চঞ্চলাকে নিয়ে যেতে হয় তা'হলে ?'

'এখনই ?' চমকে ওঠে মঞ্জরী।

সুরেশ্বর কুণ্ঠিত হলো। লজ্জিত হয়ে বললো, 'কিন্তু আমার তো সারাদিনে আর সময় হয়ে উঠবে না—'

'গাড়ী তো সেই রাত্রে ?'

'তা অবশ্য।'

'আমি যদি ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি, আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি ? কী আশ্চর্য ? কিন্তু আপনার কি সময় হবে ?'

'সেটা আমার বিবেচ্য ? বিশ্বাস রাখতে পারবেন তো আমার উপর ?'

'বিশ্বাস মানে ?'

'ধরুন যদি শেষ মুহূর্তে ওকে লুকিয়ে ফেলি, আপনাকে না দিই।'

সুরেশ্বর ওর মুখের 'দিকে স্বচ্ছদৃষ্টি তুলে নিশ্চিতভাবে বলে, 'তা আপনি পারবেন না!'

'পারবো না?'

'না।'

সারাদিন ধরে মঞ্জরীও কেনা-কাটা করলো প্রচুর। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ উজাড় ক'রে দিতে চায় বুঝি। উপহার-সামগ্রীর মাধ্যমে বোঝাই হয়ে উঠলো প্রকাণ্ড তিনটে নতুন সুটকেশ। কিন্তু ষ্টেশনে অভিমন্যুও থাকতে পারে—পারে কেন, থাকবেই, এ ধারণা কি ছিলো মঞ্জরীর? অমন চম্‌কানো কেন? তাহ'লে অভিমন্যুকে দেখে কি?

লোক লোক...লোকে 'লোকারণ্য।

'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে'র ভীড়-নিত্যই রথযাত্রার ভীড়! বড়ো বড়ো ষ্টেশনগুলো যেন সমগ্র পৃথিবীর এক-একটি ছোট-ছোট নমুনা।

সেখানেও যেমন জন্ম মৃত্যুর ট্রেনে চেপে ইহলোক আর পরলোকে বিরতি-হীন যাওয়া-আসা, এখানেও তাই। সেখানেও মাঝের সময়টার কতো না ঠেলাঠেলি-ছুটোছুটি-চেঁচামেচি, নির্দিষ্ট কামড়ায় উঠে পড়তে পাড়লেই ব্যস্, সব ঠাণ্ডা—এখানেও অনেকটা তেমনি।

ফোর বার্থের একটা কামরা রিজার্ভ করা ছিলো, ভীড় ঠেলে কোনোরকমে একবার নামের স্লিপ্‌টা দেখে নিয়ে উঠে প'ড়ে। ব্যস্,নিশ্চিত। চঞ্চলা কেঁদে ভাসাচ্ছে! ছাড়বে না মঞ্জরীকে কিছুতেই।

মঞ্জরী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ। কথায় সান্ত্বনা ওর আসে না। তাছাড়া জানে এ কাজ সাময়িক, ট্রেন ছাড়ার পরেই আবার মুখে হাসি ফুটবে। চঞ্চলার মতো হাল্‌কা মেয়েরা, যে মেয়েরা জীবনে সুখী হতে জানে, তারাই এইরকম সহজে কেঁদে ভাসাতে পারে, আবার সহজেই হেসে কুটি-কুটি হতে পারে।

অভিমন্যুর সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে একবার চোখাচোখি হয়েছিলো ট্যাক্সি থেকে নেমেই। চম্‌কে উঠেছিলো মঞ্জরী। কিন্তু চমকাবার কি সত্যিই কোনো কারণ ছিলো? এ অঘটনাটা কি অপ্রত্যাশিত?

সকাল থেকে সারাদিন ধ'রে এই মধুর আশাটুকুই কি মনের মধ্যে পালন করেছিলো না মঞ্জরী?

চঞ্চলাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবের মধ্যেও কি এই উন্মাদনাকর চিন্তাটা পাক খেয়ে মরছিলো না মাথার মধ্যে? এই চিন্তা নিয়েই তো অদ্ভুত একটা বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে সারাটা দিন।

এখানে পালিয়ে যাবার প্রশ্ন নেই।

অভিমন্যু আর সুরেশ্বর প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছে। গাড়ী যতোক্ষণ না ছাড়ে, চঞ্চলা যতো পারে বিদায় নিক্ মাসীর কাছে। অভিমন্যু কি ভাবছে বোঝার উপায় নেই, পুরুষমানুষেরা বড়ো বেশী চাপা। ওদের চোখে-মুখে হৃদয়ের ব্যাকুলতা চট্ ক'রে ধরা পড়ে না।

মঞ্জরী ভাবছিলো, গাড়ী ন'ড়ে ওঠার পর তো আর প্ল্যাটফর্মে ঘুরবে না ওরা? কিন্তু মঞ্জরী যদি নামতে ভুলে যায়? ওরা কি সে ভুলের সংশোধন করতে ইতস্ততঃ করবে না? ওরা কি বলবে, 'যাও, এবার নেমে যাও তুমি, আর থাকবার অধিকার তোমার নেই। তোমার টিকিট নেই। সহজ জীবনের চলার পথের টিকিট তুমি হারিয়ে ফেলেছো।'

ওয়ার্নিং বেল পড়লো। চাঞ্চল্য দেখা দিলো প্ল্যাটফর্মে।

মঞ্জরী চঞ্চলার হাতটা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহকৌতুকে বললো, 'অমন সুন্দর বর পাচ্ছিস, বড়লোক শ্বশুরবাড়ী পাচ্ছিস্, কেঁদে আকুল হচ্ছিস্ কেন?'

'তুমিও চলো ছোটমাসী।'

'আমি? আমি কোথায় যাবো রে? তোর ঝি হয়ে?' হেসে ওঠে মঞ্জরী। ওর মনে হয়, ও যেন আগের মঞ্জরী আছে। সাধারণ গৃহস্থবধূর মতোই নিকট-আত্মীয়দের স্টেশনে তুলে দিতেএসেছে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল স্নেহাতুর হৃদয় নিয়ে। হাসি-অশ্রুর মেঘরৌদ্রে বিচ্ছেদ ক্ষণমধু ক'রে তুলে বাড়ী ফিরবে। বাড়ী ফিরে যেন আলমারী খুলে মদের বোতল বার করবে, না মাতাল হয়ে মাটিতে প'ড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদবে, না কালই আবার চোখে সুর্মা টেনে ঠোঁটে রং মেখে শালীনতার মাথায় কুঠারহানা পোষাক প'রে স্টুডিওয় গিয়ে হাজির হবে।

ও যেন চিত্রতারকাদের মধ্যে একটি তারকা নয়, ও শুধু মঞ্জরী। কিন্তু এ সুখস্বপ্ন কতোটুকুর জন্যেই বা!

চঞ্চলা নীচু হয়ে প্রণাম করলো। নেমে যাবার সঙ্কেত। তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হলো মঞ্জরীকে। আর তারপর—গাড়ী ন'ড়ে ওঠার পর ধীরে-সুস্থে উঠলো ওরা। অভিমন্যু আর সুরেশ্বর।

মঞ্জরীর সঙ্গে কি মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হয়নি অভিমন্যুর হয়েছিলো! বোধহয় হয়েছিলো!—কিন্তু অভিমন্যুর সে চোখে কি কোনো ভাষা ছিলো? নাকি সে শুধু পাথরের চোখ?

পাথরের চোখে প্রাণের বাণী ধরা পড়ে না।

কিন্তু পাথরের চোখ কি এমন বিষণ্ণ-কোমল হয়?

বৃহৎ অজগরের দেহখানা যেন খোলস ছেড়ে শনশন ক'রে এগিয়ে গেলো।

গতি তার দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে লহমায়-লহমায়। মঞ্জরী মাথা নীচু করে জনতার সঙ্গে এগিয়ে চলে শ্লথগতিতে। আর কিছু ভাবছে না। শুধু ভাবতে-ভাবতে চলেছে, কতোখানি সাহস থাকলে ট্রেনের চাকার তলায় পড়া যায়। কতো লোকই তো পড়ে এমন।

মঞ্জরীর সাহস বড়ো কম। সাহস হলো না বিনা টিকিটে জোর ক'রে গাড়ীতে বসে থাকবার, সাহস হলো না গাড়ীর চাকার তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বার। শুধু সাহস ক'রে একখানা ট্যাক্সিতে চ'ড়ে বসতে পারলো, যার চালকটাকে দেখলেই ভয় করা উচিত। তা ভয়ই কি করেছিলো ওর? নইলে বাড়ী ফিরেই পাগলের মতো অমন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলো কেন সিঁড়ি ধ'রে? ভয়ই যদি হলো তো ছুটে গিয়েই ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে অমন হাসতে লাগলো কেন? তীব্র হাসি, চোখ দিয়ে বেরিয়ে-আসা হাসি!

এ হাসিকে ভাষার রূপান্তরিত করলো বোধহয় এই দাঁড়ায়, 'আর কেন? আর কিসের আশা? সবই তো শেষ হয়ে গেলো?'

অথচ কিসের আশা? শুধু সেই আশাটুকুর মধ্যেই অচেতন চেতনায় তিল-তিল ক'রে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো আরো অনেকখানি আশা। অজ্ঞাত-সারে বুঝি গ'ড়ে উঠেছিলো অবুঝ এক আশ্বাস।

একবার দেখা হলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। খুলে পড়বে মঞ্জরীর এই কুৎসিত ছদ্মবেশে, বাতাসে উড়ে যাবে ভুলবোঝার বোঝা!

কিছুই হলো না। অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হলো, স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। বাতাস মিলিয়ে গেলো সেই পরম ক্ষণ। ধুলোয় উড়ে গেলো স্বপ্নপ্রাসাদের গাঁথনি। পৃথিবী যেমন চলছিলো, তেমনই চলতে থাকলো, মঞ্জরী যেখানে ছিলো সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। শেষ হবার আর বাকি কী থাকলো তবে?

হাসতে-হাসতে কাঁদতে সুরু করলো মঞ্জরী। আথালি-পাথালি কান্না। খাটের বাজুতে মাথা ঠুকে-ঠুকে কান্না! কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো মঞ্জরী। খাট থেকে নেমে দেয়ালের গা-আলমারিটা টেনে খুলে ফেললো। বোম্বাইয়ের বাজারে মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও, যাদের দরকার তাদের ঘরে ঠিকই মজুত আছে।

দরকার? দরকার বৈকি! নিজেকে বিস্মৃত হয়ে থাকবারও তো দরকার থাকে মানুষের? ক'দিন আগে ভেবেছে, 'আর নয়'।

কিন্তু আজ 'এখনি চাই'।

যাক্-যাক্, সবই যাক্! কিছুই যদি রইলো না, কিছুই বা রাখবার চেষ্টা কেন? তরল খানিকটা আগুন ঢেলে যদি দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে-

থাকা আগুনের জ্বালা শান্ত হয়, মন্দ কি ? বিষে বিষক্ষয় হোক না।

এ-কি হলো। এ-যে একেবারে খালি! দু'টো বোতল একে-একে উপুড় ক'রে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখলো, একফোঁটা নেই। সবটা কখন্ ফুরালো ? না-না, মঞ্জরী শেষ করেনি। নির্ঘাৎ ওই হতভাগা চাকরটার কাজ। চুরি করেছে, চুরি ক'রে চড়াদামে বেচেছে। পর পর দু'টো বোতল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মাটিতে আছাড়ে মারলো। ঝন্‌ঝন্ শব্দে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়লো কাঁচের টুক্‌রো।

শব্দে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো উর্দিপরা ভৃত্য কেশবন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ ঘরে এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে।

'নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও, ডাকু-বদমাস-চোট্টা!'

ছড়ানো কাঁচের টুক্‌রোর উপরই শুয়ে পড়লো মঞ্জরী, মদ না খেয়েও বেহেড্ মাতালের মতো।

❃ ❃ ❃

ক্লান্তমুখে স্নিগ্ধহাসি হেসে অভিমন্যু বললো, 'এবারে বন্ধু বিদায় ?'

সুরেশ্বর শশব্যস্তে বললো, 'তার মানে ? এখুনি বিদায় কি ? শুভ কাজ নির্বিঘ্নে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে একটি দিনের জন্যে বেরোন দিকি ?'

'শুভকাজ ?' অভিমন্যু হাসলো। 'সে-তো তোমার সেই পঞ্জিকার করুণার উপর নির্ভর। তোমার পিসিমার কাছে শুনলাম, তার এখনো দিন-পনেরো দেরী।'

'সে ক'টা দিন আমাদের সংস্পর্শে থাকা কি এতোই কষ্টকর ?'

'কী পাগল! আমি যে এখানে থাকছিই না। মানে, এদেশে!'

'এদেশে থাকছেন না তো কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আরে ভাই, অনেকদিন থেকেই বাসনা ছিলো, পৃথিবীর ও-পিঠটা কেমন একবার দেখে আসি! সাধই ছিলো, সাধ্য তো ছিলো না ? তাই চেষ্টায় ছিলাম যাতে ওদের পয়সাতেই ওদের দেশ ঘুরি। সাত-ঘাটের জল একঘাটে ক'রে অনেক রকম দরখাস্ত ঝেড়ে বসেছিলাম নিশ্চত হয়ে, হবে না জেনেই। হঠাৎ দেখছি জবাব এসে গেছে নিয়োগপত্র সমেত। অতএব আগামী সপ্তাহেই রওনা।'

হাসিমুখে অভিমন্যু যেন ফাঁসির বার্তা শোনায় সুরেশ্বরকে।

'নিয়োগপত্র ? তার মানে, আপনি ভারত ছেড়ে একেবারে সুদূর আমেরিকায় যাচ্ছেন চাকরি করতে ?'

'আরে দূর, অতো-বড়ো ব্যাপার কিছু না। বছর-তিনেকের মেয়াদ, সামান্য একটা লেকচারারের পোস্ট, প্রায় স্টুডেন্টস্ স্কলারশিপের সমগোত্র, প্যাসেজ খরচা দেবে, আর থাকাখাওয়ার জন্যে মোটামুটি একটা সংখ্যা। তাও আমাদের পুরনো কলেজের প্রিন্সিপ্যালের চেষ্টাতেই হলো—আমার আর কি ক্যাপাসিটি আছে?'

সুরেশ্বর বোধকরি এই আচম্‌কা খবরটাতে কিছুতেই ধাতস্থ হতে চায় না, বলে, 'কবে, কখন্ আপনার সেই নিয়োগপত্র এলো শুনি? আমি তো আজ মাস-চারেক আপনার সঙ্গে-সঙ্গে আছি।'

'প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে এসে পড়েছিলো দিন-পাঁচেক। কাল তোমাদের নামিয়ে দিয়েই আমি চলে গিয়েছিলাম না? সোদপুরে ওঁর বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। ছট্‌ফট্ করছিলেন ভদ্রলোক, খুব ধমক দিলেন বেহুঁশ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে! যেতেই বললেন, 'অবিলম্বে পাসপোর্ট করিয়ে নাও'।

সুরেশ্বর তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে, 'দেখি, আপনার কাগজপত্র?'

'না দেখালে বিশ্বাস করবে না?'

'উহুঁ!'

'আচ্ছা দেখাবো। জানি তুমি আর চঞ্চলা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু আমিও জানতাম না এটা এতো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আদৌ হবে কি না তাই-ই জানতাম না।'

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'আরে আমরা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হবো? তা ভালো! আমার আশা ছিলো, কন্যা সম্প্রদানটা আপনিই করবেন।'

'এই ত্যাখো! বন্ধু আছো এই তো বেশ! জামাই হচ্ছো তাও মন্দ না, কিন্তু অতো পাকাপাকি শ্বশুর হতে চাই না।'

'তাহ'লে নিশ্চত থাকছেন না সে সময়?'

'তা একরকম নিশ্চিতই।'

'তাহ'লে যে কটা দিন ভারতবর্ষের মাটিতে আছেন, আমাদের কাছেই থাকুন।'

'নিতান্তই থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ। রওনা দেবেন কোন্ পথে? জলে না অন্তরীক্ষ্যে?'

'অন্তরীক্ষ্যের খবরটাই তো বরাদ্দ করেছে শুনেছি।'

সুরেশ্বর মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে বলে, 'অভিমন্যুদা একটা কথা বলবো?'

'তা অতো ইতস্ততঃ কিসের?' হাসলো অভিমন্যু।'

'বলছিলাম—' কুণ্ঠা ছেড়ে সুরেশ্বর বলে, 'হার মেনে পালিয়ে যাচ্ছেন

তাহ'লে ?

ঈষৎ কেঁপে ওঠে অভিমন্যু, তারপর ম্লানহাসি হেসে বলে, 'পৃথিবীতে এসে ক'জন আর জয়গৌরব অর্জন ক'রে যেতে পারে বলো? কেউ হার মেনে পালায়, কেউ মার খেয়ে পালায়।'

'কথা এড়াবেন না অভিমন্যুদা! আমি অতো কথার আর্ট বুঝি না আমি স্পষ্ট প্রশ্নের মানুষ! বৌদিকে যদি না দেখতাম, এ প্রশ্ন করবার কোনো দরকারই হতো না আমার। কিন্তু তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এবং সেই থেকেই এ প্রশ্ন আমার মনে জেগে আছে। আজ আপনার দেশছাড়ার সংকল্পে অবাক হয়ে ভাবছি, তাঁকে তাহ'লে সম্পূর্ণ ত্যাগই ক'রে যাচ্ছেন?'.

অভিমন্যু শান্তগলায় বললো, 'ত্যাগ আর গ্রহণের প্রশ্ন তো অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে সুরেশ্বর!'

'না হয়নি!' জোর দিয়ে বলে ওঠে সুরেশ্বর, 'মানুষ কি এতোই সস্তা জিনিস অভিমন্যুদা, যে সহজেই তাকে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া যায়। আমি তো দেখলাম, তাঁকে ফেলে দিলে লোকসান হয় না, এমন মেয়েও তিনি নন। তাঁর সম্বন্ধে কোনো চিন্তা না ক'রে বিনা দ্বিধায় এমন ক'রে চলে যেতে আপনার বাধবে না?'

অভিমন্যু হতাশভাবে বলে, 'এখন আর আমার করবার কি আছে বলো সুরেশ্বর? সে চলছে তার পথে, দুরন্ত তার গতি। সে পথ থেকে টেনে আনি, এ ক্ষমতা আমার নেই। তাই বেছে নিলাম নিজের বাঁচবার পথ।'

'তাকে বাঁচান্! ধ্বংসের পথ থেকে জোর ক'রে এনে বাঁচান্।'

'সে-কি আর হয় রে পাগ্‌লা!'

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'স্নেহ-প্রেম-মমতা-ক্ষমা এসব শব্দগুলো কি তাহ'লে অর্থহীন শব্দ মাত্র অভিমন্যুদা? না, সমাজ-ব্যবস্থার থার্মোমিটারের পারা! ব্যবস্থার তাপমাত্রা অনুসারে ওঠে-নামে? আমাদের সমাজে তো পুরুষের সহস্র ভুলও ক্ষমার্হ, মেয়েরা মুহূর্তের অসতর্কতায় বাতিল? চিরকাল এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে তাহ'লে? এ ব্যবস্থা যে পুরুষজাতি কতো-বড়ো লজ্জার স্মারক, এ কি আমরা কোনোদিন ভেবে দেখবো না? মেয়েদের অপরাধের কড়া শাস্তি বিধান দিয়ে যারা পুরুষের অপরাধ ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছে কারা সেই শাস্ত্রকারেরা? আমার তো মনে হয় অভিমন্যুদা, নির্ঘাৎ তারা মহিলা। নইলে এমন ক'রে পুরুষের গালে অপমানের চুনকালি মাখাতে পারতো না! অথচ এখনো সেই চুনকালি মেখে ব'সে থাকবো আমরা?

অভিমন্যু ধীরে-ধীরে বলে, 'হয়তো আর থাকবো না সুরেশ্বর। হয়তো

ব্যবস্থার সাম্য আসবে! এক-একটা যুগের প্রয়োজনে এক-এক রকম আইন সৃষ্টি হয়, আর পরবর্তীকালে পরিবেশে যতোক্ষণ না সেই নিতান্ত অচল হয়ে ওঠে, ততোক্ষণ চলতেই থাকে। বিকৃত-বিকলাঙ্গ মূর্তি নিয়েও টিঁকে থাকবার চেষ্টায় মাটি কামড়ে থাকবে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আজ সেই মূর্তি বিকৃত-বিকলাঙ্গ। আজ একে কেউ অস্বীকার ক'রে ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ টিটকিরি দিয়ে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে, আর কেউ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের ধারক ভেবে সযত্নে আগ্‌লে ব'সে আছে। কিন্তু এ দিন আর বেশীদিন নয়। যুগের প্রয়োজনে আবার নতুন আইন সৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে।'

'তবে আপনি কেন সেই নতুন যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলবেন না অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু একবার জানলার বাইরে তাকালো। বাইরে অপরাহ্নবেলা স্তিমিত হয়ে আসছে সন্ধ্যার কাছে আশ্রয় নেবে ব'লে। সামনে একটা অজানা গাছের পাতা কাঁপছে হাল্‌কা হাওয়ায়।

সেইদিকে তাকিয়ে অভিমন্যু বলে, 'সেইখানেই তো হার মানলাম সুরেশ্বর! আমার নিজের মনকে যাচাই ক'রে ভেবে দেখেছিলাম, সেখানে মেনে নেওয়া শক্ত ছিলো না, কিন্তু আমার মা? আমার সমগ্র পরিবার? তাদেরই বা আমি দুঃখ দিই কেমন ক'রে? মমতার জালে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আমরা সুরেশ্বর!'

সুরেশ্বর অনমিত স্বরে বলে, 'কেউ যদি অন্যায় দুঃখ পায় অভিমন্যুদা, তার হাত থেকে কে তাকে বাঁচাবে? আজও যারা জীবনকে পুরনো দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইবে, দুঃখ তো তারা পাবেই। একসময় আমাদের সমাজে মেয়েদের গান গাওয়াও নিতান্ত গর্হিত, নিন্দনীয় ব্যাপার ছিলো। আজ সে কথা হাস্যকর। নৃত্য-অভিনয় এসবও তেমনি করেই জাগয়া দখল করবে, করছে ও!'

অভিমন্যু মৃদুস্বরে বলে, 'জানি। সমাজ ক্রমশঃ এদের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, তবু তার মাঝখানে এই সংঘর্ষে কিছু প্রাণ, কিছু সুখ বলি যাবেই।'

'এ হচ্ছে নিশ্চেষ্টবাদ!'

'হবে তাই।'

'উড়িয়ে দিলে চলবে না। আপনি তো আত্মীয়সমাজ ছেড়ে পৃথিবীর ও-পিঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন অভিমন্যুদা, তবে কেন—'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'কেবলমাত্র আমার দিকটাই দেখছো কেন? আরোও একটা দিকও তো আছে? সে দিকেও তো ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন আছে।'

'ওইখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না অভিমন্যুদা। আমি যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, বাধা দেবেন না আপনি? চঞ্চলা যদি বিষ খেতে চায়, দেবেন খেতে? তবে? যে আপনার সব থেকে স্নেহের আর যার ওপর কর্তব্যের দায় সবচেয়ে বেশী, তাকেই ঠেলে দেবেন যথেচ্ছাচারের দিকে?'

'এখানে যে সাবালিকা-নাবালিকার প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে হে!'

'এ সমস্তই আপনার লোক-ঠকানো এড়িয়ে-যাওয়া কথা।' ব'লে রাগ ক'রে উঠে যায় সুরেশ্বর।

কিন্তু সে রাগ রাখতে পারে না। আবার তর্ক তোলে রাত্রে ঘুমের আগে হাসিখুসি হাল্‌কা মানুষটা, কিন্তু কথা বলে যখন, চিন্তাশীলের মতোই মনে হয়। অভিমন্যুর প্রতিবাদ কম, কণ্ঠ মৃদু। সুরেশ্বর একাই বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকে—'মানুষ জিনিসটা কি এতোই সস্তা অভিমন্যুদা, যে একটু ময়লা ধরলেই রিজেক্ট করা চলে? আজকের যুগেও কি আমাদের জীবনবোধ, আমাদের সত্যবোধ অতীতের অন্ধকারে পথ হাত্‌ড়ে মরবে?—মানুষ যে একটা মূল্যবান জিনিস, এই ছোট কথাটুকু বুঝতে শিখলেই পৃথিবীর অনেক সমস্যা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।' বলে 'যে যুগ আমাদের দরজায় এসে পৌঁছেছে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় কোথায়? যে সভ্যতাকে আমরা আমন্ত্রণ করে এসেছি, তার দায় পোহাতে পারবো না বললে চলবে কেন?'

অভিমন্যু কেবলমাত্র সমাজের এক-একটি টুকরো নয়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিজীবন ব'লে সম্পূর্ণ একটা জিনিস আছে, সেই ব্যক্তিজীবনকে নিয়েই আমাদের আসল কারবার। সেইখানেই প্রকৃত মূল্য নিরূপণ।'

সুরেশ্বর রেগে বলে, 'আপনি তো হিন্দুশাস্ত্র খুব মানেন, এ-কথা মানেন না, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের?'

'স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা জন্ম-জন্মান্তরের এ আমি মানি না।'

'মানেন না?' চক্ষু কপালে তোলে সুরেশ্বর।

'না। তার কারণ হিন্দুশাস্ত্রে বহুবিবাহ প্রথারও সমর্থন আছে, কিন্তু তাও আমি মানি না। তবে এইটে আমি মানি সুরেশ্বর, জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক যদি সত্যিই কিছু থাকে, তো সে হচ্ছে প্রথম প্রেম আর প্রথম প্রেমাস্পদের সম্পর্ক!' ব'লে মৃদু হেসে আবার বলে, 'অন্য জীবনেও যার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মনে হয়, 'এই সেই'! যেমন চঞ্চলাকে দেখে তোমার।' আরো একটু হাসলো অভিমন্যু।

আপনাদেরও তো 'লাভ-ম্যারেজ' হয়েছিলো! অবশ্যই প্রথম দেখায় মনে হয়েছিলো 'এই সেই!' তাহ'লে সেটা লাভ-লোকসানের খাতায় গেলো

কেন? সে প্রেম ভেঙে পড়লো কি ক'রে?'

অভিমন্যু সেকেণ্ড-কয়েক চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কোন 'লাভ'ই কখনো ভেঙেও পড়ে না। শুধু প্রতিকূল পরিবেশে প'ড়ে হয়তো তার বাইরের চেহারাটা বদ্‌লে যায়। কিন্তু সে-কি শেষ হয়ে যায়? আমি কি কখনো আর কাউকে ভালবাসতে পারবো?'

শেষের এই প্রশ্নটা স্তিমিত অন্যমনস্ক। প্রশ্নটা যেন সুরেশ্বরকে নয়, আপন আত্মাকে। তবু সুরেশ্বর উত্তর দেয় রেগে-রেগে, 'পারবেন না—এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারেন না অভিমন্যুদা! সেও পরিবেশের ওপর নির্ভর।'

'হয়তো তাই! তবুও ভালোবাসার মধ্যে লোকসান ব'লে কিছু নেই। ধরো, এই যে তোমার আমার ভালোবাসা! তুমি আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এতো ভালোবাসতে শুরু করলে! কিন্তু আজ যদি তোমার সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটে, তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে বসো, এ দিনগুলো তো ফিরিয়ে নিতে পারবে না? এ-দিনগুলো তো রইলো? এ তো অমূল্য! বাকী জীবনটা যদি তোমার সঙ্গে আর দেখা না হয়, কষ্ট হবে—যন্ত্রণা হবে, কিন্তু এ-জীবনটা হারিয়ে যাবে না।'

অভিমন্যু তেমন সরবে টেবিলে ঠুকে তর্ক করে না বলেই হয়তো ওকে তর্কে হারানো যায় না। ওর কাছে 'বিশ্বাস'টাই একমাত্র সত্য।

সুরেশ্বরও অবশ্য হার মানে না, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছু হয় না।

অভিমন্যু স্বীকার করে—হ্যাঁ, সে ভুল করেছে, অন্যায় ক'রে ফেলেছে, মঞ্জরীর কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব এড়ানো তার উচিত হয়নি, সে ভুলের খেসারতও দিয়েছে অনেক, কিন্তু সে ভুল শোধরাবার উপায় আর এখন নেই। বাকী জীবনের জন্যে নতুন ক'রে ছক্ কেটেছে অভিমন্যু। সে জীবনের পথ কর্মতপস্যার।

কিন্তু মঞ্জরী যদি কোনো দিন নিজের ভুল বুঝে ফিরে আসতে চায়? আমার সে দরজা খোলাই রইলো, খোলাই থাকবে চিরদিন। কিন্তু কেন?

তাহ'লে অভিমন্যু তার খোলা মন নিয়ে নিজেই কেন এগোয় না? দেখিয়ে দিক, মঞ্জরী সেই তপস্যার পথ।

'সে হয় না!' অভিমন্যু বলে।

সুরেশ্বর বলে, 'ভুল শোধরাবার পদ্ধতিতে সকলের সঙ্গে সকলের মিল থাকে না! অতএব একদিকে চলে বিয়ের তোড়জোড়, অপরদিকে প্রবাস-যাত্রার। অবশ্য অভিমন্যু তার নিজের বাড়ীতেই অবস্থান করে—যেখানে আশ্রয়স্থল কেবলমাত্র ভৃত্য শ্রীপদ।

❀ ❀ ❀

তিন মাসের মাইনে তার বাডতি একশো টাকা মালতির হাতে গুঁজে দিয়ে

বনলতা বললো, 'তুই যদি বাড়ি চলে যেতে চাস্ তো কিছুদিন ঘুরে আয় মালতি। নয় তো যে ক'দিন অন্য কাজ খুঁজে না পাস্, চালাস এই দিয়ে।'

মালতি করুণ মুখ করুণতর করে চোখ মুছে বললো—'তুমি যে আমাকে শুদ্ধু জন্মের শোধ বিদেয় করে দেবে, আর সঙ্গে নেবে না, এ আমি ভাবতেই পারিনি দিদি! আমি কি অপরাধ করলাম?'

'তোর আবার অপরাধ কিসের'—বনলতা বললো, 'তোকে বিদেয় না করলে "বনলতা রাক্ষুসী"-কে যে কিছুতেই বিদেয় করতে পারবো না রে! তুই তাকে ভুলতে দিবি না, জীইয়ে রাখবি। তাহ'লে মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, রামেশ্বর যেখানেই যাবো 'বনলতা রাক্ষুসী আমার সঙ্গে ধাওয়া করবে আর দাঁত খিঁচোবে!'

মালতি চোখ মুছে-মুছে লাল ক'রে ফেলে বলে, 'জানিনে দিদি, কিসে যে কি হলো হঠাৎ, কেউ কিছু তুক্‌তাক করলো কি-না তাই বা বিশ্বাস কি! তোমার কথাবার্তাও যেন বুঝতে পারিনে আজকাল! বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কেন যে এই যৌবনে যোগিনী বেশ! এসব কি আর মানুষে এখন করে? তীর্থধর্মের বয়েস কতো প'ড়ে আছে। সেই নতুন দিদিমণি—মঞ্জরী দিদি গো—তোমায় আশ্রয়ে উঠে তোমার রাজ্যপাট দেখে হিংসেয় দু'দিনে কি বোলবোলাওটাই না ক'রে নিলো, আর তুমি কি না ইচ্ছে ক'রে সেই রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে, হাত শুধু ক'রে, থান প'রে তীর্থবাসী হ'তে চললে? দেখে 'ধরে যে আর প্রাণ থাকছে না দিদি।'

বনলতা তাড়াতাড়ি বললো, 'দোহাই তোর, আর যা করিস, প্যান্-প্যান্ ক'রে কাঁদিসনে! চুপ কর। আর এই হারটা নে, তোর মেয়েকে দিস্।'

❋ ❋ ❋

থিয়েটারের ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে ছুটে এলেন। 'কি সর্বনাশ। এ-কি শুনছি! তুমি কি আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতে চাও বনলতা? তুমি চলে গেলে, আর থিয়েটার চালাবো কাকে নিয়ে?

বনলতা হাসলো। বললো, 'রাজ্য নইলে রাজা চলে, আর আমি নইলে আপনার থিয়েটার চলে না? এক রাজা যাবে, অন্য রাজা-'

'আসবে! রাজা খুঁজে বার করতে আমার টাকের সব চুল ক'টা উঠে যাবে! আর ক'টা দিন পরেই যে আমাদের—"নব গৌরাঙ্গ"-এর চারশো নাইটের ফাংশান! অন্ততঃ একটা দিন—'

বনলতা হাত জোড় ক'রে বললে, 'মাপ করবেন ম্যানেজার সাহেব, হয়তো বা আপনাদের ওই চারশো নাইটের রাত এড়াতেই পালাচ্ছি। আমরা অভিনেত্রীর জাত, আমাদের রক্তে নিত্যনতুনের নেশা। রাত্রির পর রাত্রি,

একই পালা, একই বঁধুর বাসর সাজানো, এ আর সহ্য হচ্ছে না। হাঁপিয়ে উঠেছি।'

ম্যানেজার আশ্বাসের সুরে বলেন, আহা আর কি নতুন বই আসবে না? এখনো লোকে এ-বই দেখতে এসে টিকিট পাচ্চে না, ফিরে যাচ্ছে, তুলেই বা দিই কি ক'রে?'

'কি মুস্কিল! তুলে দেবেন কেন? কিন্তু আপনার নতুন বই আসতে আসতে ততোদিন আমি আমার মরণ-বঁধুর বাসর সাজাতে বসবো কি না, তাই বা কে জানে!'

ম্যানেজার এবার আশ্বাস ছেড়ে অবিশ্বাসের সুর ধরেন, 'শুধু এইজন্যে তুমি থিয়েটার-করা ছেড়ে দিচ্ছো বনলতা?'

'ছেড়ে দিচ্ছে কে বললে? বনলতা মুচকি হেসে বলে, 'এও তো থিয়েটার করতে চলেছি। এতোদিন আপনার স্টেজে বোষ্টুমীর পার্ট প্লে করেছিলাম, এইবার আর-এক ম্যানেজারের স্টেজে বৈরাগিণীর পাট নিতে যাচ্ছি। এতোদিন আপনার গ্যালারীর দর্শককে চোখ ঠেরেছি, এইবার নিজের মনকে চোখ ঠারবো, এই তফাৎ!'

তথাপি ম্যানেজার অনেক হাত জোড় করলো, বনলতা আবার ডবল হাত জোড় করলো। শেষপর্যন্ত ভদ্রলোক মনে-মনে অকথ্য গালাগালি দিতে-দিতে ফিরে গেলেন। আজ বনলতা কাগজ-কলম জোগাড় ক'রে একটা চিঠি লিখতে বসলো। লিখলো মঞ্জরীকে।

লিখলো "কেন জানি না—যাবার বেলায় তোকে একবার দেখার বড় ইচ্ছে হচ্ছিলো। শুনে হাসবি না তো—আমি এখন তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন। মুখ্যু মানুষ ঠিক ক'রে বোঝাতে পারবো না, তবু অনেক ভেবে-দেখে কি বুঝেছি জানিস্? মানুষের অন্তরাত্মা চিরদিন কখনো ধুলো-মাটি নিয়ে ভুলে থাকতে পারেনা। সে অনবরত যা সৎ, যা পবিত্র, তার জন্যেই মাথা কুটে মরছে। ···থিয়েটার ক'রে ক'রে কথাগুলোও থিয়েটারী হয়ে গেছে, না-রে? যাক্, তোর কাছে লজ্জা নেই! মনে হয়, হয়তো আনন্দ কুমার, নিশীথ রায়দের মধ্যেও চলেছে এই মাথা কোটাকুটি, শুধু বুঝতে পারে না ব'লে উল্টো রাস্তা ধরেই ছুটছে। তাই বলি, কেউ কারো বিচার করতেই বসি কেন? সে বিচারকের আসনটা আমাদের দিলো কে? বিচার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাসের পথ ধরলে একদিন সবাই সহজ হয়ে যাবে।"

ভেবেছিলো আরও লিখবে। লিখবে, 'ত্যাগ আর পবিত্রতা, এর কাছে হার না মেনে উপায় নেই কারো। আমি যদি এদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোম্পানীর ঘরে চাকরি নিতে যেতাম, ম্যানেজার নির্ঘাৎ আমাকে গুণ্ডা দিয়ে

খুন করতো, এখানে শুধু কনে ব্যাজার হয়েই থামলো! এই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি'—কিন্তু এতো কথা আর লিখলো না। লেখার অভ্যাস নেই ওইটুকুতেই আঙুল ব্যথা করছে!

* * *

বম্বে থেকে কলকাতা! সরীসৃপের মতো বুকে-হাঁটা, সকল-মাটি মাড়ানো রথে যতোই সময় লাগুক, আকাশের-রথে উড়ে আসতে ক'ঘণ্টাই বা? উড়ে এসে বনলতাকে ধরা যাবে না? বলা যাবে না তাতে—এ দীক্ষা তুমি মঞ্জরীকে দাও না?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে নন্দপ্রকাশজীর কাছে আবেদন করতে গেলো মঞ্জরী। চিঠিটা খাম থেকে টেনে বার করলো না, শুধু বললো, 'এক বন্ধুর মারাত্মক অসুখ, না গেলে চলবে না। আজ হলে আজই।'

'প্লেনে?

'অবশ্যই।'

বিরক্ত নন্দপ্রকাশ সবিদ্রূপে জানলেন, 'প্যাসেজ জোগাড় করা অতো সোজা নয়।'

মঞ্জরী বিনীত ভঙ্গিতে বললো, নিদান্ত না পাওয়া যায়, অগত্যা কাল। তিনিই করুন না সাহায্য, যাতে সোজা হয়।

সোজা হবার মন্ত্র টাকা! টাকা সকল ইচ্ছা পুরণেরও মন্ত্র।

যেখানে-সে মন্ত্র আওড়াতে পারলেই সব পথ সুগম।

পরদিন ভোরেই আকাশে উড়লো মঞ্জরী। বনলতার সঙ্গে একবার দেখা করবার তারও বড়ো ইচ্ছে। কিন্তু নাঃ। সব ইচ্ছে আবার টাকাতেও পুরণ হয় না। এসে দেখলো বনলতার ফ্লাটে তালা ঝুলছে। গতকাল ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বাসা উঠিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে সে। বাড়ীর পুরনো দারোয়ানটা আছে, সেলাম ক'রে জানালো—না, ঠিকানা কিছু রেখে যায় নি বনলতা। স্তব্ধ হয়ে এই তালা-বন্ধ দরজাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মঞ্জরী। দরজাটা যেন মঞ্জরীর ভাগ্যের প্রতীক। তার পৃথিবীর চেহারাটাও ঠিক এমনি!

কতোদিনের জন্যেই বা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছলো মঞ্জরী? সময়ের সমুদ্রে ছোট একটু বুদ্‌বুদ! তবু কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে চারদিক চেয়ে-চেয়ে মঞ্জরীর মনে হয়, যেন কতো যুগ-যুগান্তর পরে আবার এই স্বর্গে এসে পৌঁচেছে, এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে!

কলেজ স্ট্রীট, কালীতলা, মেডিক্যাল কলেজ, পার্কের দিকে ওই বইয়ের দোকানগুলো...বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের ওই বাস-স্টপেজটা···সরবতের

দোকান···স্টেশনারি দোকান—সব ঠিক আছে, সব তেমনি আছে! আশ্চর্য! সকলে যেন পরিচিত আত্মীয়ের মতো সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—এই যে, কোথায় ছিলে এতোদিন?

সত্যি, কোথায় ছিলো এতোদিন মঞ্জরী?

সেটা কি একটা দেশ? না সবটাই স্টুডিও?

মঞ্জরীর কাছে সমস্ত দেশটাই প্রাণহীন-মমতাহীন, শুধু অখণ্ড একটা স্টুডিওর মূর্তিতে ধরা দিয়েছে! তার বেশী আর কিছু নয়! এখানে সর্বত্র প্রাণের স্পর্শ! এর সবখানে মঞ্জরীর সমস্ত সত্তা অণু-পরমাণু হয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে আছে। এখানে আশা জাগে, হয়তো আবার বাঁচা যায়!···হয়তো আজ মঞ্জরীর জন্যে জায়গা আছে এখানে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা অনেকক্ষণ একটানা চালিয়ে চলেছে, কোনো প্রতিবাদ আসেনি পিছন থেকে, না এসেছে কোনো নির্দেশ। এবার সে নিজেই প্রশ্ন করে গন্তব্যস্থলটা কোথায়?

আর সেই অসতর্ক মুহূর্তে যে ঠিকানাটা বলে মঞ্জরী, এক মিনিট আগেও কি ভেবেছিলো সেখানে যেতে চাইবে সে?

হাতের ঢিল আর মুখের কথা! ফেরে না।

কিন্তু বিশেষ সেই মোড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, মুখের কথাটা ফিরিয়ে নেবার জন্যে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে মঞ্জরী—'ঘুম্‌কে-ঘুম্‌কে, ইধার নেহি!'

'তব্ কাঁহা?'-গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে চালক বিরক্তস্বরে প্রশ্ন করে—তাকে ভালো ক'রে ব'লে দেওয়া হোক, অতঃপর কোথায় যেতে হবে?

এইটুকু অবসর! গাড়ীর এই মন্থরতার অবসরে জানলা দিয়ে মাথাটা বার ক'রে চুপিচুপি একবার দেখে নেওয়া যাক্ না, সেই পুরনো তিনতলা বাড়ীখানা দোতলার জানলাগুলো খোলা আছে কি না! ঘরের মালিক তো ফিরে এসেছে।

* * *

'ছোটবৌদি না?'

চমকে মাথাটা একেবারের জন্যে ভিতরে টেনে নিয়েই সাহস ক'রে আবার মুখ বাড়ালো মঞ্জরী—'কে, শ্রীপদ?'

শ্রীপদ অসতর্কে একবার উচ্ছ্বসিত উচ্চারণে নামটা ব'লে ফেলেছিলো, এবার আত্মস্থস্বরে বলে, 'আপনি এখানে যে?'

এখানে অতো মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই, কণ্ঠে যদি ব্যাকুল আগ্রহের সুর লাগে তো লাগুক। বললে, 'এসেছিলাম এদিকে। শোনো—শোনো,

তারপর—তোমাদের খবর সব ভালো তো ?'

শ্রীপদ একটু কঠিন হাসি হেসে বলে, 'আজ্ঞে, তা একরকম সব ভালো বৈকি। মা তো সেই ইস্তক মেজদাদাবাবুর বাড়ীতেই আছেন, ছোড়দাদাবাবু এতোদিন ধ'রে ভারতবর্ষ পয়লট্ট ক'রে এইবার যাচ্ছে আমেরিকায়। এতো-বড়ো বাড়ীটার এখন রাজা এই শ্রীপদ।'

দাঁড়িয়ে দু'টো কথা কইবার প্রবল ইচ্ছাকে দমন ক'রে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করে শ্রীপদ। হলোই বা সে চাকর, তবু হ্যাংলা হতে পারে না! মঞ্জরী আর-একবার ব্যগ্রভাবে বলে, 'তোমার দেশের বাড়ীর সব খবর ভালো তো ?'

যেন সেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলো মঞ্জরী।

শ্রীপদ তূষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে বলে, 'হুঁ'!

'এইটে ধরো তো—তোমার ছেলেকে মিষ্টি কিনে দিও।'

—বলে দু'খানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয় মঞ্জরী।

শ্রীপদ চম্‌কে উঠে জিভ্ কাটে। 'কিছুতেই না, ওসব কি! ছেলের কাছে সে যাচ্ছে কোথায় এখন ?'

কিন্তু আপত্তির জোয়ারের মাঝখানে এক ফাঁকে সেই মনোরম চিত্রপট দু'খানি ঢুকেও যায় শ্রীপদর হাফসার্টের পকেটে।

'আমেরিকায় কেন শ্রীপদ ?'

'আজ্ঞে শুনেছি নাকি চাকরি করতে! এতোবড়ো ভারতভূমিতে আর চাকরি জুটলো না তাঁর! তা-তো নয়, এ হলো দেশত্যাগ!'

'কবে যাবেন ?'

'কাল।'

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো, দ্রুতপদে আসতে-আসতেও সে দৃশ্য মিলিয়ে গেলো। অনেকটা দূরে এগিয়ে যাচ্ছে তখন গাড়ীটা।

শ্রীপদ কিন্তু তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অভিমন্যু বিস্মিত প্রশ্ন করে, 'গাড়ি থামিয়ে কার সাথে কথা বলছিলি রে শ্রীপদ ?'

বুকের কাছাকাছি নতুন নোট দু'টো খড়খড় করছে।

বুকের ভিতরে হাতুড়ীর ঘা!

তবু অম্লান বদনে উত্তর দেয় শ্রীপদ, 'আমি থামবো কেন ? ও একজন জিজ্ঞাসা করছিলো, মুক্তারামবাবু লেনটা কোন্‌দিকে ?'

'তাই ? ও!'

কিন্তু তাছাড়া আর কি হবে। প্রত্যাশায় মানুষ তো বোকা হয় ?

* * *

চেনা দারোয়ান, প্রচুর বকশিসে.র লোভ। বনলতার ঘরটা খুলে দিলো সে

মঞ্জরীকে। আর খোলার সঙ্গে-সঙ্গে যেন ভিতর থেকে কে ধাক্কা মারলো। কি ভয়াবহ শূন্যতা। কোথাও কিছু নেই। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র বিলিয়ে দিয়ে ঘর খালি ক'রে চলে গেছে বনলতা!

মঞ্জরীর মনের উপযুক্ত ঘর বটে!

না, একটা জিনিস আছে। সেটা বোধকরি বনলতার নয়, বাড়ীর মালিকের খাট একখানা। এই সব—এই অনেক? ঘরে খিল বন্ধ ক'রে পড়ে কাঁদা তো যাবে। মাতালের এলোমেলো কান্না নয়। বেদনার পাত্র উপছে ওঠা অশ্রুজলহীন গভীর কান্না!

অনেকক্ষণ পরে উঠে বসলো মঞ্জরী। একমনে মন্ত্র জপ করতে লাগলো, 'হে ঈশ্বর, সাহস দাও! দাও সহজ হয়ে সবার সামনে এগিয়ে যাবার সাহস, অপমান সহ্য করবার সাহস, প্রত্যাখ্যান সইবার, মৃত্যুর গহ্বর হ'তে মাথা তুলে ফের জীবনকে আহরণ ক'রে নেবার সাহস!'

নিজেকে প্রশ্নে-প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেখেছে মঞ্জরী, দেখেছে যাচাই ক'রে-ক'রে! পৌঁছেছে শেষ সিদ্ধান্তে। অভিমন্যুকে অস্বীকার ক'রে বেঁচে থাকাটা তার অর্থহীন! অভিমন্যুকে বাদ দিলে মঞ্জরীর পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই। সে পৃথিবী বোবা-বিস্বাদ-মৃত!

অভিমন্যুর অহঙ্কার আর ঈর্ষাকে কেন্দ্র করেই না এতোদিন বিভোর ছিলো মঞ্জরী উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দে, ধ্বংসের উল্লাসে? অভিমন্যুকে 'দেখিয়ে দেবার' জন্যেই তো খ্যাতি আর অর্থের কদর্য-কুৎসিত বোঝাটা কুড়িয়ে তুলবার এই নির্লজ্জ প্রয়াস!

আবার অভিমন্যুর কাছে গিয়ে নিজেকে বিনীত নিবেদনে সমর্পণ ক'রে দেবার জন্যেই তো অন্তরাত্মার এতো মাথা কোটাকুটি!

এখন তবে আর লজ্জা অভিমানের সময় কোথা মঞ্জরীর!

'কে?' চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে আরও একবার বুঝি অস্ফুট উচ্চারণ করলো অভিমন্যু, 'কে?'

সরানো পর্দার গায়ে একখানি ছবি ফুটে উঠেছে। নির্বাক, নিশ্চল! বুঝি জীবন্ত হবার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করছে। বিদ্যুৎবাতির তীব্র আলোয় শ্যামল মুখটা সাদা দেখাচ্ছে। অভিমন্যু শুধু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো! শুধু আরো অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'মঞ্জরী!'

আঁকা-ছবি ধীরে-ধীরে কাছে এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলো।

এবারে যেন সচেতন হয়ে ওঠে অভিমন্যু, স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলে, 'বোসো! ব'লে একটা চেয়ার একটু ঠেলে দিলো। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে

থাকবার ক্ষমতাও ছিলো না মঞ্জরীর, তাই বসেই পড়লো। মুখে কথা নেই, কথা শুধু দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দু'টি চোখ। দেখে ভয় হচ্ছে—ও বুঝি এখুনি বাষ্পে ফেটে পড়বে, আবেগে ভেঙে পড়বে, কাঁপবে থরথরিয়ে, কাঁদবে আকুল হয়ে। কাঁপছে ঠোঁট, কাঁপছে নাকের পাটা, কাঁপছে হাতের আঙুলগুলো। কিন্তু না! ফেটে পড়লো না, উপছে পড়লো না, ব্যস্ত করলো না অভিমন্যুকে। শুধু চোখ নামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ব'সে থাকলো অন্যদিকে চেয়ে।

অভিমন্যু তেমনি মমতার গলায় আস্তে-আস্তে বললো, 'হঠাৎ তোমার এমন ক'রে আসার ইচ্ছে হল কেন, এ প্রশ্ন করবো না মঞ্জরী, শুধু মনে হচ্ছে, ঈশ্বর তাহ'লে মাঝে-মাঝে আমাদের কথা শুনতে পান। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিলো।'

কেন এতো করুণা! কেন এমন মমতা-বিধুর কণ্ঠ!

মঞ্জরী তো প্রস্তুত হয়ে এসেছিলো সব মান বিসর্জন দিয়ে বলবে 'আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।' চোখে জল আসতে দেবে না, দেবে না গলার স্বরকে কেঁদে উঠতে! শুধু বলবে—'আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।'

শুধু এই ক'টি শব্দ। সহস্রবার জপ করেছে এই মন্ত্র। সহস্রবার উচ্চারণ করেছে মনে-মনে। ভেবেছিলো চেষ্টা ক'রে আর বলতে হবে না, ভিতরের উচ্চারিত ধ্বনি আপনিই ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

হলো না। তার বদলে শুধু ক্ষীণ রুদ্ধকণ্ঠের এক প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, 'অতো দূরে চলে যেতে হচ্ছে কেন?'

'দূর আর কাছে কি। যেখানে হোক থাকলেই হলো!'

তা বটে! তা বটে! কার কাছ থেকে দূরে?

অভিমন্যুই আর একবার কথা বললো, 'কবে এলে?'

মনে ভাবছিলো, সুরেশ্বরই অসাধ্য সাধন করেছে, এনেছে বিয়েতে।

'কাল।'

'ওরা ভালো আছে?'

'কারা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জরী।

'চঞ্চলারা?'

'ওদের কথা তো আমি জানি না।'

'ও! কিন্তু যাবার কথা কে বললো তাহ'লে?'

'শ্রীপদ?'

'শ্রীপদ?' মুহূর্তে সকালবেলায় সেই গাড়ী দাঁড়-করানোর দৃশ্যটা মনে প'ড়ে গেলো। সকালেই এসেছিলো মঞ্জরী, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। শ্রীপদ তাড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় তাই। করুণায় ভ'রে গেলো মন। তবু

মঞ্জরী আবার এসেছে? কেন? ক্ষমা চাইতে? বিদায় সম্ভাষণ, জানাতে। ভাবলো অনেক রকম, কিন্তু প্রশ্ন করলো না। মঞ্জরী হয়তো অপেক্ষা করছিলো আশা। হয়তো ভাবছিলো, অভিমন্যু শেষপর্যন্ত প্রশ্ন করবেই, 'তুমি এসেছো কেন বলো মঞ্জরী?'

না, অভিমন্যুও চুপ ক'রে আছে।

সবলে সমস্ত দ্বিধা ঠেলে উঠে এলো মঞ্জরী খুব কাছে। বললো, 'আমাকে সঙ্গে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?'

মুহূর্তের জন্য একবার চমকে উঠলো অভিমন্যু।

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরীর মুখের দিকে। দেখলো সামনের দেয়ালের আলোটা এসে পড়েছে ওর চুলে, কপালে, বাহুমূলে। ঠিক যেমন করে পড়তো অনেকদিন আগে, রাতে শুয়ে পড়বার আগে যখন হয়তো একটুখানির জন্যে বেতের এই চেয়ারটায় বসতো, আর বসা থেকে উঠে আসতো। তেমনি ঝুরো ক'টা চুল উড়ছে রাগের পাশে, তেমনি সুগঠন কণ্ঠ ঘিরে সরু একটা হার, তেমনি সুকুমার ভঙ্গিটি!

মঞ্জরী তাকিয়ে দেখলো ঘরের চারিদিকে! অবিকল তেমনি।

কোথাও কোনো পরির্তন নেই। নতুন ক'রে কেউ গোছায়নি ঘর। দেওয়ালের পাশে বইয়ের র‍্যাকটা আর ঘরের মাঝখানে টেবিলটা তেমনি অনড় হয়ে ব'সে আছে! এলোমেলো হাওয়ায় দরজার পর্দাগুলো তেমনি ছুটোছুটি করছে। কোথাও কোনো হাওয়া নেই। শুধু মঞ্জরী বিচ্যুত হয়ে গেছে এই কেন্দ্র থেকে।

কিন্তু সেকথা যেন এখন মনে ক'রে মনে আনতে হচ্ছে। মনে-মনে বললো -- 'মঞ্জরী, এতো পরে এলে? যখন সব শেষ হয়ে গেছে! কিন্তু মুখে বললো আস্তে থেমে, 'সে কি ক'রে হয়?'

'কিছুতেই হতে পারে না?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললো, 'আর সময় কোথা? এতো পরে এলে তুমি?'

মঞ্জরী প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছে কিছুতেই বিচলিত হবে না, তাই স্বচ্ছ দু'টি চোখ তুলে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'তুমিও তো কোনোদিন ডাকোনি।'

তাই বটে! তাই বটে! অভিমন্যুও তে কোনোদিন ডাকেনি। বয়ে-যাওয়া অতীতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো অভিমন্যু। সেখানে কি সঞ্চিত ছিলো! ঘৃণা? বিতৃষ্ণা? না, সেখানে ছিলো সর্বগ্রাসী একটা লজ্জার যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণার হাত এড়াতেই শুধু চেষ্টা করেছে এখান থেকে পালাবার। ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, আত্মীয়সমাজ ছেড়ে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে।

উত্তর দিতে ভুলে গেছে অভিমন্যু, শুধু জানলার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তার গভীরে ডুবে। মনে হচ্ছে, পর্দাটায় ওই ছুটোছুটিই দেখছে বুঝি! সময় সমুদ্রের কণা-কণা জলবিন্দু ঝরে পড়ছে একটি ক'রে। দেয়ালঘড়ির কাঁটাটাই তার সঙ্কেতধ্বনি।...

'যাই!' বলে একটু স'রে গেলো মঞ্জরী।

চলে যাবে? চলে যাবে? এখনি মিলিয়ে যাবে ওই ছবিখানি। এখুনি শূন্য হয়ে যাবে? আর কোনোদিন এ-ঘরে ওর ছায়া পড়বে না?

ওই জলভারাবনত দু'টি চোখ আরো নামিয়ে নিয়ে, মাথা নীচু ক'রে চলে যাবে ঘর ছেড়ে। নেবে যাবে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে রাস্তায়! থেকে যাবে ক্ষীণ-অস্পষ্ট-ভীরু পদশব্দটুকু, পথের অরণ্যে হারিয়ে যাবে পাত্‌লা হাল্‌কা ওই তনুখানি। কি অদ্ভুত হবে সেই হারিয়ে যাওয়া!

অথচ এখুনি সব সহজ হয়ে যেতে পারে। না, তা হয় না। সমস্ত প্রাণ আচড়ে মারলেও হয় না; সহজ হওয়াটাই বুঝি সবচেয়ে কঠিন। কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে আর একবার নীচু হয়ে প্রণাম করলো মঞ্জরী, ইতস্তত: করলো একটু, তারপর পর্দাটা সরিয়ে বেরিয়ে গেলো আস্তে-আস্তে.

'মঞ্জরী!'

সিঁড়ির শেষপ্রান্তে বাইরের দরজার কাছে এসে চমকে দাঁড়িয়ে উপরে চাইলো মঞ্জরী। দেখলো ব্যাকুল দু'টি চোখের কোমল প্রাণে।

'চলো! তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এবার একটু হাসলো মঞ্জরী। বললে—'একলাই তো এসেছিলাম।'

কিন্তু এ-কি! এ-কি ভূমিকম্প? সারা শরীরে এ কিসের আলোড়ন মঞ্জরীর। না, ভূমিকম্প নয়, কাঁধের উপর আল্‌তো একখানি হাতের স্পর্শ! হাতের অধিকারীও কাঁপছে।

'একলাই তো এসেছিলাম।' মঞ্জরী আবার বলে।

তাই বটে! একলাই তো এসেছে ও। আবার একলাই চলে যাবে ওই রাত-হয়ে-আসা ঝিম্‌ঝিমে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রাস্তাটা ধ'রে।

ধীর-স্থির-পুরুষচিত্তেও আলোড়ন ওঠে বৈকি!

'মঞ্জরী, চলো—' আগ্রহ-ব্যাকুলস্বরে বলে অভিমন্যু, 'আমার সঙ্গেই চলো। নতুন পরিবেশ, নতুন পরিচয়ে আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু করি আমরা। নতুন ক'রে বেঁচে উঠি।'

মঞ্জরী একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপ আস্তে-আস্তে বললো, 'পালিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে বাঁচতে চাওয়া তো হার মানা! হার মানতে চাই না!

পুরনো পরিচয়ের মধ্যে থেকে নতুন ক'রে বাঁচতে চাই আমি। আগে বুঝতে পারিনি, তাই বৃথা বিরক্ত ক'রে গেলাম তোমায়।'

'মঞ্জরী!'

সিঁড়ির রেলিঙে-রাখা মঞ্জরীর ডান হাতখানার উপর হাত রাখলো অভিমন্যু, হৃদয়ের উত্তাপ যেন স্পর্শটুকুর মধ্যেই সীমায়িত হয়ে আছে।

মঞ্জরী সেই আরক্ত উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চেয়ে দেখলো একবার, স্মরণ করলো অবিচলিত থাকার প্রতিজ্ঞা। অভিমানশূন্য শান্ত গলায় বললো, 'তা হয় না। ঝোঁকের বশে এতোটা মূল্য দিতে চেয়ো না। তাতে অনেক দুঃখ আছে। করুণা নয়, কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনে যদি কোনদিন বিনা দ্বিধায় ডাক দিতে পারো, সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'বিশ্বাস করো মঞ্জরী, কোথাও কোনোখানে দ্বিধা নেই। শুধু তুমি এতো অসময়ে এলে—'

মঞ্জরী আস্তে-আস্তে অভিমন্যুর ধরা হাতখানা টেনে নিয়ে মৃদুগলায় বললো, 'বিশ্বাস করছি। আবার সময়ের জন্যে প্রস্তুত হবো।

'এখন তবে তুমি কি করবে?

'এখন? যে মঞ্জরী তোমার লজ্জার না হয়ে গৌরবের হ'তে পারবে, তাকে গড়বার সাধনায় সুরু করবো কর্মের তপস্যা।

❋ ❋ ❋

বিরাট পক্ষীদেহ নিয়ে মাঠজোড়া ক'রে শুয়েছিলো আকাশচারী রথখানা। সময়ের সঙ্কেতের সঙ্গে-সঙ্গে জাগলো তার সর্বাগ্রে, জাগলো কম্পন। কাঁপতে-কাঁপতে ঘুরতে সুরু করলো 'প্রপেলার, দু'খানা। বাতাস কেটে-কেটে আকাশের বুক চিরে চালিয়ে নিয়ে যাবে ওরা বিরাট পক্ষীদেহটাকে। একটু-একটু ক'রে উঠছে মাটি ছেড়ে—উঁচুতে—আরো উঁচুতে। উঠবে মেঘ ছড়িয়ে আরো উঁচুতে!

অকাশপথে উঠে বসেছে অভিমন্যু, মঞ্জরী দেখছে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখা যাচ্ছে না, আর দেখা দেবে না। শুধু দেখবে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু ক'রে দেখছে—অনেক মানুষ আর অনেক বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত যন্ত্রটা কেমন সহজে উঠে গেলো আকাশে। এরপর দুরন্তবেগে এগিয়ে যাবে অনন্ত সমুদ্র, ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে যাবে পাহাড়, অরণ্য আর জনপদ। তারপরই পৌঁছে যাবে পৃথিবীর ও-প্রান্তে!

—শেষ—